প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৮৪ পৌষ ১৩৯১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

প্রকাশক : প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন

৮ পটুয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক : শ্রীমতী মহামায়া রায়

সনেট প্রিন্টিং হাউস

১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

জনক,-জননী,-জননী

ও

বড়দার স্মৃতি

'এখনও···উজ্জ্বল উপস্থিতি'

সূচী

দেশ-দেশান্তর

বাঙলা ও বাঙালী

পূর্বভাষ

দেশকাল-জড়িত পাত্রের মতো দেশকালের মুখপাত্রপ্রতিম ক'জন নির্বাচিত সাহিত্যিক ও মনস্বীকে এখানে বিশেষ নিরীক্ষায় পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। গ্রন্থের সবক'টি রচনায় কোনো-না-কোনো ভাবে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যসূত্রের স্পষ্ট বা 'প্রচ্ছন্ন অবস্থান লক্ষনীয়। নইলে বিভিন্ন বয়সে-সময়ে রচিত-প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বতঃপ্রকাশ।

যে-ক'জন এখানে প্রতিনিধিস্বরূপ পুনর্বিবেচিত, তাঁরা কেউই 'পুত্তল' নন, 'সোনার পিত্তল মূর্তি' তো ননই—হয় সোনার, নয় পিতলের, কিন্তু খাঁটি, খনিজ; নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর ভবভূতি-বচন তুলছি না, ভবিতব্য কে জানে; তবে তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বস্থ ভাবে-ভঙ্গিতে যে সবল অস্থির মতোই অস্তিত্ববান, তা নিঃসন্দেহ। সেই তাঁদের মননশিল্পের জাগতিক দিগন্ত এখানে যথাসাধ্য উদ্ভাসিত বা আভাসিত হলো। পাঠকবৃন্দ সেটুকু মনে রাখবেন এবং আশা করি সহানুভূতিশীল সমরসজ্ঞতায় দোষ ভুলে গুণ ধরবেন, তাহলেই চরিতার্থতা।

বহু বিপত্তি-বিড়ম্বনা সত্ত্বেও বইটি, অবশেষে, বিলম্বিত নিশ্চয়ই, তবু বেরোল। এটাই এখনকার মতো তৃপ্তিদায়ক স্বস্তি। এজন্য মুখ্যত ধন্যবাদযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। তারপর আসেন 'নবপত্রে'র প্রসূন বসু। প্রেসের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতাও স্মরণীয়! এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থন-পূর্ব ও সমকালে যাঁরা নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, যথা অগ্রজ সুনীলকুমার নন্দী, ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী, ডঃ সৌমেন সেন, সুনীল দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য, ডঃ পবিত্র সরকার, ডঃ সুধীর চক্রবর্তী, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে, দিনেন্দ্র চৌধুরী, প্রণব দাশগুপ্ত, ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ললিতকুমার প্রামানিক, হিমাদ্রি রায়চৌধুরী ও প্রদ্যোত সেন এবং আইডিয়াল অ্যাডভারটাইজিং-এর অন্যতর স্বত্বাধিকারী সুধাংশুভূষণ ভৌমিক—এঁদের সৌজন্যকে ও ছাত্র গোপাল হালদার, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়দের পরম স্বীকৃতি জানাই। নানা উপলক্ষে টুটুল, মিষ্টি, মা-মনি ও মুন্না-মার কথা খুব মনে হচ্ছে।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে অনেকের চেয়ে বেশি খুশী হতেন যে-তিনজন, তাঁরা আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ অনিলকুমার নন্দী, বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম রানা চৌধুরী এবং রমেন্দ্র চৌধুরী; কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তাঁদের পর পর শোচনীয় অকালপ্রয়াণ, বইটি তাঁরা দেখে যেতে পারলেন না!

নিখিলকুমার নন্দী

মার্ক্‌স্‌ ও রবীন্দ্রনাথ: 'কন্‌ফেশন্‌স্‌', আনুষঙ্গিক

"A thinker, reflecting on the Eternal and a Revolution full of today's interest and immediate problems, are not enemies. There is no rupture between them, and somewhere high upon the last summit they will hold a friendly meeting." P. S. Kogan

শ্রেণী ও ধনবৈষম্যগত রাজনীতি-দর্শনের প্রবক্তা জড়বাদী মার্ক্‌স্‌[১] আর মানবতান্ত্রিক জীবনশিল্পী, ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ[২]—অথচ সভ্যতা-সংকটের সত্য-তন্ময় উদাহরণে তাঁদের যে সূক্ষ্ম নৈকট্য যেন একই সমতলে মিলিত হতে চায়, তার ভূমিকাসন্ধান বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম মুখ্য উপজীব্য। সেই ১৮৪৮-এর ত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক নির্বাসিত কর্মতাত্ত্বিক যুবকের যুগান্তকারী গ্রন্থশেষোক্তি:

"The communists consider it superfluous to conceal their opinions and their intentions. They openly declare that their aims can only be achieved by the violent overthrow of the whole contemporary social order. Let the governing classes tremble before the communistic revolution. The workers have nothing to lose but their chains. They have the whole world to gain. Workers of the world, unite."

আর এই ১৯৪১-এর আশি-বৎসর-বয়স্ক কবির বিশ্ব-সংকট-লীন শেষ জন্মদিনের ত্রিকালজ্ঞ বলিষ্ঠভাষণ:

"এমনসময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কীরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। ...জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আজ বিদায়ের দিনে সে-বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ-কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে

আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে…। পিছনের ঘাটে…দেখে এলুম…রেখে এলুম ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে-বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'পুরতঃ হিতম্' মন্ত্রোচ্চারণে যেন ধ্বনিত হয় সন্ত-'সান্ত্রী' কবির অকুতোসংশয় নিশ্চিতজয় দৃঢ় ঘোষণা :

"এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা, মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥"

অর্থাৎ এই সময়োপযোগী সমূল বিনাশ যে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, সেই চরম আশ্বাস যে সমাগত রবীন্দ্রনাথ তাতে তখন নিঃসন্দেহ নন শুধু, সুনিশ্চয়। তাই তারপর তাঁর যথোপযুক্ত জয়ধ্বনিত আগমনী-গান : "ঐ মহামানব আসে", এটি তাঁর শেষ জন্মদিনের আনুষ্ঠানিক গান রূপেও গৃহীত ও গীত হয়েছিল সেবার, শান্তিনিকেতনে ; স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবেও পাঠ্য, দ্র° শেষ লেখা ৬, যা রবীন্দ্রজীবনের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অভিভাষণের অন্তঃসার, মর্মবাণী, যার শেষ চারটি ছত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 'মানব-অভ্যুদয়ে'র প্রত্যয়ে :

"উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব/নবজীবনের আশ্বাসে/'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়' মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।" অবশ্য এজাতীয় ভাব-আলোড়িত আবাহন ও মার্ক্সীয় স্পষ্ট যুদ্ধাহ্বান এক বস্তু নয় ; খুব কাছাকাছি নয়, কিন্তু বেশ পাশাপাশি এ-দুটিকে তবু রাখা যায়। কারণ দুইভাবে দুজনই সার্থক হয়েছেন তাঁদের ঘোষণায় ও বাণীর ইঙ্গিতে। পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ সত্যই বহন করছে।

তথাপি একজন পলিটিক্যাল ফাইটার-কাম্-প্যাম্ফ্লেটিয়ার ও একজন 'সেন্টিনেল'-পোয়েট-কাম্-প্রফেট্-এ কোনো সাদৃশ্যই বহুদূর বহনীয় নয়।

অথচ বিশেষত এ-দুজনের মধ্যে অভিনিবেশযোগ্য একটা গূঢ়-গভীর অন্তর্মিল রয়েছে। দুজনেই মানুষের 'প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে' হয় 'অপরাধ' মনে করেছেন, নয় স্পষ্ট অসম্মতি তথা অসহিষ্ণুতার স্পষ্টতম পথনির্দেশ করেছেন। উপলক্ষগত আরেক মহাসাদৃশ্য এখানে যে, রবীন্দ্রনাথ যখন এই শুদ্ধ ভাবমাত্র নয়, সুচিন্তিত সিদ্ধান্তই উপস্থিত করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল তখন ইংরেজ তথা য়ুরোপীয় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যলিপ্সা, তজ্জাত চরম দুর্গতি, অত্যাচার ও নিপীড়নের নানা আধিব্যাধি-বিকৃত বীভৎস চালচিত্র। আর মার্ক্‌সের 'ম্যানিফেস্টো' বিশেষত 'ক্যাপিটাল' রচনার প্রায় সমস্ত উপকরণ জুগিয়েছিল এই এক-ইংলণ্ডীয় (তথা য়ুরোপীয়) কিছু-প্রাক্‌কালীন বাণিজ্য-পুঁজিবাদ, সেজন্য দ্রুত শিল্পায়নে তার যাবতীয় কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ, অজস্র কাপট্য-কদাচার, ঘরেবাইরে একটানা বহুব্যাপী শোষণ, পীড়ন, নিষ্পেষণ। লক্ষ্যগত সাদৃশ্য এখানে যে, উভয়েই ত্রাতার ভূমিকায় সর্বমানব বা বিশ্বময় বিড়ম্বিত প্রপীড়িত সাধারণ মানুষের দিকেই চেয়েছেন, দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য সত্ত্বেও সত্য-মনোযোগ করেছেন তাদেরই একাগ্র সম্মিলিত সামর্থ্যে, সদভিপ্রায়ে জাগ্রত প্রযুক্তি-প্রয়োগের ভাবনায়। 'অপরাজিত মানুষ নিজের জয়-যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে'— আপ্তবাক্য নয়, বলেই ক্ষান্ত হননি রবীন্দ্রনাথ, এর পর্যাপ্ত প্রযোজনার সাফল্য তিনি মার্ক্‌স্‌পন্থানুযায়ী লেনিন-স্টালিনের বিশের দশকী চেষ্টা-সার্থকতার প্রতিফলিত রূপ সাগ্রহে দেখে এসেছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ায়: আর তারই সাক্ষ্য টেনে এই 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে মাত্র ১৮ লাইনের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার বারবার সপ্রশংস উল্লেখ নয় শুধু, তার কৃতিত্ব ও কীর্তিগত 'বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্রবিস্তারী' ও 'তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একইকালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব' করে কয়েকটি দৃষ্টান্তযোগে প্রতিতুলনায় অবশেষে স্পষ্টতই এ সিদ্ধান্তে পৌছন: 'এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়।' আর এধরনের 'জয়যাত্রার অভিযানে' তাই 'মহাপ্রলয়' (কি কেবল আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ? 'ঘোর যুদ্ধফল'?—তা নয়।) বা 'রিভোল্যুশান' উভয়েরই অভীষ্ট—কেবল কবি আশা করছেন, সেই চরম আঘাতের পরে 'বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ', আর মার্ক্‌স্‌ প্রচার করেছেন, 'The dictatorship of the proletariat, followed by communal ownership and a

return to a classless social organisation' । —মার্ক্সের অভিপ্রেত এই শ্রেণীহীন সমাজেও কি ঐ মেঘমুক্তির নীলাকাশ ও একরূপ নির্মল বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন নয়? যেমন, এ-প্রসঙ্গে আরেক ভাববাদীর সঙ্গে মার্ক্সের তুলনীয়ত্ব: 'Fichte had suggested that the ultimate aim of Government to make Government superfluous (রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ ভাবতেন), but he was realist enough to put this goal myriads of years away. Marx, on the other hand, believed that as soon as the proletariat had abolished all other classes the state would wither away: with that the millennial motive-force of history would disappear' এবং সেজন্যই স্বীকার্য: 'The great constructive gift of Karl Marx···is his picture of the inevitability of a society in which poverty and suffering will cease'; আর তা কি ঐ 'বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশের ইতিহাসের নির্মল আত্মপ্রকাশে'ই পৌঁছয় না? এবং 'Then it is plain to see that he revolted against the industrial division of labour and believed the communist state would restore the wholeness of the human personality··where the worker was not confined to a single occupation, and he looked forward to a time when a man might practice every occupation, as a man, without becoming identified with his work'—এখানেও কি মনে হয় না, 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এমনি 'সংখ্যা'-মার্কামারা বিচ্ছিন্নতাবাদী যান্ত্রিকতার বিরোধী হয়েছেন এবং এমনি অখণ্ড-মনুষ্য-ব্যক্তিত্বে, তার সর্বতোস্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত-সক্রিয়তায় আশাবাদী?

তবে উদারপন্থী মানববিশ্বাসে বিবেকবান রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন মনুষ্যত্বে আস্থা হারাননি, চাননি যে তা লুপ্ত হোক কখনও, আর মার্ক্স্ সর্বহারাদের সাধনা-সিদ্ধি-লাভেই কায়মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন, লাভ ও লোভসর্বস্ব শ্রেণীর বিবেক বা শুভবুদ্ধি ও কল্যাণ-চেষ্টায় তাঁর কোনো মোহ বা মুগ্ধতা অবশিষ্ট ছিল না। মানববোদ্ধা ও জনযোদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গিগত এই পার্থক্য যেমন মৌলিক তেমনি অবশ্যম্ভাবী। আর সর্বাঙ্গ ও সর্বাত্মা বৈপরীত্য বিচার তো রয়েছেই—কবি-প্রাবন্ধিক ও ধনতাত্ত্বিকের পরিস্থিতি-বিশ্লেষণ বা সমস্যা-সমাধান কি একায়তন হতে পারে? দু'জনের স্বতন্ত্র স্থানকাল, স্বতন্ত্র সামাজিক-রাজনৈতিক প্রচ্ছদপৃষ্ঠাপট তথা সেই শর্তসাপেক্ষ ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও

অভিযানের মাত্রাবোধ তো স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। 'অভিযান' রবীন্দ্রনাথও চেয়েছেন, আশা করেছেন। কিন্তু আত্মশুদ্ধিপরায়ণ 'মানুষের প্রতি বিশ্বাসে' কবির অনমনীয়তা তখনও অবশিষ্ট। পক্ষান্তরে বিনাশক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে ও উৎপাটনে 'বিনষ্ট' অর্থনীতিজ্ঞ (বিশেষত তিনি যেহেতু militarist বা সাস্ত্র-সংগ্রামী) মার্ক্‌স্ দৃঢ়চেতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তাই রবীন্দ্রনাথ অলক্ষ্যের লক্ষ্যকারীরূপেই নমস্য ; মার্ক্‌স্ লক্ষ্যভেদের শস্ত্রজ্ঞানে ও যোজনায়, কৃতসংকল্প ও কীর্তিমান। ভাববাদী-জড়বাদীর এই একত্রবিচার প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও হয়তো ভেবে দেখার মতো : মার্ক্‌স্ তো 'দ্বান্দ্বিক'-ভাববাদী দার্শনিক হেগেলকেই নির্ভর করেছিলেন, তাঁকে পাল্‌টে প্রয়োগ করেছিলেন।[৩]

এ-পর্যন্ত যে-বিচার তার একটি অপরূপ ও অভিনব পরিশিষ্ট, সম্পূর্ণ সমর্থনে নয়, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-সন্দর্শনেই আরেক সূত্রে লভ্য। উপরোক্ত দুজনই দুই নিমিত্ত তাঁদের স্ব স্ব ভঙ্গিতে ও ভাবে দুটি 'confessions' (স্বীকারোক্তি) পেশ বা সই করেছিলেন, মার্ক্‌স্ একান্তে তাঁর নিত্যসঙ্গিনী ও প্রিয়পাত্রী কন্যাদের কাছে, রবীন্দ্রনাথ অনেকান্তে। পাশাপাশি সে-দুটি পাঠ করে চমৎকৃত হই এজন্য যে, এতাবৎ-লিখিত এ-দুজনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-লক্ষণই সেখানে আক্ষরিক-ভাবে না হোক, বেশ আন্তরিকভাবেই প্রতিভাত। অর্থাৎ এখানে যা আমাদের প্রধান উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়, উভয়ের স্বাতন্ত্র্যকেই এ-দুটি অন্যনিরপেক্ষ 'স্বীকারোক্তি' বা আঁতের কথা নিঃসন্দেহ অবিতর্কে যেন ছোট ব্যাপারে বড়ো বিষয়ের প্রমাণ জানাচ্ছে। এদের পূর্ণ-অপূর্ণ পাঠ নিম্নরূপ :

মার্ক্‌স্-স্বীকৃত

1. Your favourite virtue—Simplicity
2. „ „ „ in man—Strength
3. „ „ „ in woman—Weakness
4. „ chief characteristic—Singleness of purpose
5. „ idea of happiness—To fight
6. „ „ „ misery—Submission
7. The vice you excuse most—Gullibility
8. „ „ „ detest „ —Servility
9 Your pet aversion—Martin Tupper
10. „ favourite occupation—Book-worming

11. „ „ Poet—Shakespeare, Aeschylus, Goethe
12. „ „ Prose-writer—Diderot
13. „ „ Hero—Spartacus, Kepler
14. „ „ Heroine—Gretchen
15. „ „ Flower—Daphne
16. „ „ Colour—Red
17. „ „ Name—Laura, Jenny
18. „ „ Dish—Fish
19. „ „ Maxim—*Nihil humanum a me alienum pute.*
(I regard nothing human as alien to me.)
20. „ „ Motto—*De ommibus dubitandum.*
(Doubt everything.)

পাশাপাশি তুলনীয় **রবীন্দ্রস্বাক্ষরিত** (এ-স্বীকারোক্তির পাঠে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে প্রশ্নধারা সংক্ষেপিত ও ক'টি বর্জিত) :

মার্ক্‌সের ১ ও ৪ তথা রবীন্দ্রে ১ Your best quality = Inconsistency
২ „ greatest failing = The same
„ ২ ও ৩ ঐ ৩ You admire most in man = Love of truth
৪ „ „ „ „ woman = Love of creature
„ ৮ ঐ ৫ Your most annoyance = Spiritual arrogance
„ ১০ ঐ ৬ Your favourite pastime = Doing nothing
„ ১৩ ও ১৪ ঐ ৭ Your Hero or Heroine in life = Rammohan Roy
„ ১৫ ঐ ৮ Your favourite flower and its meaning = Have too many favourites to specify one and I love them because they have no meaning.

১১ ও ১২	ঐ ৯-১২	Greatest author, artist, poet, musician etc. of the present age—Nature hates superlatives. We can be sure of the great, but not of the greatest.
	১৩	Name two books of fiction that have given you most profit=I don't read books of fiction for profit.
„ ২০	ঐ ১৪	Your favourite motto=can't stick to one favourite, so I have no motto.

প্রথমেই মার্ক্স্-এর স্বীকারোক্তি। এজন্য আগেই মনে রাখা দরকার যে, "স্বীকারোক্তিগুলি হলফ করিয়া করা হয় নাই। (তবে) খেলাচ্ছলে লিখিত হইলেও ইহার মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে।"[৪] এ-প্রসঙ্গে আরো স্মরণীয় যে, "উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ডের শিক্ষিতমহলে এক রকমের খেলার চলন ছিল, যাহার নাম 'স্বীকারোক্তি' (কনফেশন্স্)। ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর এই খেলার বিশেষত্ব। মার্ক্স্-এর দুই কন্যা, লরা ও জেনি একসময়ে তাহাদের বাবাকে এই খেলায় যোগ দেওয়াইতে পারিয়াছিল। যে-কাগজের খণ্ডটিতে তাহাদের প্রশ্ন ও মার্ক্স্-এর উত্তর লিপিবদ্ধ ছিল তাহা হারাইয়া যায়; তাহার পুনরুদ্ধার হয় মার্ক্সের মৃত্যুর পরে। এই খেলার ভাষা ছিল ইংরেজি।"[৪] শেষদু'টি লাতিন ভাষায়।

"কতকগুলি উত্তর নিছক রহস্য।"[৪] যেমন ১৫ নং প্রশ্নোত্তরে "তাঁর প্রিয় ফুলের নাম 'ড্যাফ্নি'; কেননা ইহা লরেল-জাতীয় ফুল, আর লরেল-এর সহিত লরার সংযোগ সহজবোধ্য।"[৪] আগেই বলেছি, লরা তাঁর অন্যতমা প্রিয়সঙ্গিনী কন্যা। "এবং তাঁহার প্রিয় 'ডিশ' হইল 'ফিশ', ইংরেজি ভাষায় মিলের টানে।"[৪] ৩য় প্রশ্নের উত্তরে "আপন স্ত্রীকে লইয়া সরস ব্যঙ্গ।"[৪] ফ্রাউ মার্ক্স্ ছিলেন স্বামীর সুদীর্ঘ দারিদ্র্যপীড়িত কঠোর জীবন-সংগ্রামে নিবেদিতা সহচরী। তাঁদের চারটি সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটে অর্থাভাবে; সাংসারিক জীবনে মার্ক্স্কে যে অপমান-উৎপীড়ন সইতে হয়েছে তাতে ফ্রাউ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। এজন্য মাঝে মাঝে দুঃখজ্ঞাপক অনুযোগ তাঁকে করতে হয়েছে ও মার্ক্স্কে তা সইতে হয়েছে; এই উত্তর-মন্তব্যে তাঁরই প্রতি

অনুরাগ ও সন্দেহ কটাক্ষ রয়েছে। প্রয়াত প্রাবন্ধিক অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাটি এমি অর্থাৎ নারীর মধ্যে যে-দুর্বলতা মার্ক্‌স্ 'গুণ' হিসাবে দেখেছেন বা দেখতে চেয়েছেন, তা হয়তো তাঁর (স্ত্রীর) সবল 'সরলতা'রই আরেক রূপ। তাই তো দেখছি…"he had married Jenny Von Westfalen, daughter of a Prussian official, and she remained for nearly forty years his faithful partner, sharing with him a period of incredible poverty, privation and misfortune." এবং এজন্য যে-সরলতাকে মার্ক্‌স্ তাঁর ১ম প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন তাঁর 'প্রিয় গুণ' ব'লে, আসলে তা তাঁদের উভয় জীবনেরই অবিসংবাদিত সপ্রমাণ 'সারল্য'। 'plain living' ও 'high thinking'-এর এমন দাম্পত্য-দৃষ্টান্ত বিরল বললেই চলে। আপন চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'উদ্দেশ্যর ঐকিকতা'[৪] অর্থাৎ ব্রতনিষ্ঠা। তাঁর এই ঐকান্তিকতাগুণেই 'Despite the misery misfortune, debtors, sickness and want with which he was constantly surrounded in the drab Soha district of London, where he settled, Marx was indefatigable as ever in his promotion of socialistic causes Year after year, often for as much as sixteen hours a day, he went to the British Museum to accumulate the enormous mass of material for the work eventually to be titled *Das Kapital.* Discounting interruptions caused by other activities and illness, the book was over 18 years in preparation. Engels, who was supporting the Marx family in the meanwhile, was hopeless that it would ever be completed "The day the manuscript goes to press I shall get gloriously drunk," he said'. এ তো গেল তাঁর ব্রতপালনের একদিক; লক্ষ্যসাধনে শরীরপাতের দিক। অন্যদিকে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিপুল দুর্ভাগ্য। 'Of their six children, only three survived to grow up, and of the three, two in later life committed suicide. Only frequent financial aid from F. Engels saved the Marx family from actual starvation. Marx's only earned income was a guinea a week, received

from the New York *Tribune* for a letter on European affairs, and intermittent pay for jobs of hack writing.' এর পাশে তাই তাঁর সর্বদুঃখমন্থিত 'সুখ'-ভাবনার দিকটিও, ৫নং প্রশ্নোত্তরে, তেজদীপ্তিতে খচিত মনে হয়, যখন তিনি ঋজু ভঙ্গির বলিষ্ঠতায় ঘোষণা করেন, তাঁর সুখের ধারণাটি হ'ল : যুদ্ধং দেহি, 'to fight'। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও'। (রবীন্দ্রনাথেও এ-ভাব যে অন্যরূপে সার্থক উদ্‌যাপিত সে-কথায় পরে আসছি বস্তুত "সংগ্রামেই যে তাঁহার আনন্দ ও নতিস্বীকারেই দুঃখ (৬নং প্রশ্নোত্তর), এ উক্তিগুলি, মনে হয়, পরিহাসের পরিধি ভেদ করিয়া গিয়াছে।"[৪] তাঁর জীবনে "ইহাও সত্য যে, দাসত্বকে তিনি ভাবিতেন সবচেয়ে ঘৃণার্হ" (৮নং প্রশ্নোত্তর)।"[৪] "কিন্তু কোন্ অপরাধকে সবচেয়ে সহজে মার্জনা করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে মার্ক্‌স্ যখন লেখেন প্রবঞ্চিত হইবার প্রবৃত্তি (৭নং), তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি নিজেকে লইয়াই ব্যঙ্গ করিতেছেন"[৪] ; যেমন অন্য-প্রসঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে পরিহাস করেছেন অথবা মেয়েদের নিয়ে। "কারণ, অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও, মার্ক্‌স্ সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন, চতুর লোকের পক্ষে তাঁকে ঠকানো কঠিন ছিল না"।[৪] এইসঙ্গে আরো বড়ো যুগসত্য ও শ্রেণীসত্য এ-স্বীকৃতিতে পরিস্ফুট মনে হয়। শোষণ, উৎপীড়ন, আর অপচয় যে-যুগ-শ্রেণী-শাসনের ভিত্তি, তার অন্তর্নিহিত কাঠামোটি তাঁর 'Surplus Value' তত্ত্বেই আছে : নিঃস্ব শ্রমিকের বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী আছে মাত্র একটি—তার নিজ শ্রমশক্তি। আর উপবাস ঠেকাতে গেলে সে-বিক্রয় অনিবার্য। বর্তমান ধনতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মালিকপক্ষ যতদূর সম্ভব স্বল্পতম দামে, তাই, এ-সামগ্রী তথা শ্রমকে ক্রয় ক'রে নেয়। সুতরাং এমতাবস্থায় প্রদত্ত মজুরির চেয়ে 'ব্যবহৃত শ্রমে'র প্রকৃত মূল্য অধিক হ'তে বাধ্য। দিনে ৪ শিলিং আয় করে যে-শ্রমিক, তাকে তা উপায় করতে হয় মৌখিক বা লিখিতভাবে ছ'ঘণ্টার শ্রমে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বা কার্যত এজন্য তার শ্রমদান করতে হয় ন্যূনাধিক দশ ঘণ্টার। এই যে অতিরিক্ত ৪ ঘণ্টার শ্রম তা আসলে পুঁজিপতির চুরি। এভাবে দেখলে খাজনাসুদ-মুনাফাদি সমস্তই শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমমূল্যের আহৃত ফল, অথচ তা থেকে স্বয়ং সেই শ্রমিকপক্ষ বঞ্চিত, প্রতারিত। 'It might logically be concluded then, that the capitalist system is nothing more than an evil scheme set up to exploit and to rob the working class.' আর তার বুঝ-দেওয়া পরিপূরণে বিধাননিদান হচ্ছে 'law, morality, religion,

which are so many bourgeois prejudices'—'with a civilisation guilty of "the rule of private capital," of cheating and oppressing.' এহেন শ্রেণীচরিত্র-যুগচরিত্র বিশ্লেষণে বুদ্ধিজীবী মার্ক্‌স্ ও তাবৎ শ্রমজীবী মানুষই 'প্রবঞ্চিত হওয়ার প্রবৃত্তি'-তাড়িত হয়েই যে রাষ্ট্রসমাজসংসারে 'চিনির বলদে' রূপান্তরিত জীবমাত্র, তাতে আর সন্দেহ কী! অগত্যা ব্যাপকার্থেই এই 'gullibility' কি আপাতত মার্জনাযোগ্য! অবশ্য দধীচির বজ্রবৎ এই বঞ্চিত ভগ্নপ্রায় মজ্জায় তৈরি যুদ্ধাস্ত্র ও শ্রেণীসজ্জা মার্ক্‌সের তাই যথোচিত প্রত্যুত্তর, প্রতিবিধান: 'Workers of the world, unite.' তাঁকে তাই এ-পর্যায়ের বিশ্লেষণে কেবল পলিটিক্যাল প্যাম্‌ফ্লেটিয়ার রূপেই পাই না, রীতিমতো 'ফাইটার' তথা সমরনিপুণ শস্ত্রকারিগর রূপেই পাই, প্রমাণ একত্রে: তাঁর 'detestable vice : servility', 'idea of misery : submission' এবং 'idea of happiness : to fight'। আর ফলত তাঁর অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধকৌশল ও অগ্রণীতম সেনা-নির্বাচনে নবনাগরিক সর্বহারাশ্রেণীর ভূমিকা, তার শক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা। যুক্তিক্রমও অনুরূপ অনবদ্য আয়োজনে সংযুক্ত: 'The new urban proletariat now emerges to replace the bourgeoisie, but *not peacefully*. In keeping with his theory of the class struggle, Marx's communists "openly declared that their ends can be attained only by the forcible overthow of all existing social conditions." All the tactics and strategy of war are necessary and justifiable, it is held, to enable the proletariat to seize political power, abolish the rule of private capital and establish a classless society,' 'Marx and Engels *explain why* they place their *faith in the workers alone*···The people without property has no strong family ties, lacks national patriotism and is disillusioned with a civilization guilty of cheating & oppressing it. To the worker, "law, morality, religion are so many bourgeois prejudices." Furthermore, the workers represent "the self-conscious, independent movement of the immense majority, in the interest of the immense majority."' এই আলোকে, আর যাই হোক, স্বশ্রেণীর সঙ্গে স্বার্থে জড়িত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে কোনভাবেই 'gullible'

বানানো বা সহজেই বোকা ক'রে ঠকানো শেষ পর্যন্ত দুষ্কর ও অসম্ভব, তাই এই শ্রেণীতে তাঁর নিঃশঙ্ক নির্ভর ও অসংশয়ী আস্থা স্থাপিত ও ঘোষিত হয়েছে বারবার। এবং এজন্যই স্বয়ং আপনাকে তথা সকল সংগ্রামী মানুষকে 'তাঁর মূলমন্ত্র' স্মরণ করিয়েছেন—হ্যাভ্‌স্‌ ও হ্যাভ্‌ নট্‌সের এই জটিলকুটিল ও 'নটি' (knotty আর naughty উভয়ার্থে) জীবনভারবহনে : 'Doubt everything' —সন্দেহ করো, সংশয়িত প্রশ্ন উত্থত করো সচরাচর সবাইকে, সবকিছুকে। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন 'the symbolical leader of the have-nots in their struggle against the haves' (Neill) এবং 'the man who himself lived in misery gave the world the hope for the complete abolition of poverty' (Freehof) ; আর এজন্যই তাঁর 'submission' বা নতিস্বীকারে এত তীব্র অনীহা ও আপত্তি। Barrun-এর উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 'The strength of Marx is precisely that he shared the feelings of the downtrodden, that the prejudice of equality was in his every lever, and joined to it the ambition and jealousy of power, both ready to destroy the present moral order in the name of a higher which he saw.'

এহেন অসিধার মসিজীবী মার্ক্‌সের বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, তাঁর প্রিয় পেশা ('শখজীবিকা') হবে, প্রকৃতপক্ষে, 'বইঘাঁটা' ; কারণ তাঁর "জ্ঞানের বিস্তার ছিল বিশ্বকোষের মতো (ফরাসী বিশ্বকোষকার দিদেরোই ছিলেন তাঁর প্রিয় গদ্যলেখক) ; একাধারে এমন পাণ্ডিত্যের সমাবেশ বিস্ময়কর ও অতুলনীয়।" একথা মনে রাখলে বোঝা যায়, কেন মার্টিন টাপার নামক ১৮৫০-৬০ সালে 'জনপ্রিয়' ইংরেজ লেখকের রচনাই তাঁর 'বিশেষ বিরক্তি'। "টাপার নাম এখন একেবারে লুপ্ত ; কিন্তু সে-সময়ে তাঁহার 'প্রোভার্বিয়াল ফিলসফি' নামক অতি-তুচ্ছ গ্রন্থ দশলক্ষ কপিরও বেশী বিক্রয় হইয়াছিল।" তাঁর সম্পর্কে আরো জ্ঞাতব্য এই যে, 'rhymed platitudes'-এর দৌলতেই তাঁর সেকালীন বিশ্রুতি যেমন ঘটেছিল, একালীন বিস্মৃতিও ঘটেছে। (সে-তুলনায় বরং আমাদের দেশের 'সম্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার যোগ্যতা-বিচারে স্মরণীয়তর নাম।)

এবার আসা যাক তাঁর প্রিয় কবি, গ্রন্থকার ও নায়ক-নায়িকা প্রসঙ্গে। তাঁর প্রিয় কবি কে বা কারা ? প্যাগান, গ্রীক নাটকের স্বর্ণযুগদীর্ণ ঈস্‌কিলাস, এলিজাবেথান কালের প্রাণস্ফূর্তিপ্রবল ও প্রচণ্ড শক্তিসাহসী শেকস্‌পীয়র ও আধুনিক প্রজ্ঞাসৌন্দর্যসমুজ্জ্বল জর্মান গোটে। তাঁর সাহিত্য ও শিল্প-সম্পর্কিত

ধ্যানধারণায় এদের প্রভাব সুব্যাপ্ত এবং তা তিনি লিপিবদ্ধও করে গেছেন। "প্রিয় গদ্যলেখক হিসাবে দিদেরোর নামকরণে বোঝা যায় সাহিত্যিক গুণবিচারে মার্ক্‌স্‌-এর অমোঘ দৃষ্টি; দিদেরোর রচনাশৈলীর সমাদর শতাব্দীরও অধিককালের ব্যবধানে না কমিয়া নিরন্তর বাড়িতেছে।" Standen মার্ক্‌সের Capital (তাঁর অনন্যসাধারণ রচনা 'ম্যানিফেস্টো'র তুলনায় এই 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ কারও কারও কাছে 'নিকৃষ্ট' লাগে) সম্পর্কে যে বলেছেন, "the scheme of the three volumes is magnificent on a grand scale"—দিদেরো সম্পর্কেও মার্ক্‌সের এই আদর্শ গদ্যলেখকী মানমর্যাদাই মনে হয়ে থাকবে আসল বিবেচ্য : 'magnificent on a grand scale'—এবং আরো বড়ো কথা এই যে, ফরাসী বিশ্বকোষকার এই সুলেখক দার্শনিক প্রকৃত শিক্ষা ও রুচি, পাণ্ডিত্য ও সংস্কার-চেষ্টায় সর্বত্র জনগণের ('people') প্রতিনিধিত্বই চেয়েছেন, করেছেন (যার কথা রবীন্দ্রনাথেও, তাঁর অন্যতম স্বীকারোক্তি : whom do you consider is the best Sovereign in Europe-এর সতর্ক উত্তরে তিনি : 'The people')। অধিকন্তু দিদেরো সম্পর্কে এ-প্রসঙ্গে যা স্মরণীয় : 'Diderot's industry, shrewdness and enthusiasm made the Encyclopaedia what it was, a publication that assured thar religious tolerance and speculative freedom should hold swa,y and that drove home the doctrine that *it is the common People* whose condition aught to be the main concern of the French governing classes, whose spirit at the time (1713-84) was absolutist, religious and militaristic.' সুতরাং মার্ক্‌সের দিদেরোপ্রীতি একারণেও সমীচীন। এ-ধারণা অতীব সঙ্গত যে, ফরাসী বিপ্লবই তাঁকে সমধিক উদ্দীপিত করেছিল, ওদেশের প্রধান রচনাবলী থেকেই 'He realised that the French revolution had divided society artificially into two spheres, the political, in which man functioned as a tolerant, liberal egalitarian citizen, and the economic, in which he was either a grasping capitalist or an exploited worker.'

মার্ক্‌সের প্রিয় 'বীর' বা নায়ক দু'জন—একজন স্পার্টাকাস ও অন্যজন কেপলার। হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাসে যে-স্পার্টাকাস 'নূতন জীবন লাভ করিয়াছে,'[৪] তাঁর প্রধান ও প্রকৃষ্ট পরিচয়—তিনি ঐতিহাসিক শ্রেণী-দ্বন্দ্বের

ক্রমবিকাশে প্রাথমিক পুরোধাপুরুষ, স্বাধীনতার সংগ্রামী অভিযাত্রায় একজন প্রবল পরাক্রান্ত পথনেতা। রোমান দাসত্বগত শৃঙ্খলমোচনের শ্রেণীচেতনায়, উত্থানে-অভ্যুদয়ে, তিনি ছিলেন পতনাক্ষম মহাবীর। তাঁকে মার্ক্সের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তাঁর প্রতি Laskiর প্রশস্তি মনে পড়ায়: 'At bottom, the main passion by which he was moved was the passion for justice. He may have hated too strongly, he was jealous and he was proud. But the mainspring of his life was the desire to take from she shoulders of the people the burden by which it was oppressed.' 'Harmony of the world' ও 'New Astronomy'-খ্যাত ১৭শ শতকী Kepler-এর সংগ্রামশীল জীবনকথায় যে পুনরুজ্জীবনী শক্তি সঞ্চিত, তার প্রেরণায় মার্ক্স্ তাঁর নিজস্ব চিরসংগ্রামী মনুষ্যধর্মে, কর্মে, আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন (এবং তাঁর মধ্যে একটি ক্রান্তিকাল সন্নিবিষ্ট ছিল বলেও হয়ত)। কারণ 'Kepler (after the death of Copernicus) represents both the mysticism of the Middle Ages and the positive, reasoning spirit of the Renaissance.' 'There run through all Kepler's works, as inseparable threads of their texture, the search, familiar to the scientist today, for rational co-ordination of observations, and the almost infinite remoteness of a mysticism with which we have lost touch.' অনেকটা যেন নিকটদূরদর্শী জীবনকাব্যকার দান্তের মতই তাঁর বিশ্বজিজ্ঞাসা-কেন্দ্রিক মহান ভূমিকা।

কিন্তু নায়িকা নির্বাচনে গ্রেচেন কেন? "গোটের ফাউস্ট্-এর নায়িকা যে হইবেন মার্ক্সের প্রিয় নায়িকা তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, তবে কাহারও ধারণায় এই স্বীকারোক্তিতে আছে রহস্যের অন্তরালে (অনুরূপা) স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ। গ্রেচেন-এর অনেক মাধুর্য ফ্রাউ মার্ক্সের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল।"[৪]

"মার্ক্সের শেষ দুটি স্বীকারোক্তি লাতিন ভাষায়।"[৪] ইংরেজি অনুবাদে যথাক্রমে: I regard mothing human as alien to me এবং Doubt everything! "একটির অর্থ যাহা কিছু মানবীয় তাহা আমার পর হইতে পারে না; অন্যটির অর্থ (পূর্বেও আলোচিত) সব কিছুই বিচার করিবে। যে-মহাজীবনের লক্ষ্য ছিল সর্বমানবের মুক্তি ও পদ্ধতি ছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ,

তাঁহার পক্ষে ইহার চেয়ে উপযোগী বাণী বা মন্ত্র খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।"[৪] এবং একইভাবে বলা যায় তাঁর প্রিয় রং-নির্বাচনে লালের প্রতি অনুরাগে কোনো গোলাপবিলাস নয়, বাধ্যতামূলক রক্তাক্তবিপ্লবীর প্রিয় সাধই প্রতিফলিত। কিন্তু বাধ্যতামূলক কেন?—"Without war they could not envision change: 'it is precisely the wicked passions of man greed and lust for power which since the emergence of class antagonisms, serve as the levers of historical development.' Thus Engels in his attack on Feuerbach."

পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরালে এক লহমায় বোঝা যায় যে, মৌলিক বিশ্বপ্রাণী দরদে ও মানবসত্যজীবিকায় মার্কসীয় ও রাবীন্দ্রিক বচনমালায় যে-নৈকট্যই বিদ্যমান থাক, কতিপয় একান্ত ব্যক্তিগত ভাবে ও ভাবনায় তাঁরা নিতান্তই দূরস্থিত। প্রথমত, নিজস্ব গুণাগুণের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ যে-উত্তর দিয়েছেন তা তাঁর মতো কল্পনাপ্রতিভাবান সৃজনশিল্পীর যেমন উপযুক্ত, তেমনি বিশশতকী আয়ুষ্মানের পক্ষেও যথাযথ। তিনি অসঙ্গতি বা স্ববিরোধকেই তাঁর গুণাগুণ বলেছেন। এখানে দ্রষ্টব্য তাঁর আশ্চর্য গহনবোধ ও অসাধারণ মাত্রাজ্ঞান—আধুনিক-মানবীয় ও শিল্পী-মনস্তাত্ত্বিক অসঙ্গতিতেই তিনি তাঁর গুণদোষ উভয়ই নির্বিকার-নিরীক্ষা, হয়ত পরীক্ষাও করেছেন। তিনি ছিলেন গভীরতম আস্তিক্যের প্রমূর্ত সুরশিল্পী; তাঁর 'অন্তর্যামী' বা 'জীবনদেবতা'বোধ কি কেবল শৌখিন আত্মকণ্ডূয়ন? আমরা জানি কবি-ধর্ম প্রজাপতির মতো; সুসঙ্গত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের চেয়ে বিবিধ বিপরীত বৈচিত্র্যের সত্য-সৌন্দর্যেই তার আনন্দিত অভিসার, অভিরুচি, বিপ্রতীপ রংলীলাতরঙ্গিত গঙ্গাযমুনায় আন্দোলিত অবগাহনেই সমধিক সার্থকতা। (যেমন, 'পূরবী'তে রবীন্দ্রনাথ: "এই জীবনের সকল সাদা-কালো/যাদের আলো-ছায়ার লীলা;/...এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।/এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়/ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।"...) কারণ কবি সংরক্ত হৃদয়াবেগ থেকে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতর্ক পর্যন্ত সর্বত্রগামী। স্রষ্টার স্বেচ্ছাভ্রমণে, সর্বরঞ্জন ও সর্বভুঞ্জনে, বহু বিরোধী সংযোগ, বিপরীত-সঙ্গম, তথা পারাপার, পালাবদল যেন অবশ্যকৃত্য। 'আমি যে সব পেতে চাই সব পেতে ধাই রে/আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।' এজন্য তাঁরা বিরোধের স্বরেই মিলনের বাঞ্ছিত রাগিণী বাজিয়ে তোলেন। তখন একথা আর তাঁদের পক্ষে বেমানান হয় না।

যে : 'I, in my intricate image stride on two levels…' যেহেতু ভাবগত ও বস্তুগত কোথাও কোনো প্রগতি ও পরিণতিই দ্বন্দ্ব-বিরোধ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সুতরাং স্ববিরোধ ছাড়া অসম্ভব। এজন্য উইলিয়াম ব্লেক বলেছিলেন : "Without contraries is no progression. Attraction and repulsion, reason and energy, love and hate are necessary to human existence." এক্ষেত্রে 'poetic existence' আরও নিশ্চিত দুরত্যয় ও ক্ষুরধার, "দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ঃ বদন্তি"। তাই কবিসত্তার এই জটিল বিরোধ ও অসঙ্গতিলীন আসঙ্গীত সাধনার ইতিহাসে হওয়া, আরও হওয়া, হয়ে-ওঠার হৃৎকম্পিত রক্তাক্ত কাহিনীই অধিক গুরুত্বপূর্ণ - যে-হওয়ার অধিকার পেলে কবি এমন এপিগ্রাম-প্যারাডক্সের মত বিশিষ্ট সত্য অনায়াসে উচ্চারণ করেন, "অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো আমার আলো।" এবং এই হওয়া ও হ'য়ে-ওঠা তিনি অবলীলায় পাঠকেও সঞ্চারিত করেন। তাঁর এ-মহাদায়িত্বে সহযোগিতা করতে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের এই সঙ্গত দাবি এ-প্রসঙ্গে তাই আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ আশা করে : "Do not dictate to your author ; try to become him"। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, "তাঁকে হ'তে দাও, আর নিজে হও।" অতএব তাঁর কবি ও শিল্পীরূপে রবীন্দ্রনাথের 'best quality' কী—'inconsistency' ; 'greatest failing' কী—'the same' ; বেশ বোঝা যায় প্রশ্নকর্তার মুখে নিক্ষিপ্ত এই শ্লিষ্ট স্বীকারে সুনিহিত সত্যবোধের জোর ও জাদু যেন মেঘমেখলা বিদ্যুতে বিচ্ছুরিত। হ'তে পারে তা নির্মোহ আত্মসমালোচনায় সুস্মিত স্বীকৃতি, হতে পারে তা আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের মুগ্ধতা। (এবং তাই তাঁর 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা'র নিরপেক্ষ নিরীক্ষায় এ-দু'টি দিকের দরজাই তিনি খোলা রেখেছেন।) আসলে 'স্ববিরোধ'ই শেষ কথা নয়, 'নিজের ভিতরকার স্বাভাবিক বৈচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা'টাই শেষ কথা এবং বিশেষ কথা ; আর তাই রবীন্দ্রনাথের চিরবৈশিষ্ট্য ও অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব।

তাঁর 'প্রিয় শখে'র কথায়ও এমনি অনায়াসে তাঁর ধ্যান-শান্ত কবিধর্মেই তিনি ফিরে গিয়েছেন। 'favourite pastime' কী বা অবকাশরঞ্জনে কী করতে তিনি ভালবাসেন ? —উত্তর : 'কিছু-না-করতে'। অথচ আমরা জানি কমপক্ষে ষোলো ঘণ্টায় ঠাসা রুটিনের কর্মসূচীতে রবীন্দ্রনাথের দিনরাত্রিগুলি কত কর্মময়, উত্তপ্ত ও জীবন্ত ছিল। রসরূপকার স্রষ্টার পক্ষে অবসরও যে ছুটি নয়, আপাত-মৌনও যে প্রকৃতই মৌনমুখর, কিছু-না করাও যে একরূপ-করা, হয়ত

সবচেয়ে তা বড়-করা - সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কুণ্ঠা ও সংঘাতের সম্ভাব্য উপশম, কত বিপরীত গতির বা বিচিত্র বিরোধের আলোকিত সমন্বয় ঐ না-করার মাহেন্দ্রমুহূর্তের ঐক্যেই কেন্দ্রিত, সাধিত ও সাধ্য। বস্তুত এরই সঙ্গে তাঁর আত্মোপলব্ধিগত নিত্যনব দিগন্তের সন্ধান জড়িত। কবির জীবনে 'করা'র মতো 'হওয়া'টাও অতিমুখ্য। 'কৃ' ধাতু ও 'ভূ' ধাতু শিল্পস্রষ্টার ধাতে ওতপ্রোত। উভয়েই তাঁর অবাধ অধিকার, আত্মস্থের উপযোগ। একথার বড় প্রমাণ, স্বয়ং কবিস্বরূপ কবিতার এই কবি-সংজ্ঞা : "A poem should not mean, but be"। কবি ও কবিতার-নিত্যনবীনতা নদীস্রোতের মতো বহমান, প্রবাহিত ; কেবল ভাসা বা ভাসিয়ে দেওয়া নয়, ভালবাসাও ; কেবল শক্তির জয় ও ক্ষয় নয়, শক্তির সংগ্রহ, সঞ্চয়, সঞ্চার। "আলস্যের সহস্র সঞ্চয়ে" এই মহতী ইচ্ছা ও সাধ সুগ্রথিত। কেননা তিনি জানেন, কবির এই কাঙ্ক্ষিত 'হওয়া', 'হয়ে-ওঠা' তাঁর কিছু না-করার নির্বিকার আপাত-আলস্যের স্বয়ংক্রিয় স্বভাবে, 'নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থনে'ই স্থিত, গতিপ্রাপ্ত, আস্তৃত। এবং এভাবেই প্রাপ্ত-প্রমাণিত তাঁর 'resoluteness, even obstinacy ; a deliberate manipulation and organization of one's character for purposes of one's lifework, with plans for the day's work accordingly, everyday, and an enforcement of those plans upon one's self and upon one's environing fellowmen, year in and year out ; heroic, Herculean work-morality··· Which enabled him · having been overcome "grief and torment, desertion, and frailty of body, vice, passion, and a thousand hindrances"— to bring his talent and his genius to fruition in a heavy harvest of collected works.' (প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানতপস্বী মার্কসের গ্রন্থকীটত্ব ও ভাবগূঢ় কবি রবীন্দ্রের এই তাৎপর্যময় কিছুই-না-করার মুহূর্তমালা তাঁদের মৌলিক বিপ্রতীপ বৈশিষ্ট্যকেই দীপসঙ্কেত করছে।)

সাধারণভাবে পুরুষের মধ্যে তাঁর মনোমত গুণ 'সত্যনিষ্ঠা', নারীর মধ্যে 'জীবে প্রীতি' (বলা বাহুল্য, এই জীবে প্রীতি ব্যাপারটা 'জীবে প্রেমের চেয়ে অনেক কাছের, সহৃদয়, ঘরোয়া ও ঘনিষ্ঠ-অন্তরঙ্গ বলে আমার মনে হয়) তাঁর বাস্তবসম্মত ভাবাদর্শবাদী মানসিকতারই স্পষ্ট পরিচায়ক। মূলত বহির্মুখী পুরুষ ও অন্তর্মুখী নারীর সম্যক প্রকাশ বা অভিব্যক্তি যথাক্রমে অবিচলিত সত্য-রক্ষায়, প্রতিপালনে ও প্রীতিপালনেই প্রাপ্য ; সেই তাদের কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র—

কেননা মিথ্যা-মাতলামির নানারঙিন মদ একজনের সত্যবোধ-বুদ্ধিকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করে ; আর 'creature comforts'-এর অনিঃশেষ মোহলোভ অন্যজনের প্রীতিপ্রেমকে নিরন্তর উচ্ছন্নে পাঠায়। এইসঙ্গে তাঁর আদর্শ নায়কের নামটিও লক্ষণীয়। তাঁর নায়ক কে ?- আধুনিক বাংলার প্রথম প্রকৃষ্ট সত্যকাম মানবতান্ত্রিক রামমোহন রায়—বিদ্যাসাগরের পূর্বে স্মরণীতম বঙ্গজ-বিস্ময় ; নচিকেতার মত যিনি প্রথম মৃত্যুর অন্তর্গত অমৃত ও অন্ধকার-আচ্ছন্ন হিরণ্ময় পাত্রটিকে খুঁজেছিলেন—প্রমিথিউসের মতো এনেছিলেন জ্যোতিঃগর্ভ জ্ঞানের মুক্তি, যাঁর অন্যতম মহাকর্ম সতীদাহের নিবারণ আসলে ছিল সত্য-দাহেরই নিরসন ; সেই যুক্তিবাদী এক-ধর্ম-প্রদীপ্ত প্রবল-কর্মবীর যে বিশেষিত রবীন্দ্র-নায়ক, তা আমাদের এই দুই-শতাব্দী-সেতুবন্ধকার বিরল কবি-কোবিদ-পৌরুষেরও নিজস্ব যোগ্যতা। পাশাপাশি তাঁর বিশেষ বিরক্তি-চিহ্নটি লক্ষণীয় : spiritual arrogance বা আধ্যাত্মিক অহমিকা ; রামমোহনেও এ-বিরক্তি-বৈশিষ্ট্য ছিল, খুব তীব্রভাবে ছিল ; তাঁর শিশু-গন্ধের কাঁচ হাড়ে এজন্য বিতর্ক-বিতণ্ডার সেই ঐতিহাসিক ভেল্‌কির ঝড় এ-পথে প্রথম জাতীয় জাগরণী পদক্ষেপ। আর রবীন্দ্রনাথ ? উৎকেন্দ্রিক বিভ্রান্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন নির্মম, তেমনি বিবেকতাড়িত শুভবোধে শান্ত-সমর্পিত ; আদর্শ-প্রাচ্য-ভক্তির মন্ময়-আধ্যাত্মিকতায়, 'বেদান্ত'-পরিস্রুত 'সহজ'-মরমী ধর্মবিশ্বাসে তিনি যে এ-পর্যন্ত ধ্রুবজ্যোতির এক দিগ্বলয় হয়ে আছেন, তার মূলেও রামমোহন প্রেরণা জুগিয়েছেন প্রচ্ছন্নভাবে ; তাই তাঁর এহেন মূল্যবোধ।

একটিমাত্র 'মূলমন্ত্র'-উচ্চারণেও যে এই কবি-কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ অনিচ্ছুক, সেটিও তাঁর পক্ষে সুসঙ্গত, স্বাভাবিক। 'প্রিয় বলে কোনো একটি মন্ত্রকে আঁকড়ে থাকতে পারিনা, তাই কোনো মন্ত্র নেই' অর্থাৎ 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'—নিত্যগতিময় ও প্রগতিশীল, স্বাধীন স্বচ্ছন্দ, সর্বসংস্কারমুক্ত থাকতে চান তিনি, তাই মাত্র কোনো একটি মন্ত্রে আটকে থাকতে চান না, পারেন না। এই মৌল বোধেও সেই 'inconsistency' তাঁর সত্যকার গুণাগুণ। এ-প্রসঙ্গে তাঁর লঘু-গুরু দুটি লেখা স্মরণীয়। একটি পরিহাসছলে লিখিত—অভিন্নহৃদয় বন্ধুদের জন্য স্বরচিত তাঁর অভিনব বিবাহপত্রের লেটারহেড সংশোধনে দেখেছি : "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়" মুদ্রণাংশ কেটে দিয়ে তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, 'আমার motto নহে' ; সচরাচর-অলক্ষিত এই আপাত-তুচ্ছ সংশোধনে সেই বয়সেই তাঁর সত্যস্বরূপ ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় উচ্চারণটি সমধিক স্মরণীয় : "আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন/দেবতার বন্দীশালায়/আমার

নৈবেদ্য পৌঁছল না।" এখানে বিশেষভাবে সেই আনুষ্ঠানিক প্রথাগত সচরাচর মন্ত্রেতন্ত্রে অনীহা ছাড়াও যে-কথাটি ধরা পড়েছে, তা নইলে 'প্যান্‌থিয়িস্ট' রবীন্দ্রনাথের 'উদার অভ্যুদয়' উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না।

একসূত্রে গাঁথা তাঁর 'শ্রেষ্ঠতম'ত্ব বিচারে অনিচ্ছা, অনাস্থা। 'Nature hates superlatives' ইত্যাদি—"'তম' প্রত্যয়ে প্রকৃতির ঘৃণা আছে : মহৎ-দের সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, কিন্তু মহত্তমদের সম্পর্কে নয়।"[৪] কারণ কি শুধু বিপুলা পৃথিবী ও নিরবধিকাল ? ততোধিক কিছু। মনে হয় শ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে প্রশ্নটি উত্থাপিত হলেও রবীন্দ্রনাথ এ-ভাবেই তা সুকৌশলে আমূলবিদ্ধ ও উপহসিত করতেন। এবং এটি তাঁর গূঢ়-সত্যনিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন-অখণ্ডসন্ধানীর পক্ষে যথোচিত, যেমন চরম ও দৃঢ়-প্রত্যক্ষবাদী মার্ক্‌স্‌-এর পক্ষে স্পষ্টোচ্চারিত তাঁর পরিচ্ছন্ন ঘোষণায় স্বাভাবিক সেই প্রিয় শ্রেষ্ঠদের নামাবলী, পূর্বেই যা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এইসূত্রে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে, 'প্রিয় ফুল' চিহ্নিতকরণে রবীন্দ্রনাথ কেন শীতল। তাঁর চেয়ে পুষ্পানুরাগী কবি নিখিল বিশ্বে কালিদাস ছাড়া আর নেই। তথাপি এবং সেজন্যেই তিনি তাঁর অতিপ্রিয় বিষয়ে এই মতের পোষক : 'প্রিয় ফুলের সংখ্যা এত বেশি যে মাত্র একটির নাম বলা মুশকিল। আর ফুল ভাল-বাসি, কারণ তাদের কোনো মানে নেই।'[৪] 'মানে'-না-থাকাই যে স্বরূপত ফুলের বড় 'মানে', কারণ তার সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ, তার অনুভব-রহস্য কোনো 'মানে'র সীমানা মানে না। তাই তার অর্থমোচনে নয়, অর্থ-উন্মোচনে এত আকর্ষণ, এত মর্যাদা। পক্ষান্তরে মার্ক্‌স্ এ-প্রসঙ্গে তাঁর প্রিয় কন্যার সঙ্গে মিলিয়ে যে একটিমাত্র ফুলের নাম করেছিলেন তাঁর পক্ষে তা একটুও বেমানান নয়। যেহেতু তিনি 'essence'-এর চেয়ে 'senses'-এ সমধিক আগ্রহী। তিনি কবি রবীন্দ্র-নাথের মতো নিরপেক্ষ সৌন্দর্যানুরাগী নন, হতে পারেন না—কিছু অলক্ষিত কবিতা রচনা সত্ত্বেও তিনি ঠিক কবি ছিলেন না, থাকতে চাননি। তাঁর প্রথম যৌবন ও প্রেমের কবিতাক'টির কথা মনে রেখেই বলছি—সেই বায়রনিক রূপ ও স্বতঃউৎসারিত উচ্ছ্বাস, আবেগ, প্যাশন সব সত্ত্বেও। আর তাঁর এহেন উত্তরে প্রত্যক্ষ কন্যাপ্রীতির ইন্দ্রিয়গম্য সন্তোষই জাজ্বল্যমান। (তাঁর 'প্রিয় নাম'-তালিকায় অনুরূপ কারণে লরা, জেনী—তাঁরই কন্যাদ্বয়।) এহেন সীমিত উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কখনো কোনো স্পৃহা ছিল না—নইলে তাঁর পক্ষে লরা-লরেল-ড্যাফ্‌নির মতো কত সহজে উত্তর হতে পারত—ধরা যাক, বেলা নাম্নী তাঁর কন্যাকে মিলিয়ে প্রিয় ফুলটির নাম : বেল, বেলি, মল্লিকা। বিশেষত যখন জানি এই মল্লিকা বা বেলফুল তাঁর প্রিয়তম পুষ্পস্তবকে অপরিহার্য। এবং কতবার

কত অপরূপ গানে ও কবিতায় তিনি এই মল্লিকাবনের কলিকে দিয়ে তাঁর বন্ধুর জন্যে বহু যত্নে অঞ্জলি বেঁধেছেন। আসলে আনন্দবেদনা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ভাববাদী এই কবিমনীষী কোনো অলাচল আবদ্ধ সিদ্ধান্তে আসতে চাননি। (যেমন তাঁর এখানকার এই প্রশ্নোত্তরটি: 'Name two books of fiction that have given you most profit'—'I don't read books of fiction for profit'—'কোনো লাভের জন্য উপন্যাস পড়ি না'। এমনকি "আনন্দদায়ক" কোনো দুটিমাত্র কবিতার ফাঁদেও তিনি জড়াতে চাননি নিজেকে, কবিতা-পাঠের অজস্র বিচিত্র আনন্দ কি এতই সুলভ ও সঙ্কীর্ণ? প্রশ্নটি তাই সটান এড়িয়ে গেছেন, নিরুত্তরে।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্য একাধিক উত্তরকে অতিপ্রত্যক্ষ করে তুলেছেন, উদ্দেশ্যবাদী মনোদুঃখেই করেছেন, মনে হয়। যেমন 'Do you consider dress influences character?=Does, when we are conscious of it.' যেন তাঁর স্বরচিত সুবিশিষ্ট জোব্বা পোষাকে, তাঁর নিজস্বে, তিনি তখন মনশ্চক্ষু সংযোগ করেছিলেন। হয়ত ভ্রূকুটিও করেছিলেন পোষাক-আশাক সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় প্রগল্‌ভতা ও অবহেলার উভয়াতিশয্যে, পক্ষান্তরে একই বিষয়ে দেশ-দেশান্তরের অতিচেতন মাত্রাধিক্যে-মাত্রাহীনতায়। জাগতিক যে-কোন ব্যাপারেই তাঁর মন বলতে এসেছিল: 'সর্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্'। তাঁর কাছে 'আত্মানং বিদ্ধি' কেবল গুহাহিত সত্য নয়, সদাচার, শিষ্টালাপ, যথোচিত পোষাক-পরিধেয়, সর্বত্রই নিজস্বতার রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন-বিকিরণ বাঞ্ছনীয়। এ-উত্তর সে-হিসাবে এক অসামান্য সদুত্তর। তেমনি তাঁর এই অর্থপূর্ণ নিরুত্তর: "Whom do you consider has the greater brain-power—man or woman?=I decline to answer"; কারণ এ নিয়ে যে বাজারচলতি বিরোধ ও বিতর্ক, পুরুষ ও স্ত্রী জাতি সম্পর্কে গভীরজ্ঞানী উপলব্ধি তার প্রতিবন্ধকতাই করে, কোনো আনুকূল্য করে না। পাশাপাশি বিবেচ্য এই প্রশ্নোত্তর: "Describe the girl of the period—She is like the girl of the period *when truly known*'—এই ইটালিক্‌স্ অংশটুকু এখানে অত্যাবশ্যক। এই বিচার অবিস্মরণীয় বিশেষত এজন্য যে, প্রকৃত তথ্য ও সত্য না জেনে, না বুঝে চারপাশে প্রতিনিয়ত যে তুলনামূলক বিচার চলে, সঙ্গে যা-কিছু অবর্তমান তাই কেবল গৌরবান্বিত, এতে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল না। কোনো গতায়ু নজীরে, তা নির্জীব ধূসর ধূমল খ্যাতিতে মুখর হলেও, বরং সেজন্যই, তাকে ব্যর্থ প্রাধান্য দেখিয়ে বর্তমানের শ্রীল অস্তিত্বে অনাস্থা তাঁর

স্পৃহনীয় ছিল না। একই প্রশ্নোত্তরে: 'মেয়েদের সামাজিক কাজে অংশ নেওয়া?' —'নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের ভূমিকা স্বতন্ত্র।' স্পষ্ট, সুনির্ণীত ভাসা-ভাসা ফাঁপা কথায় ব্যর্থস্ফীত স্তোত্রে ও প্রশস্তিবচনে সামাজিক নারীর জন্যে সিংহাসন গড়েননি তিনি. 'জীবে প্রীতি'-বশত অন্নপূর্ণা গৃহিনী ও সুন্দরী সমাজ-কল্যাণীকে তিনি বার বার সমাদর, শ্রদ্ধা ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। এককথায় নারীদের তিনি 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রানী' বলেছেন, এদের কখনোই নর্মসহচরী রূপে মাত্র ভাবেননি, কর্মসহচরী রূপেই দেখা পাওয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা করেছেন। সেই কবেকার 'সুমিত্রা' থেকে পরিণত কালের 'চিত্রাঙ্গদা' পযন্ত তাঁদেরই তো শোভাযাত্রা এবং সেকথা ও কাজ সেকাল-একাল-চিরকাল মিলিয়ে চলারই চিন্তাচেতনা।

পক্ষান্তরে 'আধুনিক তরুণ' বলতে তিনি অকপটে বুঝিয়েছেন: 'He has lost his youth'—'সে তার তারুণ্য খুইয়েছে'। যে-তারুণ্যের পরিচয় আত্মপ্রতিষ্ঠায়, সত্যপ্রতিজ্ঞায়, সম্ভ্রমবোধে, মনুষ্যত্বের জাগ্রত প্রয়াসে, অতন্দ্র আদর্শবাদিতায়, বিচক্ষণ বাস্তববুদ্ধিতে, জীবনযুদ্ধে, মুক্ত জিজ্ঞাসায়—তার অভাব তিনি 'বর্তমান' তারুণ্যে সচকিত সতর্কতায় লক্ষ্য করেছেন। সে-অনটনের কারণ: দশদিগন্তব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসনের নিপীড়নে ও বৈশ্যশক্তি-নির্মিত অর্থনৈতিক মন্দায়, অপচয়ে, যৌবন বিশেষত এই শতকে এসে বার বার তার সহজ প্রাণশক্তির স্ফূর্তি থেকে, ব্যক্তিত্বের বিকাশপথ থেকে, পৌরুষ ও বীর্যের মুক্তিপ্রবাহ থেকে স্খলিত, বিপথচালিত, ব্যর্থ হয়ে পরাভবে, বিষাদে, 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' বিক্রীত অবসন্নতায়, যন্ত্রের পায়ে যান্ত্রিক আত্মসমর্পণে, তার তরুণ দীপ্তিদ্যুতিকে নিরন্তর খুইয়ে চলেছে। সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অন্যতম প্রজ্বলন্ত পংক্তিবিন্যাস তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতায়: "আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে / কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।" তারুণ্য-শক্তির এই বিপুল অবক্ষয় রবীন্দ্রনাথ দুঃখে, ক্ষোভে আত্মগ্লানিতে 'এ আমার এ তোমার পাপ'-বোধেই নিরীক্ষা করেছেন, পথও বাতলেছেন উত্তরণের; 'বলাকা' 'ফাল্গুনী' 'মুক্তধারা' 'তাসের দেশ, 'বসন্ত' প্রভৃতি সাক্ষ্য।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মার্ক্‌স্ ও নান্দনিক (আদৌ নির্দ্বন্দ্ব নন) ভাবাদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের এই 'স্বীকারোক্তি'তে, হলফনামা নাই বা হলো, অব্যর্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন—স্ব স্ব ক্ষেত্রে, স্ব স্ব ভূমিকায়, স্ব স্ব লক্ষ্যে। (এবং অলক্ষ্যে।) একজন তাঁর সর্বস্বপণ সর্বহারা বিপ্লবের প্রেমে, 'Simplicity'-'strength'-'purpose'- বিমিশ্র সংগ্রামে, 'to fight'; অন্যজন তাঁর অখণ্ড

বিশ্বহৃদয়বান মনুষ্যত্ববাদী বাঙালিপ্রতিম আত্মস্থতায়, মিলিত 'সত্য-নিষ্ঠা' ও 'জীবে প্রীতি'র সুষ্ঠু সুস্থ সমন্বয়ের স্বীকরণে।

কবি তাঁর জীবন-মধ্যাহ্নে লিখেছিলেন, 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে'—প্রাচীন-ভারতবোধে উদ্বুদ্ধ বিশ্বভারত-তীর্থংকর সেই স্বপ্নাতুরতা মূল্যবান হলেও, অধিকতর বাস্তব-নির্ভর বলিষ্ঠ বোধের সাক্ষাৎ মেলে তাঁর জীবন-সায়াহ্নে আলোচিত 'সভ্যতার সংকট'-এ ; 'ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে' এবং 'মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই'। এখানে এই পৌনঃপুনিক পূর্বদিগন্ত কি কেবল এই ভারতবর্ষ, না সেই বৃহত্তর য়ুরোপেশিয়া, যেখানে তাঁর "শিশুতীর্থে"র পরিত্রাতা জন্মেছেন, যেখানে বর্তমানে আসন্ন 'পবিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে'? যেখানেই হোক, এটা স্পষ্ট যে, যেখানে যত দুঃখ ও নিপীড়নের প্রতিকূলন। সেখানেই তত অকুতোভয়, জাগরণ, অভ্যুত্থান, 'সুপ্তির পর্যঙ্ক'-কাঁপানো 'জয়ডঙ্কা', প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ, অতঃপর শান্তি। একইসঙ্গে শক্তি-সংহত সংগ্রামী অভিযান ও নবজন্ম-জীবনের প্রতিশ্রুতি। যুগপৎ কল্পান্তিক কুরুক্ষেত্র ও শান্তিপর্বে মহাপ্রস্থান। 'Historic observation shows that there are many modes of change, other than dialectic opposition: maturation, mimesis, mutual aid are all as effective as the struggle between opposing classes. In failing to take in the diverse modes of change, Marx compelled himself to overlook a good "part of human history".' ভারত-ইতিহাসের সন্ধানেও মানব-ইতিহাসের সাধনা রবীন্দ্রনাথ বেশ মুগ্ধ চোখেই লক্ষ্য করেছিলেন: 'বৈচিত্র্যেই ঐক্য'। সব সত্ত্বেও তাই 'Mutual Aid'-প্রণেতা পিটার ক্রোপোট্‌কিনের মতো, 'News from Nowhere'-খ্যাত উইলিয়াম মরিসের মতো তিনি (অভ্যুত্থান ও অভিযান সমেত) সহযোগ-সংযোগ-সমন্বয়-সঙ্গমে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মর্ত্য থেকে বিদায়কালে মানুষের প্রতি শেষ বিশ্বাসঘোষণার দুর্মর আশাবাদে কি তারই প্রতিধ্বনি? অর্থাৎ পাশ্চাত্যশক্তিদীপিত সংগ্রামী লক্ষ্যভেদ ও প্রাচ্য কল্যাণ আদর্শের অন্তর্গূঢ় দৃঢ় সাক্ষাৎ কি সত্যই যুগপৎ সম্ভব?—ভলাচল শ্রেণীবিভক্ত বিদ্বেষের নৈরাজ্যে, যেমন 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীতে, রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'কে একদেহে রাবণ ও বিভীষণে অভিন্ন করেছিলেন। ভাবতে বেশ, কিন্তু কার্যত অসম্ভব মনে হয়—সাম্প্রতিক কালের এ-পর্যন্ত

শিক্ষাদীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাই বলে। অবশ্য মার্ক্‌স্‌ ও রবীন্দ্রনাথ স্ব স্ব ভাবে ও প্রভাবে সভ্যতার অন্তিম আলোকাগ্নি-রঞ্জিত নবদিগন্তে, কালান্তরে, তবু হয়তো একত্রই উপনীত হচ্ছেন :

এইসব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুণে নিতে
ব্যাপ্ত হতে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।[৫]

---

১ যাঁর রচনাবলী 'একই সঙ্গে একটা তত্ত্বদর্শন এবং কর্মসূচী'।

২ যাঁর গানে তৎকালীন বিপ্লবশিবির সোভিয়েট রাশিয়া অভিভূত হয়ে লিখে পাঠায়, P. S. Kogan সেই স্বীকৃতির মুখপাত্র : 'Our Revolution does not reject the hope of a *Golden Age* of a future brotherhood of humanity...That is why the songs of Tagore are resounding in our hearts as a beautiful call for liberation'.

৩ 'History (to Hegel) is a dialectical movement, almost a series of revolutions, in which people after people, and genius after genius, become the instrument of the Absolute. Great men are not so much begetters, as midwives, of the future ; what they bring foth is mothered by the *zeitgeist*, the Spirit of the Age.···Feuerback, Moleschott, Bauer and Marx returend to the scepticism and "higher criticism" of Hegel's youth and developed the philosophy of history into a theory of class struggles leading by Hegelian necessity to "socialism inevitable".'

Will Durant, The Story of Philosophy.

৪ দ্রঃ পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, 'পাঠকগোষ্ঠী' ৫ জীবনানন্দ দাশ

"I believe that an artist can glean much that is essential to him from philosophy of all kinds. Finally, I absolutely agree with the view that in matters concerning the art of writing... and···in deriving this kind of views both from...artistic experience and from philosophy, even if idealistic phisosophy··· can arrive at conclusions that will be of tremendous benefit to the workers' party." (to Gorky) "...Art belongs to the people. Its roots should be deeply implanted in the very thick of the labouring masses. ···It must unite and elevate their feelings, thoughts and will. It must stir to activity and develop the art instincts, within them." (to Zetkin) LENIN

"নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী/হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?" যেমন এই উচ্চকিত জিজ্ঞাসা, তেমন তার প্রস্ফুট উত্তরের উত্তীর্ণ উচ্চারণ—"কোথাও আঘাত ছাড়া— তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।" এবং অন্যত্র, এই এক ও অনন্য জীবনানন্দ অগ্রসর-সূর্যালোকে তৎপর ভোরের দিগন্তে, ধূসর রক্তাল্পতায় নয়, দ্যুতিমান রক্তাক্ততায়, চেয়ে বলেন : 'এ ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয়/এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।' জীবননাট্যে যেহেতু এই তৃতীয় অঙ্কের সঙ্কট মৌল, সেখানে উত্তরণও গুরুত্ব-পূর্ণ, তাৎপর্যময়। ইতিহাসের প্রকৃত নায়কেরা এখানে দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ হন, 'শুদ্ধির তাণ্ডবে', চূড়ায়, অতঃপর বাঁক নেন পঞ্চমে। আগুনে লক্ষণ ও লক্ষ্যগুলি কালক্ষয়ে অরুণোদয় থেকে মধ্যাহ্নে আলোকিত-ঝলসিত হয়ে ওঠে। সবিশেষ লেনিনের মতো মহানায়কে, তাঁর রুশ দেশকাল সমেত, সেদিন এ-জিনিস কেমন তুমুল ও উদ্বেল প্রত্যক্ষ ফুটে উঠেছিল! ওয়েল্‌স্‌, রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, তখনকার অমার্ক্সীয় নিরপেক্ষ মানববাদীরাও সেই সার্থক সাফল্যের কথা, তাঁরও কথা, স্ব স্ব সশ্রদ্ধ সমীক্ষায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিচারে-বিশ্লেষণে অঙ্গীকার ও আলিঙ্গন ক'রে গেছেন কৃতনিশ্চয়তায়।

অবশ্য কবি ও কর্মীর নিশ্চয়তা-চেতনা বিভিন্ন। যুগ-যুগব্যাপী শোষণ-পীড়নের ভীষণ চলচ্চিত্র কবির কাছে এতাবৎ ইতিহাসের সত্যস্বরূপ হ'য়ে ওঠে এমনি ধ্রুবপদ প্রতীকে : 'ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়', আর তাঁর 'তিমিরবিনাশী' ইচ্ছার স্বরব্যঞ্জনে এই 'গভীর-গভীরতর অসুখ'-স্পন্দিত হৃদয়সংবাদ এমনিতর শব্দ হ'য়ে বাজে : 'নতুন যুগের জন্য তবুও প্রয়াণ করা ভালো' এবং পূর্বোদ্ধৃত : 'কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই'। আর কর্মী ঠিক তখনই ন'ড়ে চ'ড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন, ডাক দেন, গর্জে ওঠেন : নতুন যুগের জন্য তবেই প্রয়াণ করা ভালো। তফাৎ তো শুধু এই অব্যয়ঘটিত বাগ্বিধির নয়, রীতি-নীতি-প্রক্রিয়ারই, সামগ্রিক কবিধর্ম-কর্মদীপ থেকে কর্মীর যজ্ঞশালে জ্বলন্ত মশাল আকৃতি-প্রকৃতিতে আলাদা—অন্তর্লীন অন্ধতামোচনী আবেদনে যে-সাযুজ্য-সাম্যই থাক কবি প্ররোচনা দেন, কর্মী আহ্বান করেন ; কবি নড়ান-চড়ান, কর্মী জড়ো করেন ; যদি তাঁর 'ডাক শুনে কেউ না আসে', তবু কবি না-থেমে একলাই চলেন ; কর্মী বহুকে নাড়িয়ে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে সংগ্রাম-কেন্দ্রের যথাস্থানে উদ্যত উদ্ধত ক'রে দাঁড় করান, সমূহ স্বতঃক্রিয়তায় সংক্ষেপে কবি সন্দিগ্ধ দগ্ধ. বিদ্ধ ক'রে তোলেন, 'to listen to the revolution with the heart'; কর্মী সকর্মক হ'তে দেন, বলেন : 'Revolution is a festival of the oppressed and the exploited.' তাই কবির 'তবুও' হয়ে ওঠে কর্মীর 'তবেই'—কবির পথ হয়ে ওঠে কর্মীর শপথ। প্রথমে যা প্রায়শঃ প্রচ্ছন্ন অভীপ্সা, দ্বিতীয়ে তা সতত-সুস্পষ্ট অভিপ্রায়, তৎপরতা, সংগ্রাম। একজনের কল্পনা, অন্যের সঙ্কল্প

এবং ক্রান্তিকালে, আসন্ন বিপ্লবের আগ্নেয় ধূমে প্রবল প্রভূত জনচেতনা ও কর্মপ্রবৃত্তি বহ্ন্যুৎসবে জেগে ওঠে। 'At no other time are the mass of the people in a position to come forward so actively as creators of a new social order, as at a time of revolution.' এমতাবস্থায় যে-আগুন তাঁরা জ্বালিয়ে দেন, 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে', সে-আগুনের ঋত্বিকেরা, জেগে-জেগে জাগিয়ে-জাগিয়ে জ্বলতে থাকেন, জ্বালতে থাকেন, সুমহান কর্মযোগের যজ্ঞে 'জনগণমন-অধিনায়কে'রা, অনেকদিন-অনেককাল। বহু-আকাঙ্ক্ষিত এমন এক ক্রান্তিকালীন চালনশক্তিধর নায়কপুরুষ রাশিয়ায় এসেছিলেন—গত শতাব্দীর বর্ষশেষ ও বর্তমান শতকের প্রারম্ভে, লক্ষণীয় যে, ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'The Development of Capitalism in Russia' একটি উপযুক্ততম গুরুত্বপূর্ণ Prelude,

লেনিনের —এমন এক সত্য-'শক্তিমান'-এর জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দুর্ভাগ্য-পীড়িত ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন : 'দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত, তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের চেষ্টা একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত—আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।' লেনিন জার-উৎপীড়িত রাশিয়ায় আসতেই, কাজে নামতেই, বৃহৎ বিচিত্র একটি ভূখণ্ড ঐক্য লক্ষ্যমুখী চরিতার্থতার সাধনক্ষেত্র হয়ে উঠল জেগে উঠল দেশ। 'অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন' ১৯০৫-এর সাময়িক নিষ্ফলতার অন্তে সত্যই তিনি এলেন, জ্বাললেন, জয় করলেন কেবল স্বদেশহিতে নয়, সামগ্রিক বিশ্বহিতে।

বস্তুত তাঁর দৃষ্টি, সৃষ্টি, কর্মক্ষমতার দৃষ্টান্ত ছিল, সর্বজনহিতায়, প্রকৃষ্ট ও পরমতম আজ সমাজসংগঠনগত, সাংস্কৃতিক চেতনাগত আমূল পরিবর্তনী সেই প্রবল কীর্তি ও প্রচুর কৃতিত্বের মাহেন্দ্রলগ্নের পর সাতষট্টি বছর অতিক্রান্ত; মার্কসীয় পন্থায়-পদ্ধতিতে দেশে-দেশে তদবধি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষিত বিপ্লব-বিবর্তনের ধাপে ধাপে কতিপদ স্ব-স্বকীয় প্রথমশ্রেণীর নেতাদের পাশে তথাপি লেনিন, এক আদি-অকৃত্রিম সত্তম দৃষ্টান্ত এবং মহত্তম, এখনও। কেন? সেটিই এখন বক্তব্য।

লেনিন কেবল সুপরিকল্পিত কর্মযোগের নয়, সুকল্পিত জ্ঞানযোগেরও প্রতিভূ। পার্থিব-প্রীতি-স্নিগ্ধতায় অসামান্য দরদী মনুষ্যত্বে, আতলস্বচ্ছ কল্পনা-প্রতিভা ও যুক্তিব্রতী অন্তর্দৃষ্টির এক অসাধারণ 'সাধারণ' মানুষ তিনি। একটা দুঃসহতম, দুঃসাহসিকতম ক্রান্তিকালে তিনি অবস্থান, সংগ্রাম ও উত্তরণ করেছিলেন। দেশকালপাত্র অনুযায়ী তাঁর বিরল শক্তিসামর্থ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগৌরব তাঁর অসাধারণ প্রখর কাণ্ডজ্ঞানে, নিকট-দূর-দৃষ্টির প্রগাঢ় মর্মবোধে, অন্তর্ভেদী অবস্থা-বিশ্লেষণে, দুর্মর সৃষ্টি-পিপাসায়, অবিমিশ্র মানবমুগ্ধতায় নিহিত। এজন্যই তিনি একচক্ষু ছিলেন না, পরন্তু মাত্র সমদর্শী দ্বিচক্ষুষ্মান ছিলেন বললেও অল্প বলা হয়। তিনি তাঁর ভাবে এক তৃতীয় নেত্রেরও অধিকারী ছিলেন। যেজন্য তাঁর কঠোর কর্মকাণ্ডের সমগুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় তাঁর জ্ঞানপ্রীতিউদ্দীপক শিখাগুলি এখনো আমাদের কাঁপায়, ভাবায়, বিচলিত ও ব্যাপ্ত করে দেয় আলোড়িত উদ্বোধনে। তাঁর অতুল্য সততা ও মহত্ত্বের চাবিটি, বলা বাহুল্য, তাঁর দুর্লভ জ্ঞানকর্মপ্রেমের ত্রিধায় আবদ্ধ। ত্রিধা, কিন্তু বিভক্ত নয়, ঐক্যযুক্ত।

ঐতিহাসিক অক্টোবর-নভেম্বর বিপ্লবের উদ্গাতা, প্রতিষ্ঠাতা, বিরাট বিশাল রুশভূমের মুকুটবিহীন জনগণ-অধিনায়ক লেনিন সম্পর্কে তাই এতগুলি বিভিন্ন উচ্চারণ অটুট মাল্যৈকসূত্রে খুব সহজেই গাঁথা যায় : '···the name of that thunderstorm is—Lenin', '···of the vigour and illuminating wisdom of that first leader of mankind who fearlessly proclaimed new laws···', 'From his youth, Lenin, the romantic and realist···had awakened and reached out towards freedom, eager for a dignified human existence', 'he was not only a politician but also a philosopher, the first person ever to work out practical ways for the whole of mankind to go over to a classless society', 'Lenin, simple and modest, whole-hearted in friendship and work···is an envoy of hope and love'—সব মিলিয়ে সত্যসত্যই এক অভিনবীন 'ভোরের কল্লোল'।

সেই অদ্বিতীয় লেনিন আজ আমাদের আলোচ্য— তাঁর সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চেতনার ভূমিকায়, যেখানে তিনি মার্ক্সীয় হয়েও বিশিষ্ট, কচিৎ কখনো যদি তর্কাতীত না-ও হন, তবু আশ্চর্যধরনে আত্মস্থ, অপূর্বভাবে মৌলিক ও অবশ্যম্ভাবীরূপে অপরিহার্য।

মূলত লেনিন কেবল 'রিয়ালিস্ট' ছিলেন না, তিনি 'রোমাণ্টিক' ছিলেন—কারণ রোমাণ্টিকরা উন্নততর স্বপ্ন দেখেন, নবীনতর কল্পনা করেন, রিয়ালিস্টরা কার্যত সেই দুর্ধর্ষ ও দুর্মর স্বপ্নকল্পনাকে 'রূঢ় রৌদ্রে' বাস্তবায়িত করেন, ফুলকে ফলে এবং ফলকে বীজে পরিণত করেন। 'নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে' বৃষ্টিধারার জলসেক করেন, মাত্র 'পুরাতন পর্ণপুট' 'দীর্ণ' 'বিকীর্ণ' করেন না ; স্বয়ং লেনিনের কথায় 'to distingulsh the decomposition of the old from the first shoots of the new' —'জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার' দিতে 'জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে বাহিরায় ফল'—তাঁর স্বরূপ এমনি 'ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল, অক্লান্ত অম্লান'। যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মযোগী এই রুশ মনীষী, এই প্রীতিপ্রসন্ন তাপস কীভাবে কতদূর কত গভীরে গিয়েছিলেন, মানবকল্যাণে মানবসৃষ্টির কত রসরহস্যে ডুবেছিলেন, চিরায়ত ও সমকালীন সত্যকার কবি ও শিল্পীরা তাঁকে, তাঁর মুগ্ধ স্বপ্নচারিতাকে; তাঁর গূঢ় রূঢ় বাস্তবায়নকে কীভাবে অনুপ্রাণিত, আলোকিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল— কবি ও কর্মীর সেই সুবিরল সদর্থক বোঝাপড়াটাই আজ আমাদের বিশেষ লক্ষ্য।

কারণ স্বভাবে এবং সমন্বিত-সেভাবেই 'Lenin was the first and lasting love of all'—'The lofty truth was given utterance by an individual, who, making his appearance in the lethargic kingdom of human pedestrianism, forced people by the power of his intellect to listen to him, and after this to believe him. Out of this, Faith was born, and then Like-minded People.' এই মতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয় লেনিন-সম্পর্কে বিশদ-স্মৃতিপূত গোর্কির 'শিক্ষিত'-স্বীকৃত মনোভাব: 'He was venturesome by nature, but his was not the marcenary venturesomeness of the gambler ; in Lenin it was the manifestation of that exceptional moral courage which could only belong to a man with an unshakable belief in his calling, to a man with a profound and complete perception of his connection with the world, and the perfect comprehension of his role in the chaos of the world, the role of enemy of thot chaos.' কী প্রক্রিয়ায় ব্যাপক নৈরাশ্যনৈরাজ্যনাশা এই অভাবনীয় রূপান্তর ও কালান্তর মাত্র পাঁচদশকের আয়ুষ্মান তিনি মাত্র দুতিনটি দশকেই সেধেছিলেন?—এককথায় তাঁর পূর্বঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে প্রীতি-প্রজ্ঞা-কর্মের সুসমন্বিত স্বীকরণে। রুচি ও প্রেমের সংবেদনী সুকৃতিতে, রসলোক ও শিল্পসাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের যৌথ যোগে এবং সাধ্যমতো যাবতীয় একদেশদর্শী ভণ্ড পণ্ডিতি, কাপট্য ও মতিচ্ছন্ন গোঁয়ার্তুমির নিরন্তর বর্জনে, এবং ততোধিক অর্জনে, এজন্যই তাঁর যুবজন-জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সুপ্রিয়তম উপদেশ, উচ্চারণ ছিল মন্ত্রের মতো: 'Learn-Learn-Learn', 'Study-Study-Study' ; এমনটি কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মী-কর্মযোগীর কাছে, সবিশেষ অধিনায়কের কাছে সচরাচর আশাতীত। অথচ এই মৌল ও অবশ্যপাল্য সত্যশর্তগুলি তিনি তাঁর স্বভাব-সারল্যে এম্নি সহজ ক'রে তুলতেন ও বলতেন যে, বিস্ময়জনক সত্ত্বেও তা হতো সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর, ফলপ্রসূ, স্থায়ী। সর্বস্তরে তিনি খোলা মনে এগিয়েছেন, দিনে-দিনেই পরিণত হয়েছেন। 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকার সীমিত অথচ প্রতিশ্রুত সূচনাযুগ কোনো অলৌকিক উপায়ে বিশ্বখ্যাত বিশিষ্টতম সম্ভাবনায় মশালধরা USSR-NEP-এর যুগান্ত-যুগান্তরে এসে ঠেকেনি, ঋজু রাস্তাতেই আনীল অনলে তা জলেছিল ; ঘটেছিল, ঘটনার পর ঘটনার ঘনঘটায় ; কেবল সেগুলিকে ঘটাতে হয়েছিল রটাতে হয়েছিল

জনগণমন-অধিনায়কের সহজ নিপুণ রণনীতি ও কৌশলে। এবং তাঁর সব বিচক্ষণতা ও নৈপুণ্যে, চিন্তা-কর্ম-দক্ষতায়, ব্যক্তি-দেশগত ক্রমপরিণামে, পথে-পথের বাঁকে, ক্রমাগত প্রণোদনা-প্ররোচনা-প্রেরণা। যুগিয়েছে রুশ ও বিশ্ব সাহিত্যের সুমহান শিল্পসৃষ্টি, যুগসঞ্চিত ও 'অর্জিত' মনস্বী-গুণী মানুষদের অন্তঃসারবান ভাব ও ভাবনা, কবি-কথাসাহিত্যিক-অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও প্রত্যয়। এবং 'This was no miracle'। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এই এক ইতিহাস। তিনি প্রকৃত প্রজ্ঞায় জানতেন, 'সুকান্ত' উপলক্ষে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন লিখেছেন, 'কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা'।

এবিষয়ে প্রথমেই তাঁর জীবন ও কর্মসঙ্গিনী শ্রীমতী ক্রুপস্কায়ার বর্ণনা আত্যন্ত লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন- -ইলিচের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন যে-কমরেড, তিনি তাঁকে বলেন যে, ইলিচ পণ্ডিত লোক, কেবল তত্ত্বগ্রন্থ পড়েন, একটি উপন্যাসও জীবনে কখনো পড়েননি, কবিতা ছোঁননি। শ্রীমতীর অবাক লাগে। কারণ স্বয়ং তিনি কৈশোরেই সমস্ত চিরায়ত সাহিত্য পড়ে শেষ করেছেন প্রায় গোটা। লেরমন্তভ তাঁর মুখস্থ ছিল, চের্নিশেভস্কি, তলস্তয়, উস্‌পেন্‌স্কির মতো লেখকেরা তাঁর জীবনে ছিলেন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তারপর কাজের মধ্যে ইলিচকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনে তিনি দেখলেন, লোকজন সম্পর্কে মতামতে, বৃহত্তর জীবন ও মানুষ প্রসঙ্গে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি। এবং ক্রমেই তাঁর 'পরস্মৈপদী'-পূর্বভ্রান্তির নিরসন ঘটল। তিনি বুঝলেন, লিখেছেন ; 'যাতে মানুষের জীবনের কথা বলা হয়েছে তেমন বই যিনি কখনো স্পর্শ করেননি, এমন এক মানুষ-মূর্তি আমি জীবন্ত লেনিনের মধ্যে পাইনি'। সাইবেরিয়ার দীপান্তরে গিয়েই তিনি জেনে ফেললেন যে, ইলিচ চিরায়ত সাহিত্য পড়েছেন, তাঁর চেয়ে কম নয়। একবার নয়, বারবার পড়েছেন। যেমন তুর্গেনেভ। সাইবেরিয়ায় পুশকিন, লেরমন্তভ, নেক্রাসভের বই সঙ্গে নেন। ইলিচ সেগুলির ঠাঁই করেন তাঁর খাটের কাছে, হেগেলের পাশেই—যে-হেগেল 'দ্বান্দ্বিক-ভাববাদী দর্শনের এক চূড়ান্ত, যাঁর উপর স্বয়ং মার্কস্‌ তাঁর মতো করে দাঁড়িয়েছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় সেগুলি বার বার পড়া হতো। পুশকিন ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়। প্রসঙ্গত নাট্যপ্রযোজক নিওনিদ ভার্পাকৃভস্কি উল্লেখযোগ্য : 'A man with high degree of culture and fine emotions, he was always, when speaking about art, sensitive to the complex world of the artist and his work. Acknowledging the great power of art, Lenin found time to make a serious study of it. Even at

the age of 14 he understood how deeply Chernyshevsky's novel 'What is to be Done ?' affected his entire cast of thought.'

ক্রুপস্কায়া পুনরায় : লেনিন প্রসাদগুণেরই ভক্ত ছিলেন না শুধু। যেমন চের্নিশেভস্কির 'করণীয় কী' উপন্যাসখানি তিনি ভালবাসতেন খুব, যদিও শিল্প-আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা ছিল কাঁচা, দুর্বল। বস্তুত চের্নিশেভ্স্কির কাছে তিনি পুশকিন, গোগল, তুর্গেনিভ ও তলস্তয়ের চিন্তা-শিল্পনৈপুণ্য আশা করেন নি, ক্রুপস্কায়ার কথায়, তিনি তাঁকে ভালোবাসতেন 'তাঁর সার্মগ্রিক অবয়বে'। অন্যত্র তিনি তাঁর লেনিন-চিত্তাকর্ষক সেই সমগ্র ব্যক্তিত্বের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন : 'As a personality, Chernyshevsky influenced Ilyich by his uncompromising character, his steadfastness, by the dignity and pride with which he bore his incredibly hard fate. When times were hardest, and there were some critical moments in Party work to be endured, V. Ilyich was fond of Chernyshevsky's observation that going through revolutionary struggle is not the same as walking along the pavement of Nevsky Pospekt.' সত্যই বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কিন্তু সে-বিষয় উপন্যাসাকারে মনের মতো ক'রে তুলতে পারেন মাত্র কেউ-কেউ, চের্নিশেভস্কি তেমনি একজন। "তখনো সোভিয়েত যুগ সুদূর—জারতন্ত্রেরই আধিপত্য দেশজোড়া। কাজেই চের্নিশেভ্স্কি তাঁর বিপ্লবী কাযকলাপের জন্য কারাগৃহে আবদ্ধ···(অবস্থায়) লিখলেন তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'করণীয় কী'···সমগ্র ক্রান্তিপর্ব জুড়ে এ-উপন্যাস বিপ্লবী রুশ যুবশক্তির প্রধান পাঠ্য ছিল।" এজন্য প্রধানত, এবং অন্যান্য কারণে লেনিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। যেমন সমালোচনা ও বিতর্কতৎপর হয়েও তলস্তয়প্রসঙ্গে ছিলেন সশ্রদ্ধ ঋণস্বীকারে অকৃপণ। তাঁর সুবিখ্যাত 'তলস্তয় সম্পর্কে প্রবন্ধনিচয়ে' মাত্র নয়, বহুবার বহুভাবে, সবিশেষ তাঁর সমকালীন সুহৃদলেখক গোর্কির কাছে, তিনি যুক্তিযুক্ত অথচ স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাসে তলস্তয় সম্পর্কে বিস্ময়-বিস্ফারিত সানন্দ সম্ভ্রম প্রকাশ করেছেন। স্মরণীয় গোর্কির সেই কবোষ্ণ স্মৃতিচারণ :

একদিন ওঁর কাছে গিয়ে দেখি ডেস্কে রয়েছে 'যুদ্ধ ও শান্তি' বইখানা। 'হ্যাঁ, বল্‌বার মতো বটে! তলস্তয়! শিকারের দৃশ্যটা পড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু মনে পড়ল একজন কমরেডকে চিঠি লিখতে হবে। পড়ার সময় নেই একেবারে।

তলস্তয় সম্বন্ধে আপনার ছোট্ট বইখানাও পড়লাম সবেমাত্র কাল রাতে।" কুঁচকোনো চোখে হাসি ফুটিয়ে আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে একটু গলা খাটো ক'রে বললেন : "এ যে পাহাড়, অ্যাঁ! মানুষের মধ্যে কী অতিকায় পুরুষ! হ্যাঁ বন্ধু, একেই বলে শিল্পী···আর জানেন, আর-একটা জিনিস দেখে আমি আশ্চর্য হই। এই কাউন্টের আগে সাহিত্যে যথার্থ কৃষককে আর দেখা যায়নি।"

তাঁর কুঁচকোনো চোখ তখনো চকচক করছে—সেই চোখের দৃষ্টিপাতে আমায় বলছেন : "ইউরোপে তাঁর সমতুল্য কেউ আছে, বলুন তো?" উত্তরটা দিলেন নিজেই : "কেউ না।" হাতে হাত ঘষে উনি স্পষ্টতই পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন।

কিন্তু কেবল স্বদেশপ্রেমিক বা সাহিত্যরসিক পরিতৃপ্তি নয়, তলস্তয়কে নিয়ে তাঁর চিন্তা ও তর্কের অবধি ছিল না। সে-প্রসঙ্গ পরে আরো। আপাতত ঐ কথাক'টি আমরা স্মরণে রাখতে চাই : মানুষের মধ্যে কী অতিকায় পুরুষ!··· একেই বলে শিল্পী···এই কাউন্টের আগে সাহিত্যে যথার্থ কৃষককে আর দেখা যায়নি।···ইউরোপে তাঁর সমতুল্য কেউ আছেন?—কেউ না।

ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিকথায় ফিরে দেখি, চেনিশেভ্‌স্কি তাঁকে এতদূর আলোকিত করেছিলেন যে, লেনিনের মতো 'অপৌত্তলিক' ব্যক্তিও তাঁর দুটি ছবি সযত্নে 'তাঁর নিজস্ব' সাইবেরীয় অ্যালবামে রেখে দিয়েছিলেন, জন্ম ও মৃত্যুর বছর একটিতে লিখে। এমিল জোলার ছবিও ছিল। অন্য রুশ লেখকদের মধ্যে ছিলেন গের্ৎসেন ও পিসারেভ। একদা পিসারেভ পড়েছিলেন তিনি ভক্তের মনোভাবে।

লেনিনজায়া আরো লিখেছেন : 'মনে আছে, সাইবেরিয়ায় মূল জর্মানে গ্যেটের 'ফাউস্ট' বইখানিও ছিল, আর ছিল হাইনের একটি কাব্যগ্রন্থ।'—এ-জিনিস সাহিত্যপাঠে মার্কসীয় অনুসরণ বা অন্ধ অনুমোদন নয়, স্বকীয় অনুরাগ ভালো-লাগার গুরুগৌরবে 'মুক্ত' দায়িত্ববোধ ও পালন, মৌলিক সৌন্দর্য-প্ররোচনা।

ক্রুপ্‌স্কায়া লিখছেন : 'এর অনেক পরে, দ্বিতীয় দফার দেশান্তরে প্যারিসে ইলিচ সাগ্রহে পড়েছিলেন ১৮৪৮ সালের বিপ্লব নিয়ে উৎসর্গিত হুগোর্ কবিতা 'Chatiments', সেই রোমান্টিকদের মধ্যে রোমান্টিক একদা যা লিখেছিলেন নির্বাসিত অবস্থায়, গোপনে প্রচারিত হয়েছিল তা ফ্রান্সে।' ক্রুপস্কায়া স্বীকার করেছেন, কবিতাগুলিতে প্রচুর তরল বাগাড়ম্বর আছে, তবু বিপ্লবের গর্জন বেশ টের পাওয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে ১৯০৫-এর ব্যর্থ অভ্যুদয়কাল ফুরিয়েছে, ১৯০৯-এর প্রতিক্রিয়া ঘনিয়েছে, পার্টি চূর্ণ হয়েছে, কিন্তু বিপ্লবী প্রেরণা মরেনি। এসেছে মহাযুদ্ধ, 'ঘোর যুদ্ধফল', এসেছে নিদারুণ মন্দা ও মন্বন্তরী দুঃসময়: সেই সমরাগ্নির আন্তর্জাতিক আহুতিকালেও ইলিচ বারবুসের Le feu ('আগুন') বইটিতে আকৃষ্ট হন ও বিপুল গুরুত্ব দেন তার। এ-বইটি ছিল 'তাঁর তখনকার মনের সঙ্গে এক তারে বাঁধা'। উক্ত 'আগুন' বা 'আগুনের নীচে' উপলক্ষে স্বয়ং লেনিনের উক্তি হ'ল: 'একজন একেবারে অজ্ঞ সাধারণ একটি মানুষ কীভাবে একজন বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হলো, তার কাহিনী অসাধারণ শক্তি ও সততাসহ এই উপন্যাসে উপস্থাপিত।'

কেবল কাব্য-নাটক-উপন্যাস পাঠ নয়, মঞ্চাভিনয়েও মাঝে মাঝে লেনিনের বেশ আগ্রহ দেখা যেত। ক্রুপস্কায়া অবশ্য বলেছেন, নাটকের অকিঞ্চিৎকরতা বা অভিনয়ের অবাস্তবতায় ইলিচ খিঁচড়ে যেতেন। প্রায়ই এমন হতো যে, থিয়েটারে গিয়ে প্রথমাঙ্কের পর চ'লে আসতেন। কমরেডরা ঠাট্টা করতেন— টাকাটা জলে গেল। "কিন্তু একবার ইলিচ শেষ পযন্ত ব'সেছিলেন; যতদুর মনে পড়ে, তখন বোধ হয় ১৯১৫ সনের শেষ; বার্নে মঞ্চস্থ হয়েছিল তলস্তয়ের 'জীবন্ত শব' নাটকটি। সংলাপ জর্মান ভাষায় হলেও প্রিন্সের ভূমিকায় যিনি নেমেছিলেন, তিনি একজন রুশী, তলস্তয়ের ভাবনা তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তন্ময় হ'য়ে উদ্বেল চিত্তে ইলিচ অভিনয় দেখে যান।" লক্ষণীয়: এখানকার তন্ময়তা ও উদ্বেলচিত্ততা, কর্মযাজ্ঞিক লেনিনের; 'মানুষের মধ্যে সেই অতিকায় পুরুষ', সেই ইউরোপেও মান্যতম 'অতুল্য শিল্পী', 'সেই যথার্থ কৃষকের রূপকার' তলস্তয় মঞ্চারোপিত, অন্য-মাধ্যমারূঢ় হ'য়ে নাড়া দিচ্ছেন, হানা দিচ্ছেন তাঁকে। "মনে হয় সেটা ১৯২১ সনে ক্রপোৎকিনের সৎকারের দিন। দুর্ভিক্ষের বছর, কিন্তু তরুণদলে উদ্দীপনা প্রচুর। কমিউনে তারা শোয় প্রায়-নগ্ন তক্তার ওপর, রুটি নেই, 'তবে খুদ আছে', জ্বলজ্বলে মুখে ঘোষণা করল কমিউন-সভ্য ডিউটিরত ছেলেটি। নুন না থাকলেও সেই খুদ দিয়ে ইলিচের জন্য রান্না হ'ল খাসা মণ্ড। তরুণদের দিকে চেয়ে দেখলেন ইলিচ, প্রসন্নতায়…নিজেদের কাঁচা হাতের ছবি দেখাল তারা, ছবির মর্মার্থ বুঝিয়ে বলল। শুরু হলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন। ইলিচ কিন্তু জবাব না দিয়ে হাসলেন, উত্তর দিলেন পাল্টা প্রশ্নে: 'কী পড়ো তোমরা? পুশকিন পড়ো?' —'একদম না', ব'লে উঠল কে-একজন, পুশকিন তো বুর্জোয়া, আমরা পড়ি মায়াকভ্‌স্কি।' ইলিচ মৃদু হাসলেন, 'আমার মনে হয়, পুশকিন আরো ভালো।'"—এই সদা-

মনোহর সরল হাসির লেনিন। ('সৎ না হলে কেউ অমন করে হাসতে পারে না'—গোর্কির স্মৃতিতে মৎস্যজীবী গেওভান্নির কথা, গোর্কিকেই পাভলভ: লেনিনীয় মূল বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নোত্তরে—'সরলতা। তিনি একেবারে সত্যেরই মতো সহজ সরল'।) কেবল এখানে লক্ষ্য নন, কীসের পর কেন এই সত্যসন্ধ হাসি, সেটাই লক্ষণীয়। যুবকদের আতিশয্যে তিনি মৃদু হাসছেন, আর বিস্তৃত অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে প্রস্তুত তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে মৃদু ক'রে, তবু দৃঢ়স্বরে, হয়তো একটু গূঢ় করেই বলছেন, 'আমার মনে হয়, পুশকিন আরো ভালো।' পক্ষান্তরে: 'মায়াকভ্স্কির নাম উঠলেই তাঁর মনে পড়ত, এই কমিউনের উক্ত তরুণদের কথা, প্রাণস্ফূর্তিতে পূর্ণ, সোভিয়েত-রাজের জন্য মরতে প্রস্তুত। চল্তি ভাষায় আত্মপ্রকাশের শব্দ খুঁজে না পেয়ে যারা অভিব্যক্তির সন্ধান করছে মায়াকভ্স্কির দুর্বোধ্য কবিতায়। পরে অবশ্য ইলিচ মায়াকভ্স্কির তারিফ করেছিলেন সোভিয়েত আমলাতান্ত্রিক অবস্থাকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা তাঁর কবিতাগুলির জন্য।' এম্নি মুক্ত মনের মনস্বী মানুষ ছিলেন লেনিন—কোন ভণ্ড বাজে ওজর, কোন গোঁড়ামির প্রশ্রয় তাঁর কাছে কখনো ছিল না।

সমসাময়িক রচনার মধ্যে, তখন গোর্কি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ-প্রতিষ্ঠিত, মনে পড়ে, ক্রুপস্কায়া লিখছেন: যুদ্ধের ওপর লেখা এরেনবুর্গের উপন্যাসটি তাঁর ভালো লাগছিল। —'আরে জানো, জানো, এটা ঝাকড়াচুলো ইলিয়ার লেখা'—সোল্লাসে গল্প করেছিলেন তিনি, 'বেশ উৎরেছে।' সহজ উল্লাস বটে; কিন্তু সোভিয়েত-পোষিত 'পরিচ্ছন্ন' এই স্থূলেখক সম্পর্কে তাঁর ওজন-করা মৃদুক্তি 'বেশ উৎরেছে'। তখনো এরেনবুর্গ তাঁর প্রাপ্য পরিণতি পাননি—তিনি অপরিস্ফুট নবীনতায় টগবগ করছেন। লেনিনের মাত্রাজ্ঞান ছিল অমিত।

"আর্ট থিয়েটারে সেদিন ছিল গোর্কির 'নীচের মহল'। লণ্ডন কংগ্রেস থেকেই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে ইলিচ ভালোবাসতেন গোর্কিকে—ভালোবাসতেন শিল্পী হিসেবে, তাঁর ধারণা ছিল গোর্কি অর্ধস্ফুট একটা কথা থেকেই অনেক কিছু ধরতে পারেন।" শিল্পীর এই মরমী, মর্মভেদী দিকেই লেনিনের মনোযোগ ছিল সমধিক। 'গোর্কির সঙ্গে তিনি কথা বলতেন খুবই খোলাখুলি। তাই যেখানে গোর্কির বই নিয়ে অভিনয়, সেখানে তাঁর দাবি ছিল খুবই কঠোর।'—স্বয়ং গোর্কির প্রতি লেনিনের ঐতিহাসিক-গুরুত্বপূর্ণ পত্র-প্রতিপত্রে, বহু আলোচনায়, তাঁর স্মৃতিচারণেও, তা সমর্থিত। 'নীচের মহল' দেখার পর উনি বহুদিন থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। অভিনয়ের অযথা নাটুকেপনায় বিরক্ত হন ইলিচ। যা হোক, আরো একবার আমরা চেখভের 'ভানিয়া কাকু'

দেখতে যাই। কিন্তু বাড়াবাড়ি শুরু হতেই তিনি আর সইতে পারলেন না, অঙ্কের মাঝখানে উঠে পড়লেন।" (ক্রুপস্কায়া)। নাটকের এই অতিনাটুকেপনায় যেমন তাঁর ভয় ছিল, স্নায়ুতে সইত না, তেমনি সাধারণ সরল-তরল সংগীতেও তাঁর অনীহা ছিল। একবার 'চোখ কুঁচকে একটু বিষণ্ণভাবেই মৃদু হেসে' 'মস্কোয় ইয়ে. পা. পেশ্‌কভার বাড়িতে ব'সে বলেছিলেন', গোর্কির প্রত্যক্ষে : 'But I can't listen to music often, it affects my nerves, it makes me want to say sweet nothings and pat the heads of people who, living in a filthy hell, can create such beauty.' আবার সেজন্যেই তাঁর এ-সম্পর্কে, নিঃসার সংগীতের নয়, সসার সংগীতের মহান স্রষ্টাদের সম্পর্কে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল বহুগুণ : 'আহা! নোংরা নরককুণ্ডে থেকেও তাঁরা এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন!' প্রবল প্রাণের সাড়া-জাগানো গুণের সগর্ব সমাদর তিনি গভীরভাবে জানতেন। একই সান্ধ্য বৈঠকে তাই তাঁর এই পূর্বোক্তি স্মরণীয় : 'listening to Isaiah Dobrovein playing Beethoven's sonatas, Lenin said : "I don't know of anything better than the 'Appassionata', I can listen to it everyday. Amazing, superhuman music! I always think with a pride that may be naive : look what miracles people can perform!" 'people' অভিধায় তিনি যুগপৎ 'অসাধারণ' স্রষ্টা মহাপুরুষ ও তাঁর মহৎসৃষ্টির দৃষ্টি-অগোচর কিন্তু শ্রুতি-অনুচর 'সাধারণ মানুষে'র আশ্লেষ অনুভব করেন। এবং করেন ব'লেই শান্তিনন্দন স্বর্গবাস ফুরোতেই 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রার্থনা করেন, 'living in a filhy hell'-এর যাপনী যন্ত্রণা ও উত্তরণী মন্ত্রণায় মুহূর্তেই মনোযোগী হয়ে পড়েন, পূর্বসূত্রে কঠিন অকাপট্যে বলেন : 'But today we mustn't pat anyone on the head or we'll get our hand bitten off (কারণ বুঝি : 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় / পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' এবং 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য / ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা / চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য / কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া') ; we've got to hit them on the heads, hit them without mercy, though in the ideal we are against doing any violence to people. Hm-hm—it's a hellishly difficult office!' 'অদ্যে'র জন্মযন্ত্রণার সাময়িক কঠোর কর্তব্যে সুরের কড়ি ও কোমল আপাতঅকর্তব্য হ'লেও চিরঅকর্তব্য নয়। 'hellishly difficult office'-এর কাল যেহেতু অচিরকালে ফুরোবে, জয়ের

উৎসবে। তারপর চিরকাল থাকবে, চিরায়ত সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, সংস্কৃতিও থাকবে; মহাকাল তাদের অক্ষত অটুট রাখবে। কেননা 'কবি ছাড়া জয় বৃথা'।

সেই সোনালি ভবিষ্যতে চেয়ে, 'সোনার শত ছেলে'দের কথা ভেবে ভারাক্রান্ত, আচ্ছন্ন লেনিন প্রসঙ্গে গোর্কির এই লেখা তাই বারবার পড়ার মতো :

"আমার পুরনো পরিচিত এক ভদ্রলোক, নাম রা. আ. স্করোখোদভ, তিনিও আমারই মতো লাজুক মানুষ, শান্ত মেজাজের—তিনি চেকায় (প্রতিবিপ্লব, অন্তর্ঘাত, ফাটকাবাজি দমনে সারা রুশ জরুরি কমিশন) তাঁর কঠোর কাজের দরুন একদিন আমার কাছে আক্ষেপ করছিলেন। তাতে আমার মন্তব্য : 'মনে হয়, ওটা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক কাজ নয়। আপনি তেমন ধাতেরই নন।' তিনি বিষণ্ণভাবে সায় দিলেন : 'খুব ঠিক কথা—আমি একটুও ও-ধাতের নই।' একটু ভেবে নিয়ে আবার বললেন : 'তবু যখন মনে পড়ে যে, ইলিচকেও হয়তো অনেক সময়েই মনোবৃত্তি দমন করে চলতে হয়, তখন নিজের দুর্বলতায় লজ্জা পাই।'

"আমি বেশকিছু শ্রমিককে চিনতাম এবং এখনও চিনি। যাঁদের বিশেষ লক্ষ্য-সাধনের ব্রতে দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে হয়েছে এবং 'মনোবৃত্তি দমন করতে' হয়েছে—প্রকৃতই, নিজেদের ধাতকে 'সামাজিক আদর্শবাদে'র পক্ষে চাপ দিয়ে চলতে হয়েছে।

"নিজের সম্বন্ধে তিনি এত উদাসীন ছিলেন যে, এসব বিষয় নিয়ে কখনও কারও সঙ্গে কথা বলেননি— নিজের অন্তরে কোন ঝড় বইতে থাকলেও সেটা গোপন রাখতে লেনিনের চেয়ে ভালো আর কেউ পারতেন না। একবার মাত্র গোর্কি-তে যেন কার ছেলেমেয়েদের আদর করতে করতে বলেছিলেন : 'এরা আমাদের চেয়ে ভালো থাকবে, আমাদের যা-কিছুর ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে তার অনেককিছু এদের অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এদের জীবন অত কঠোর হবে না।' পাহাড়ের গায়ে শান্ত-স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে গ্রামটি- সেদিকে তাকিয়ে তিনি বিষণ্ন স্বরে বললেন : 'তবে, যা-ই হোক্ না কেন, এদের আমি হিংসে করিনে। আমাদের প্রজন্ম (generation) আশ্চর্য ঐতিহাসিক-তাৎপর্যসম্পন্ন একটা কাজ করতে পেরেছে। যে-অবস্থা আমাদের বরদাস্ত করতে হয়েছে, যা কঠোর ছিল আমাদের জীবন, সেটা সবাই বুঝবে এবং সেটার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হবে। সেটা সবাই বুঝবে—সবাই বুঝবে।"

অর্থাৎ 'শুদ্ধির তাণ্ডব'-ঘটিত যুগসন্ধির যাবতীয় কঠোরতা যৌক্তিকতা পালনের দায়িত্ববোধ এবং উচ্ছল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাকুলতা এখানে অন্তঃক্ষরণে ঝ'রে

ঝ'রে পড়ছে। এমন একটি আশ্চর্য সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের অধিকারী ছিলেন লেনিন—'a complete man'।

'নোংরা নরককুণ্ডের মধ্যে থেকেও যাঁরা এমন সুন্দর সৃষ্টি করতে পারেন', তাঁদের তিনি 'আশ্চর্য অতিমানুষিক' মনে করেন—শ্রান্তক্লান্ত মানুষদের দোরে দোরে ঘরে ঘরে মনে মনে সেগুলি তিনি পৌঁছে দিতে চান। তাই জনযুদ্ধ-জয়ের অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁর সেই দেশ-দেশান্তরী শিক্ষা ও বিদ্যুতীকরণের মহাপার্বণ, নব-মানব রূপায়ণের পালা, উদ্যোগপর্ব আরম্ভ হলো।

সেই বিপুল কর্মকোলাহলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কেবল 'ইনডাষ্ট্রি' নয়, আর্ট-গঠন-সংগঠন ব্যাপারেও তাঁর ঔৎসুক্য, উৎসাহ অনির্বাণ জ্বলতে দেখি। মাঝে মাঝে বাধ্যতামূলক স্তিমিতভাব এলে তিনি আক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন। সময়ের তালে স্বভাবের চাহিদায় তিনি কিছুতেই পিছিয়ে পড়তে চাননি, তাই এম্নি ঘটনা ও সংলাপ তাঁকে নিয়ে গোর্কি লিখে যেতে পেরেছেন, 'তাঁর' রীতিমতো সূক্ষ্মতর কবিতা-ভাবনাই যাকে বলতে হয়। একবার লেনিন : "একটু আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, 'আমার পড়ার সময় নেই একেবারেই।···কী বেজায় পরিমাণ কবিতা লেখা হচ্ছে, দেখছেন তো? পত্রপত্রিকায় পাতার পর পাতা ভর্তি কবিতা, তার ওপর নতুন নতুন কাব্যসঙ্কলন বেরোচ্ছে প্রায় রোজই।'—আমি বলেছিলাম, 'এখন যা সময় তাতে নবীনদের কাব্যে আগ্রহ স্বাভাবিক, তাছাড়া আমার মনে হয়, ভালো গদ্যের চেয়ে মাঝারিধরনের কবিতা লেখা সহজও বটে।' আমি বলতে চেয়েছিলাম, কবিতা লিখতে সময় লাগে কম, ছন্দঃপ্রকরণের শিক্ষকও আমাদের অনেক। তিনি ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলেন : 'গদ্যের চেয়ে কবিতা লেখা সহজ—এ আমি বিশ্বাস করি নে। এ আমি ভাবতেই পারি নে।'" এই অবিশ্বাস এবং বিশ্বাস (কবির ক্ষমতায়) বিশিষ্ট কর্মযাজ্ঞিকের অসামান্য মূল্যায়ন-কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত। তবু কবিতায় তাঁর আরো কত বড়ো চেতনাপ্রত্যয় ছিল, তাঁর শেষ জীবনের বিশেষ প্রিয় কবি দেমিয়ান বেদনির প্রতি প্রযুক্ত তাঁর মন্তব্যে তার প্রমাণ পাই। কালোচিত-কালোত্তীর্ণ উভয়ত্র ছিল তাঁর সজাগ বিচক্ষণতা, স্বয়ং গোর্কির সাক্ষ্যে সেই পথনির্দেশ : 'He frequently and with strong emphasis referred to the value of Demyan Bedny's work for propaganda, but added : "It is somewhat crude. He follows the reader whereas he ought to be a little way ahead."' এবং মায়াকভ্স্কি সম্বন্ধেই বা গোর্কিকে তিনি কেন একথা বলেছিলেন, তা ভাববার মতো।—'He mistrusted Mayakovsky, and was even rather

irritated by him. "He shouts, invents some sort of distorted words, and doesn't get anywhere in my opinion—and besides it is incomprehensible. It is all disconnected, difficult to read. He is talented? Very talented even? Hm-hm. We shall see." কী তিনি দেখেছিলেন, পেয়েছিলেন সত্যিকার—ক্রুপস্কায়ার বর্ণনায়, সেই কমিউন তরুণদের প্রসঙ্গে, আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। উপস্থিত যে তিনি গোর্কির মুখের ওপর তাঁর নিন্দা করছেন, সে কেবল মায়াকভ্স্কির 'ফিউচারিস্ত' ভাষাভঙ্গি-বিপ্লবের দুর্বোধ্যতা নয়, তাঁর তৎকালীন 'জনরুচির মুখে থাপ্পড়'-মারা ঘোষিত উদ্দামতাও নয়, তা তাঁর অতিরিক্ত লম্ফঝম্প, হাঁকাহাঁকি, হাঁসফাঁস, 'বিকৃত' বেয়াড়া শব্দবাহু, উৎক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত আওয়াজ, যা কোথাও নিয়ে যায় না, পৌছে দেয় না। অথচ এই 'পৌছে দেওয়া'র কাজটাই যে কবির পক্ষে সবচেয়ে দরকারি পরম কাজ—লেনিন তা যে-কোনো বড়ো নন্দনতাত্ত্বিকের মতোই চরমভাবে জানতেন।

অবশ্য কাব্যকলা ও সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে বহুব্যাপী পরীক্ষানিরীক্ষা, অনেকক্ষেত্রে তার অতিরেককেও তিনি মানতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন: 'It must be acknowledged that many experiments, besides, are being made in our country—alongside serious things we have much that is childish, immature, consuming strength and resources. But, evidently, creative life requires a certain wastefulness in society, as in nature, too.' তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল মহৎ, 'to organise a broad, multiform and varied literature', 'enriching the last word in the revolutionary thought of mankind'—নতুন জীবনের প্রত্যয় প্রতিষ্ঠায় শতসহস্র সাধারণ মানুষের চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামে লেখক-শিল্পীকে তাদের অশৌখিন আত্মীয়-অংশীদার ক'রে তুলতে, অবশ্যই এহেন সমগ্র প্রক্রিয়ার যথাযথ একাত্মতায়, তার সঙ্গততম প্রতিফলনে।—'the socialist-realist artist portrays this process not from the standpoint of an observer on the sidelines, but from the standpoint of a participant in this process.'—এর মানে যে দলীয়তাই নয় কেবল, এ-ধরনের প্রথম ও প্রধান শিল্পী স্বয়ং গোর্কির পূর্বপর 'অদলীয়তা'য় তার প্রমাণ আছে। সকলেই জানেন, মায়াকভ্স্কি, সবিশেষ গোর্কি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য পর্যন্ত ছিলেন না। লেনিন

তাই লিখেছিলেন, 'Everyone i· free to write and say whatever he likes, without any restrictions' ; কিন্তু দলে যোগ দিয়ে, দলে থেকে দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরুদ্ধাচরণ কি সহনযোগ্য ? পৃথিবীর কোথাও কোন-দলমত-সমিতিই তা হ'তে দেয় না, সহ্য করে না। বরং যে-শিল্পস্বাধীনতার প্রস্তাব তিনি করেছিলেন তা পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজ ও অর্থনীতি দিতে পারে না, দেয় না। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায়, দলীয় বা নির্দল, মুষ্টিমেয় স্ফীতোদরের নয়, অসংখ্য জনস্বার্থের সাঙ্গীকৃত সাহিত্যই সত্য-সত্য 'মুক্ত' সাহিত্য, '···because the idea of socialism and sympathy with the worklng people, and not greed or careerism, will bring ever new forces to its ranks.' (শক্তিমান এফতুশেংকো তাঁর একটি কবিতায় যেমন বলেছেন : 'Do not trade on your genius for gain/to gather iove-trophies as plunder,/ Do try to shut frınge benefits of your station/—So do not stoop to conquer ··') 'It will be a free literature, because it will serve, not some saturated heroine, not the bored "upper ten thousand" suffering from fatty degeneration, but the millions and tens of millions of working people—the flower of the country, its strength and its future· It will be a free literature, enriching the last word in the revolutionary thought of mankind with the experience and living work of the socialist proletariat, bringing about permanent interaction between the experience of the past (scientific socialism, the completion of the development of socialism from its primitive, utopian forms) and the experience of the present (the present struggle of the worker-comrades).'· "This was no miracle. It was life. It signified struggle ! And the victory of the working class." তাই ব'লে শিল্পভাবনা ও রূপায়ণ-পদ্ধতির নৈপুণ্য ছককাটা ও জলবত্তরল ব্যাপার নয়, হতে পারে না। তিনি লিখেছেন : 'There's no question that in this field greater scope must undoubtedly be allowed to personal initiative, individual inclinations, thought and fantasy, form and content.' যা থেকে, যা দিয়ে এবং নিয়ে এমন নতুন নান্দনিক মানবসত্য-সমীক্ষা গড়ে উঠবে, এমন উদ্ভাবন এবং

আবিষ্কার, জীবননীতির গভীরতর বোধে, অনুভূতি ও যুক্তির, বিচার ও বিবেকের এমন সমবায়ে—পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব-দেখা-দেখানো আলোয় যে, তখন সেই 'স্বচ্ছন্দ উৎসবে'র দিকে চেয়ে যেন বলা যায়, 'This gives people the joy of deeper insight into the secrets of nature and human relations, the pleasure of enjoying art which Lenin described as a miracle' —অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিকের অপূর্ব মিলনলীলা, সেই 'পার্বতী-পরমেশ্বরৌ', তবে নতুন দেশকালপাত্রের উপযুক্ত নতুন মুখপাত্রত্বে, নতুন অভিজ্ঞতায়, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পরূপে। যেন একইসঙ্গে : 'দরজা খুলে দাও,/লোকে ভিতরে আসুক।' এবং 'এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে,/দেখ,/আমি জটায় বাঁধছি বেদনার আকাশগঙ্গা।'

ভরক্ষেত্রে আদ্যন্ত মাটির পৃথিবীটাই চিরবর্তমান, যতই আকাশচুম্বন তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত হোক—'তাঁর' মানে শিল্পীসমাজের, কবিও অন্যতম। লেনিনের ইচ্ছনীয় ও ঈপ্সিত কবির দায়িত্ব বিশ্রুত কবি নাজিম হিকমত সঠিক বুঝেছিলেন মনে হয়, তাঁর কাব্যদর্শন এসব টুকরোয় যেন বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ : 'কবি যখন লেখেন, কথা বলেন, অস্ত্র ধরেন—তিনি একই ব্যক্তি। কবিরা তো আকাশ থেকে পড়েননি যে, তাঁরা মেঘের রাজ্যে পাখা মেলবার স্বপ্ন দেখবেন ; কবিরা হলেন সমাজের একজন—জীবনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা জীবনেরই সংগঠক।' জীবন মানে আকাশ-পৃথিবী-ব্যাপ্ত, মৌল-'মর্ত্যধূলি'তে মথিত-মণ্ডিত বৃহত্তর মানবজীবন—এই সূত্রে নাজিম হিকমত আবার : 'সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা-কিছু সংঘাত, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়, পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সবক'টি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না।' 'মিথ্যা' অর্থাৎ খণ্ডিত, ভগ্নাংশিক, ভীত-ত্রস্ত ভাবগ্রস্ত, অনিশ্চিত, ইতস্ততে ভ্রষ্ট ও নষ্ট।—'it is the awareness that literary work cannot be an autonomous undertaking, isolated from other links in the cau·e of the proletariat, even though it has its own particular laws' ; 'If the aesthetic ideal of the artist is socialism, then his understanding of life coincides with the real historical process' ; 'Creating his work of art he heeds only the voice of history and his voice of the artist.' রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মীসুলভ উক্তিতেও এই 'ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র' ক'রে যুগ-

যুগান্ত দিয়ে যুগান্তরে পৌঁছনোর 'সামাজিক' ইচ্ছা ও আদর্শ বহুলাংশে প্রতিফলিত। এবং লেনিনের পূর্বে, লেনিন-সমালোচিত টলস্টয়েও। তবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও স্বভাব-অনুসারী ভাবে, তদনুযায়ী ফলাফলে—সুতরাং 'টলস্টয়ের বিষয়ে প্রবন্ধনিচয়ে' স্বতই ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতি লেনিনের শ্রদ্ধা, যেখানে তিনি সার্থক, এবং আপত্তি, যেখানে তিনি ব্যর্থ। 'In his concrete analysis of writers and of particular works Lenin invariably examined both the reality these works reflected and the artist portraying it.' কারণ তাঁর 'theory of reflection combines both cognition and men's striving and wishes.' 'Thus, describing Tolstoy as the mirror of the Russian revolution, Lenin connected two factors : the peculiarities and uniqueness of the Russian revolution as a peasant revolution (the objective factor), and its illumination by the genius of Tolstoy (the subjective factor), as a result of the interplay of these two factors Tolstoy's work emerged as a step forward in the aesthetic development of all mankind. Creative art was for Lenin an organic fusion of objective and subjective elements.' (Alexander Myasnikov)

এই 'objective elements'-'subjective elements' তথা অনাত্ম ও মমত্ববিষয়গুলির নির্নিমেষ নিরীক্ষায়, 'irradiation' বা পরস্পর-বিকিরণে লেনিন প্রথমেই টলস্টয় প্রসঙ্গে একবাক্যে ব'লে নিয়েছেন : 'Tolstoy is absurd as a prophet.' রবীন্দ্রনাটকের ত্রিবেদী জাতীয় চরিত্ররা যেমন অম্লানবদনে বলে, আমি বেদ পড়ি না, বেদ পুজো করি—সিন্দুরে-চন্দনে পুঁথিগুলির এক-অক্ষরও আর পড়া যায় না, তেমন-মনোভাবাপন্ন সেকালের টলস্টয়বাদীদের তাঁকে নিয়ে বিকল ভাববিলাস, ছদ্মবেশী স্বার্থসিদ্ধির অসৎ-উদ্দেশ্য আদর্শপূজা, পৌত্তলিকতাকে লেনিন এভাবেই প্রাপ্যতম আঘাত হেনেছিলেন। আরো বলেছিলেন, দিনে দিনে কৃষক-সমাজের মধ্যে বিনিময়-ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধিতে, বাজারের নিয়মে এবং টাকার ক্ষমতায় পুরনো ধাঁচের পিতৃতান্ত্রিকতা ও পিতৃতন্ত্রী টলস্টয়ের আদর্শবাদ রসাতলে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে 'Lenin showed what a complex and dialectically contradictory phenomenon art is.' ; লিখেছেন—"টলস্টয়ে তাই প্রত্যক্ষ করি প্রচণ্ড ঘৃণা, উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য পরিণত মনের ব্যগ্রতা, অতীত থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনা ; আবার অপরিণত 'অবৈজ্ঞানিক' মনের স্বপ্নবিলাস, রাজনৈতিক

অজ্ঞান ও বৈপ্লবিক শৈথিল্য। একদিকে আমরা পাই মহান শিল্পীকে, মনীষীকে— যিনি কেবল রুশ জীবন সম্পর্কেই অনবদ্য আলেখ্য অঙ্কন করেননি, সেইসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করেছেন প্রথম শ্রেণীর দানপ্রাচুর্যে। অন্যদিকে দেখি খৃষ্টের আবেশগ্রস্ত এক উদ্‌ভ্রান্ত জমিদারকে। একদিকে শুনি মিথ্যাচার ও কাপট্যের বিরুদ্ধে তাঁর ঋজু, বলিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রতিবাদ ; আরেক দিকে রুশ বুদ্ধিজীবী ব'লে অভিহিত পরিশ্রান্ত মৃগীরোগগ্রস্তকে, সর্বসমক্ষে যে খুব বুক চাপড়িয়ে হাহাকার করে : 'আমি এক ভয়ঙ্কর দুরাচারী পাপী, এখন নৈতিক আত্মশুদ্ধিতে ব্রতী হয়েছি।' একদিকে শুনি পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা, সরকারী হিংস্রতা, বিচারপ্রহসন ও দুঃশাসনব্যবস্থায় ধিক্কার, দেখি ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতি অথচ শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অধোগতির অন্তঃস্থ পরস্পর-বিরোধ—অন্যদিকে কানে আসে হিংসার সাহায্যে "অশুভ প্রতিরোধ !—না'-এর উন্মত্ত চিৎকার। একদিকে বাস্তবতার প্রতি গভীর অনুভূতি, সব-রকমের মুখোস ছিঁড়বার তৎপরতা, অন্যদিকে ঘৃণ্যতম-ধর্ম-নামধেয় বস্তুটির প্রচারকার্য, সরকার-নিযুক্ত যাজকদের পরিবর্তে নীতিবোধ-চালিত যাজক-প্রবর্তনের সবচেয়ে সুসংস্কৃত ও সে-হেতু সবচেয়ে বিপজ্জনক যাজকতন্ত্রের প্রবর্তন-চেষ্টা।" এজন্য লেনিন লিখেছেন : "বৈপ্লবিক সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুত্থান ও সংগ্রামের জন্য জনগণের অপ্রস্তুতি, অশুভের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ না-করার টলস্টয়ী সামাজিক মনোভাব প্রথম রুশ বৈপ্লবিক অভিযানের পরাজয়ে অতি গুরুতরভাবে দায়ী।" তবু তিনি এ-বিষয়ে যথার্থ মাত্রারক্ষা ক'রে লেখেন—'কথায় বলে, বিপর্যস্ত সৈন্য-বাহিনীর অভিজ্ঞতা মূল্যবান।' অপিচ 'The standpoint of the patriarchal peasantry led Tolstoy to erroneous conclusions…but his basic thesis was democratic : he called for portraying above all the life of the people from the standpoint of the people themselves.' এখানে মার্ক্‌সের মন্তব্য খুব কাজে লাগে : 'স্বপ্নচারী সমাজতন্ত্রের সমালোচনামূলক উপাদানের সঙ্গে ঐতিহাসিক অগ্রগতির সম্পর্ক বিপরীতমুখী।' এবং লেনিন তাঁর প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করেছেন এই পথনির্দেশে, ব্যাপকাকার বিশালায়তন টলস্টয়-সমীক্ষায় তিনি তাই লিখেছিলেন : 'নতুন রাশিয়াকে "আকার দিচ্ছে" এবং বর্তমান সামাজিক অভিশাপগুলি থেকে মুক্তি দিচ্ছে যেসব সামাজিক শক্তি (অ্যানা কারেনিনায় লেভিন যা নিরিখ করেছিল), তাদের কর্মতৎপরতা যতই বৃদ্ধি পাবে, যতই একটি নির্দিষ্ট চরিত্র ধারণ করবে, ততই সমালোচনামূলক স্বপ্নচারী সমাজতন্ত্র দ্রুতবেগে তার কার্যগত মূল্য ও তত্ত্বগত তাৎপর্য হারাবে।' তথাপি

লেনিন মহত্ত্বের শিল্পিত বরাসন যে টলস্টয়ের অচল-অটল থাকবে তা সর্বান্তঃকরণে চেয়েছেন, বলেছেন : '...his great works are really to be made the possession of *all*', আর সেজন্যই 'a struggle must be waged against the system of society which condemns millions to ignorance, benightedness, drudgery and poverty—a socialist revolution must be accomplished.' তবেই 'uniqueness of Tolstoy's criticism and its historical significance' এখনকার ও অতঃপর নতুন পরিস্থিতিগত অভিজ্ঞতার বিচারেও যথোপযুক্ত মূল্যবান মনে হবে, মনে হতে থাকবে। কেবল স্বদেশী শিল্পীদের নয়, বিদেশী সব সদর্থক শিল্পী ও মনস্বীদের, এমন কি মার্কিন সমাজতন্ত্রী আপটন সিনক্লেয়ারকেও, মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে জ্যাক লণ্ডনের গল্প 'জীবন প্রেম' ('খুবই বলিষ্ঠ লেখা'—'এ-গল্পটা ইলিচের অসাধারণ ভালো লেগেছিল।'—'এখনো সেটা ওর ঘরের টেবিলের উপর প'ড়ে আছে'—ক্রুপস্কায়া) আন্তরিক প্রশ্বাসে তিনি টেনে নিতেন, নিয়েছিলেন। অবশ্যই ব্যক্তিগত, জাতীয় ও মানবস্বার্থে তাঁর সক্ষম, সমর্থস্বাপ্নিক ও প্রাজ্ঞতর সত্যকল্পনা-নির্ণয়ী সমালোচনায় যাচাই ক'রে। 'জ্যাক লণ্ডন'-প্রাসঙ্গিক বিষয়টিকে একটু বিশদ করে দেখা যাক : একজন ক্ষুধার্ত মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে অতিকষ্টে তার লক্ষ্য নদীতীরে যাচ্ছে বরফঢাকা বিস্তীর্ণ মরু পেরিয়ে, সঙ্গে আরেক ক্ষুধার্ত প্রাণী, একটা নেকড়ে। শেষ অব্দি শীর্ণ নেকড়ে ক্ষুধায় জ্ব'লে মরল, মানুষটি সংগ্রামী প্রাণশক্তির জোরে পৌঁছল, অর্ধমৃত অবস্থায় যদিও। লেনিন এই গল্প শুনে যেমন উল্লসিত হন, পরের দিন ঐ লেখকেরই আরেকটি গল্পে হাত নেড়ে উপেক্ষা দেখান। সে-গল্পটির চুম্বক : একজন ক্যাপ্টেন জাহাজের মালিককে তার শস্যভর্তি জাহাজটি বিক্রির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ; মালিকের বেশি মুনাফার আশাপূরণে সে জীবন দিয়ে সে-প্রতিজ্ঞা রেখেছিল। প্রথম গল্পে যেখানে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে মোকাবিলার যোদ্ধ-মনোভাব, প্রাণপণ বাঁচার তীব্রতা তথা সৃষ্টিশীল কল্পনার সম্পদ, পক্ষান্তরে দ্বিতীয়ে স্থিতাবস্থার পক্ষে ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতার পঙ্গুত্ব, মুমূর্ষু মনোভাবের ধ্বংসধর্মী বিপদ। প্রথম দৃষ্টান্তে মার্কস্‌বাদী সচেষ্ট স্বপ্নকল্পনা উজ্জ্বল ; আর দ্বিতীয়ে গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় আস্থানৈতিক আদর্শের অপপ্রচারে দেউলে বুর্জোয়া অবক্ষয় প্রতিফলিত। সুতরাং লেনিনের পৃথক প্রতিক্রিয়া যথাযথ : প্রথমটির সমাদর, দ্বিতীয়টিকে তাচ্ছিল্য। সঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৮৯৭ সাইবেরিয়া-নির্বাসনকালে এক 'অবিশ্বাসী' যুবক ঠাট্টা ক'রে লেনিনের সামনে আবৃত্তি করেছিল—'হে স্বপ্ন ! ব্যর্থ স্বপ্ন ! কোথায় তোমার মাধুর্য !'—

এতে লেনিন উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বপ্ন ! যার দেখার মতো কোনো স্বপ্ন নেই, সে পশু। স্বপ্নই প্রগতির শক্তি এবং সমাজতন্ত্রই সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন।" গল্পের স্বপ্নহীন 'পশু' নেকড়ে তাই ব্যর্থতায় মরে, আর স্বপ্নপ্রয়াসী সক্রিয় মানুষ বেঁচে যায়, সার্থক হতে থাকে। তাকেই লেনিন মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত স্বাগত জানিয়ে যান। পাশাপাশি প্রাচীন মানবতন্ত্রে প্রবলবিশ্বাসী পুশকিনের মহিমাকে যে কেন তিনি নবীন মায়াকভস্কি মোহগ্রস্তদের সামনে আরেক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দিগন্তরূপে তুলে ধরেছিলেন, পূর্বেই আলোচিত, তা গভীর স্তরে পুনঃস্মরণীয়। এখানেই লেনিনের রচনা পাঠ অত্যাবশ্যক, তিনি কীভাবে সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণ চেয়েছিলেন, প্রকৃত 'বিজ্ঞানসম্মত বিকাশ' যাকে বলে, তার পারম্পর্যপূর্ণ চিত্রচরিত্র কী, সেই ব্যাখ্যায় :

"যদি না আমরা গোটা মানবজাতির বিকাশধারায় গ'ড়ে-ওঠা সংস্কৃতির সঠিক চরিত্র বুঝতে পারি ও সেই সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে শিখি, তাহলে কোনদিনই প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠতে পারবে না। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি পাতলা বাতাস থেকে মুঠো করে ধরা যায় না, বা তা কোনো বিশেষজ্ঞের উবর মাথা থেকেও জন্মায় না। পুঁজিপতি জমির মালিক ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের জোয়ালের নীচে থেকে মানবজাতি যে-জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে তারই বিজ্ঞানসম্মত বিকাশ হতে হবে।" (দ্র° লেনিনের সঙ্কলিত রচনাবলী ৩১ এবং মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সাহিত্য শিল্প ভাবনা, পৃঃ ৯১, ৯৯)

প্রকৃত প্রস্তাবে লেনিন, কেবল তাঁর পূর্বপ্রস্তুতির দিনে নয়, কঠিন ক্রান্তিকালে, ক্রান্তি-উত্তরণেও পূর্বপর-চিন্তাচেতনাহীন যে-কোনো সৃষ্টি-শিল্পসামগ্রীর নিরঙ্কুশ নাকচের তীব্র বিরুদ্ধপন্থী ছিলেন। সর্বাত্মক প্রত্যাখ্যানের সেই সর্বাত্মক বিরোধিতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, নির্ভরযোগ্য নিদর্শন পেশ করেছেন লুনাচারস্কি :

'ঠিক কোন্ তারিখ মনে নেই, তবে ১৯১৮-১৯ সালের মরশুমে একদিন··· ইলিচের আপিসে এসে বললাম যে, দেশের সেরা থিয়েটারগুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবশক্তি নিয়োগ করতে চাই। সঙ্গে যোগ করলাম, 'আপাতত ওদের প্রদর্শনীগুলো সবই পুরোনো তা ঠিক, তবে তার সবরকম মালিন্যই দূর করব। জনসাধারণ, প্রলেতারীয় সাধারণই সেখানে আগ্রহভরে দেখতে যায়। এই দর্শকমণ্ডলীর চাপে ও কালের গতিতে সবচেয়ে রক্ষণশীল থিয়েটারও ক্রমশ বদলাতে বাধ্য হবে। ··আমূল একটা ভাঙচুর ঘটানো এক্ষেত্রে আমি বিপজ্জনক মনে করি। এখানে পাল্টা দেবার মতো আমাদের এখনো কিছু নেই। আর ভবিষ্যতে যে-নতুন বাড়বে তার সাংস্কৃতিক সূত্র ছিন্ন হতে পারে। বিপ্লবের বিজয়ের পর আশু

ভবিষ্যতের সঙ্গীত যে প্রলেতারীয় বা সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠবে, সেকথা ধরে নিলেও সঙ্গীতভবন ও বিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ ক'রে পুরোনো সামন্ত-বুর্জোয়া বাদ্যযন্ত্র ও স্বরলিপি কি পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব ?'

'…ইলিচ মন দিয়ে আমার কথা শুনে বললেন, যেন আমি ঠিক ঐ নীতিটিই অনুসরণ করি, তবে বিপ্লবের প্রভাবে যে-নতুনের জন্ম হচ্ছে তাকে সমর্থনের কথা যেন না ভুলি। গোড়ায় সে-নতুন না হয় ক্ষীণই হলো : মাত্র রসের বিচারই এক্ষেত্রে একমাত্র ধর্তব্য নয়, সাবেকী সমধিক পরিণত শিল্পের দ্বারা নতুনের বিকাশ তাহলে ব্যাহত হবে এবং সে-সাবেকী শিল্প নিজে বদলাতে থাকলেও নবীন অভ্যুদয়ের প্রতিযোগিতা তাকে যত কম ঠেলা দেবে তার পরিবর্তনও হবে ততই মৃদু মৃদু, ধীরে।'

—লেনিনের সতর্কতা স্বাভাবিক—দুঃসহতম কষ্ট ও আত্মত্যাগের ফলে যে-বিপ্লবী বিজয় সাধিত হয়েছে, তার চারধারে তখন লুব্ধ গৃধিনী-শকুনির মেলা ; প্রতিবিপ্লব, প্রতিক্রিয়া, বিদেশীদের হানা, গুপ্তচরবৃত্তি, গৃহযুদ্ধ সমস্তই সমান-তৎপর, আগ্রাসী ; সুতরাং অতন্দ্র পাহারায় সব দেখে তীক্ষ্ণতর বিচার-বিবেচনাক্রমে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন-পুরোনোর দ্বন্দ্বনিরসন ঘটাতে হবে, 'মাত্র রসের বিচারই এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়', যেহেতু বৃহত্তর দায়িত্ব মহত্তর কর্তব্য অন্যত্র রয়েছে, যেমন গোর্কি বলেছেন : "কম্পাসের কাঁটার মতো তাঁর চিন্তা সবসময়েই ঘুরে দাঁড়াত মেহনতী মানুষের শ্রেণীস্বার্থের দিকে।"

অতঃপর লুনাচারস্কি তাড়াতাড়ি ক'রে ইলিচকে আশ্বাস দিলেন যে, তেমন ভুল যথাসাধ্য তিনি পরিহার ক'রে চলবেন।—'শুধু দেখতে হবে যাতে যারা এখন প্রচুর সংখ্যায় আমাদের জাহাজে উঠে পড়ার চেষ্টা করছে সেই ছিটগ্রস্ত ও হাতুড়েরা আমাদেরই শক্তি নিয়ে তাদের সাধ্যাতীত ও আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর একটা ভূমিকা নিয়ে না বসে।'

এর জবাবে ইলিচ হুবহু এই কথা বলেন : 'ছিটগ্রস্ত ও হাতুড়েদের ব্যাপারে আপনি যথার্থ বলেছেন। বিজয়ীশ্রেণী, যার আবার নিজস্ব বুদ্ধিজীবী শক্তি এখনো পরিমাণে কম, তারা এসব লোকেদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা না করলে অনিবার্যত তাদের শিকার হয়ে পড়বে। কিছুটা পরিমাণে', সহাস্যে যোগ করলেন লেনিন, 'এ-জিনিস বিজয়ের অনিবার্য পরিণাম, লক্ষণও বটে।' কী আশ্চর্য ধ্রুবদৃষ্টি ! তাই 'সবাগ্রে লেনিনের আগ্রহ ছিল সেই সংস্কৃতিতে, যা সুসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সফল নির্মাণে অপরিহার্য পূর্বশর্ত'।

'সমস্ত জোর দিয়ে লেনিন একথাই বলতেন যে, রাজতন্ত্র ও শাসকশ্রেণীগুলির

উচ্ছেদের পর যদি আমরা আরো বিকশিত বুর্জোয়া সংস্কৃতির উত্তরাধিকার পেতাম, তাহলে সংগ্রাম ও নির্মাণ আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হতো।'

'বহুবার উনি এর পুনরুক্তি করেছেন যে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির ফলে পশ্চিমী দেশগুলির প্রলেতারিয়েতের পক্ষে বিজয়ের পর সমাজতন্ত্রের বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ দ্রুততর করার সুযোগ হবে।'

তাই সর্বাত্মকৃত্য সোভিয়েতরাজ-সাধনের পরই তিনি সাক্ষরতা ও বিদ্যুতীকরণের অভিযানে নেমেছিলেন—সঙ্গে সাংস্কৃতিক চৈতন্য বিস্তারে, সবটাই নবতম অভিনবতর রাষ্ট্র, তার স্বাস্থ্য ও স্বস্থতা-সংরক্ষণী স্বার্থে। 'ইলিচ জানতেন যে, আমাদের গুরুত্বসহকারী উদ্যম নিয়ে বিদ্যাভ্যাসে লাগতে হবে এবং বুর্জোয়া জ্ঞানভাণ্ডার, তার টেকনিক থেকে সবকিছুই নিষ্কাশন করে নিতে হবে যা বুর্জোয়া-উচ্ছেদ ও আমাদের জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে কাজ দেবে।' অবশ্য 'তিনি খুব ভালোই জানতেন যে, আমাদের যা দরকার তার সবটাই বুর্জোয়াদের কাছ থেকে শিক্ষণীয় নয়।' কীভাবেই বা তা সম্ভব? বিপ্লবের অন্যতম প্রয়োজন তো এই অন্তর্নিহিত অনটনের প্রশ্নেই জড়িত। 'তিনি জানতেন, আমাদের নিজস্ব যা আছে, তা একেবারেই আমাদের, বুর্জোয়াদের কাছে যা বর্জিত, নিন্দিত, অভিশপ্ত। আমাদের কাছে এই নিজস্ব শ্রেণীসত্য—বিশ্বপ্রসঙ্গ, জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস, অতীত-ভবিষ্যৎ সর্বপ্রসঙ্গেই—এই সত্য হলো আমাদের নতুন বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি।'

এবং সৃষ্টিক্ষমতা।—'লেনিন আমাদের এই শিক্ষা দেন যে, আমাদের শিক্ষাদান ও আত্মশিক্ষার পদ্ধতিকেও (অনুরূপ) অনুরূপ হতে হবে। সমস্ত মিথ্যা ও প্রতারণা, বুর্জোয়াদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সব কুসংস্কার, বিদ্‌ঘুটেমি তাড়াতে হবে, বিষয়গুলিকেও আয়ত্ত করতে হবে পুঁথিবাগিশ বুর্জোয়ার "তোতাকাহিনী"-ঢঙে নয়, আমাদের দৈনন্দিন সমাজতান্ত্রিক কর্মধারায় জড়িয়ে তার সাথে নিজেদের গভীর—গভীরতম যোগাযোগে।'

বহুরূপে, বিবিধ বিশ্লেষণে লুনাচারস্কি উক্ত দৃষ্টি-সৃষ্টির সীমা ও অসীমকে দৃষ্টান্তসহ ভেঙে ভেঙে খুঁটিয়ে দেখেছেন, পরে মন্তব্য করেছেন সর্বার্থসার সাক্ষরতার গুরুত্বে, বিদ্যুতীকরণের বিপুলায়তন সাধ্যসম্ভাবনায়: 'মুহূর্তের জন্যও এই সাক্ষরতা, এই বিদ্যাভ্যাসকে আমাদের রাজনৈতিক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংগ্রাম, শিল্পায়ন, কৃষিজোতের যৌথায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।' লেনিনের কাছে তখন শিক্ষাই বিদ্যুৎতরঙ্গ, বিদ্যুৎতরঙ্গই শিক্ষা। বস্তুত তিনি শিক্ষাকে বৈদ্যুতিক ও বিদ্যুৎকে শিক্ষাসার ক'রে তুলছিলেন—এইচ. জি. ওয়েলসও তাই প্রথম সাক্ষাতে তাকে 'ইলেকট্রিসিটি'র 'ইউটোপিয়ান' ব'লে ধার্য করেছিলেন, পরে তিনি সার্থক

সোভিয়েতে পৌঁছে লেনিনের দূরদৃষ্টিকে দ্বিতীয় বারের জন্য জয়ধ্বনিত করেছেন। ১৯৩৪ সনে, রবীন্দ্রনাথের ২। ৩ বছর পর তিনি দেখেছেন, মার্ক্‌স্‌-লেনিনের মতে ও পথে 'বিপ্লবী-সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় চারপাশের জিনিসগুলোকে বদলাতে বদলাতে প্রলেতারীয়রা নিজেদেরও বদলে' নিয়েছে। লুনাচারস্কির প্রাসঙ্গিক শেষ কথা তাই নিম্নরূপ : 'ব্যক্তির কথা যদি তুলি, তাহলে প্রতিটি নতুন সমাজতান্ত্রিক নগর ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির এই উচ্চস্তরের দানা-বাঁধা স্ফটিকের প্রধান নির্মাতা তো তিনিই—ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।' এবং সে-সম্বন্ধে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত যুক্তিযুক্ত বিয়োগ-বেদনাবোধ : 'আমাদের নির্মাণকাজের অভিযানী গতিপথে আমরা এমন এক সমারোহ-মুহূর্তের কাছে এসে পৌঁছেছি যা শুধু প্রতিভাত হয়েছিল ইলিচের আবেগান্বিত, একান্ত পার্থিব ও ব্যবহারিক 'স্বপ্নে', প্রতিভাত হয়েছিল রীতিমতো নিকট ভবিষ্যৎ হিসেবে, যদিও মহত্তম বিপ্লবী তা নিজে দেখে যেতে পারেননি।' লুনাচারস্কি পুনরায় : অথচ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' আদৌ বর্জন করেননি লেনিন ; অবশ্য অতিদূর ভবিষ্যতে ভেসে যেতেও তিনি ভালবাসতেন না। সুদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করলে তিনি মাঝে মাঝে হেসে বলতেন, 'কী জানেন, সে-সময়কার লোকেরা হবে খুবই বুদ্ধিমান, এসব সমস্যার চমৎকার সমাধান তারা ক'রে নেবে, তাই আমরা বরং সেইসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই যার সমাধান করার জন্যে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।' আর পাশাপাশি এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে : 'সংস্কৃতি সম্পর্কে লেনিনের যে আগ্রহ ছিল সেটা সর্বাগ্রে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিজয়ের বরমাল্য হিসেবে নয়', মার্ক্‌স্‌ যাকে বলেছিলেন, "মানবোচিত জীবনযাত্রা" এবং যার তুলনায় সমগ্র মানব-ইতিহাসকে তিনি গণ্য করেছিলেন কেবল প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে, সেই নতুন জীবনযাত্রা যখন তাঁর পূর্ণ মহিমায় অবারিত হবে, সেই যুগে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির রূপ কীরকম হবে কেবল তাতেই লেনিনের আগ্রহ ছিল না', 'যদিও তিনি চমৎকার জানতেন যে, দুনিয়ার শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রতিটি যোদ্ধা ও নির্মাতার কাছ থেকে যে-আত্মত্যাগ ও কর্মযোগ দাবি করে তা কত বেশি, অথচ তা একটা নৈতিক সার্থকতা লাভ করে ঠিক তখনই, যখন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি উক্ত "মানবোচিত জীবনযাত্রা"য় এসে একটা সঙ্গত সঙ্গম লাভ করে।'

সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়মূলে পূর্বোক্ত শিল্প-নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে লুনাচারস্কির সাক্ষ্যে আবার ফিরতে হয় : "Well then, to sum up," I said, "everything that is more or less sound in old art is to be safeguarded. Art—I do not mean museum pieces, but effective

art such as the theatre, literature and music—is to be influenced, but not crudely, to complete its evolution as quickly as possible to meet the new requirements. New trends are to be treated with discrimination. They must not be allowed to seize the field by mere aggression, but are to be given opportunity to win prominence by real artistic merits. In this respect they are to be given every possible assistance."

To this Lenin said : "This puts it rather precisely, I think. Now try to bring it home to our audiences, and to people in general for that matter, in your public speeches and articles."

"Can I quote you ?" I asked.

"No, why ? I don't claim to be an expert in the arts. Since you're a People's commissar you ought to be enough of an authority yourself."

এভাবেই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নয়, কর্মের ইচ্ছায় কর্তৃত্বের সুফল সেদিন স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠেছিল। সিদ্ধান্তগুলিও তাই তদনুকূল, অনুরূপ-সত্য-মহত্ত্বমণ্ডিত : 'সাবেকী শিল্পের ন্যূনাধিক ভালো জিনিসগুলি সবই রক্ষা করতে হবে।' 'নতুন অভ্যুদয়গুলি দেখতে হবে বিচার ক'রে। তাদের দখলদারি ফলাতে দেওয়া চলবে না। বাস্তব শিল্পকৃতিত্বের শক্তিতেই বিশিষ্টতর স্থান অধিকারের সুযোগ তাদের দিতে হবে।'

আলেক্সান্ডার সেবাফিমোভিচ-এর সঙ্গে কথাবার্তায়ও লেনিনের অনুরূপ আরেক দিক, একই-'বিষয়ী' পাতার অন্য পৃষ্ঠাটি ফুটে উঠেছে, সমুজ্জ্বলতায় :

"Are you writing anything just now ?" he asked me.

"It's difficult to write just now : there's so much organisation work to do."

He frowned.

"Yes, there's plenty of organisation work in our country just now. But you, writers, must draw the workers into literature. You've got to direct all your efforts towards this.

Every short story written by a worker must be heartily welcomed. Do workers publish their stories in your magazine ?"

"It could be more, Vladimir Ilyich. They lack knowledge, or culture, I suppose." He glanced at me with his narrowed eyes, and sald :

'Oh well, never mind, they'll learn to write and we'll have an excellent proletarian literature, the first in the world···"

These words rang with a fervent faith in man, in Russian art ; there was in them an affection for the working people and an unquenchable, active faith in them.

কেবল মানুষ এবং শিল্পে তথা মনুষ্যত্বে আস্থাস্থাপনেই তিনি যথেষ্ট ছিলেন না, শিল্প ও মনুষ্যত্ব-বিকাশের এতাবৎরুদ্ধ দ্বারপথগুলি খুলে দিতেও যথেচ্ছ বদ্ধপরিকর ছিলেন, লেনিন তাই ক্লারা সেৎকিনকে সুগভীর সংবেদনশীলতায় বলেছিলেন : 'Creative life evidently requires extravagance in society as in nature.' আমাদের দেশে হলে একথাটাকে স্বচ্ছন্দে Personality বা Religion of Man-এর লেখক রবীন্দ্রনাথের উক্তি বলে গণ্য করা যেত—নান্দনিক প্রকর্ষে, মানবিক সচ্চিন্তায়, সম্পূর্ণতায় এতই ঘনস্পর্শ এর আবেদন। কিন্তু লেনিন যেহেতু মুখ্যত কর্মযোগী, মূলত কবি নন, তাই তিনি এখানে না থেমে, ইত্যবসরে তাঁর যুগপৎ সাক্ষরতা ও দ্রুত-বিদ্যুতায়ন অভিযানের জয়ফল দেখে দেখে তৎপর পরমোল্লাসে বলেছেন : 'We already have the most important requisite for the cultural revolution since the conquest of power by the proletariat, namely : the awakening of the masses, their aspiration to culture.' তারা চাইতে শিখছে, এখন দেওয়া চাই। সকালের সলতে-পাকানো হয়েছে, এবার সন্ধ্যার শিখাস্পর্শ।

এজন্য প্রাচীন ও প্রবীণ ঐতিহ্যের পুনরধিকার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কীভাবে? নিশ্চয়ই সমালোচনামূলকভাবে, সদর্থক বিচারে এবং বিচক্ষণ বিবেচনায়। মাত্র সঞ্চয়ী শখে ও যথগ্রন্থের চর্বিতচর্বণে নয়, বিতর্কিত গ্রহণে-বর্জনে, স্বীকরণে, অর্জনে। তলস্তয়েব বিষয়ে তাঁর বিশ্রুত লেখাগুলি সেদিক থেকেই পাঠ্য,

এ বিষয়ে ভার্গাকভ্স্কি ঠিকই মূল্যায়ন করেছেন: 'Lenin's ability to perceive a work of art in a dialectical way, as a reflection of social reality in a unique artistic form, enabled him to write such masterpieces of literary criticism as his well-known articles on Leo Tolstoy.' যার উপজীব্য ও মূল অভিপ্রেত হল তাঁর 'তৃতীয় যুবকম্যুনিস্ট লীগে' দেওয়া ভাষণের বক্তব্য, যথা তার ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ: 'The old schools provided purely book-knowledge··· a mass of useless, superfluous and barren knowledge··· and turned the younger generation into bureaucrats regimented according to a single pattern. But it would mean falling into a grave error for you to draw the conclusion that one can become a communist without assimilating the wealth of knowledge amassed by mankind. It would be mistaken to think it sufficient to learn communist slogans and the conclusions of communist science, without acquiring that sum of knowledge of which communism itself is a result.' ফুল-ফল-বীজ-নির্বিবেক, কার্য-কারণ-পারম্পর্যহারা 'মদে মাতাল ভোরে'র প্রজন্মে তাঁর প্রত্যয় ছিল না, নতুন করে বাঁচার নামে তিনি কবর খুঁড়তে চাননি, তাই এই সতর্ক-বিচক্ষণ পথবিচার, নির্দেশ, সোৎসুক অথচ সাবধানী পদক্ষেপ. 'মানবোচিত জীবনযাত্রা'র। অর্থাৎ 'এই রাস্তার ধুলির গান।—/তার কাঁকর, তার খোয়া, তার পাথরের— / আজ কিছু তুচ্ছ নয়। / ভাঙা পেরেক, ঘোড়ার খুরের নাল; / ছেঁড়া কাগজ, কাঠি, পাতা, কিছু নয়। / তার সঙ্গে গান গাইব মানুষের / যে-মানুষ পথ সৃষ্টি করেছে / মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার পথ! / সে-পথ আরো বিস্তৃত হোক, / যে-পথ মানুষকে বৃহৎ করেছে।' (প্রেমেন্দ্র মিত্র) বিশেষত 'এখন সেই বয়েস, যখন / দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট— / শুধু কাছেরটাই ঝাপসা দেখায়। / এখন সেই বয়েস, যখন / আচমকা মাটিতে / প'ড়ে যেতে যেতে মনে হয় / হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকলে ভাল হতো।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) বস্তুতপক্ষে মাত্র বয়স-বিচারে নয়, দেশকালপাত্র-বিচারে আমরা যারা এখন একটা অনিশ্চিত ও নিরবলম্বভাবের হয়ে আছি, থাকছি, তাদের জন্য 'বিরূপ বিশ্বে'র 'নিয়ত-একাকা'ত্বে 'মানবোচিত জীবনযাত্রা'য় পৌছতে লেলিন 'একটা শক্ত লাঠি'। অন্ধ বা একচক্ষু হয়ে তো লাভ নেই, কেননা 'অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে'?

এবং অন্ধতা যেখানে নৈসর্গিক বা অলৌকিক নয়, মানুষের সমাজগত ও মানসিক, মুক্ত মননের দরোজা-জানালাগুলি সেখানে তাই অবিরাম খুলতেই হবে— 'অনন্ত সূর্যোদয়ে'। যাবতীয় তদ্গত কর্ম, শিল্পকর্মও সেই 'অগ্রসর সূর্যালোক'-আনা 'আঘাত', লেনিনের ভাষায় 'tremendous benefit'। সুকল্পিত ও পরিকল্পিত। পাবলো পিকাসোর অমূল্য বহুস্তর শিল্পিত কর্মে চেয়ে কবি পল এলুয়ার যেমন লিখেছিলেন, 'It has been said that to start with things and their relationships, for scientific study of the world, is not our right, it is our duty. It should have been added that this duty is the very duty of living, not in the manner of those that bear their death within them and are already walls or voids, but making one body with the universe, with the universe in movement, in process of becoming not merely an examining or a reflecting function, but a motor function, a pandemic function, a universal function, the relationships between things being infinite.'—যুগপৎ পরাবাস্তববাদী ও সাম্যবাদী এই আলোচক কি লেনিনের 'reflective'-'cognitive' শিল্পসত্যের সন্ধিৎসায় পৌঁছেছিলেন? হয়তো। ইচ্ছুক-সমুৎসুক আজকের আর-সবাইও নিশ্চিত পৌঁছবেন এবং সেভাবেই মার্কসীয় "মানবোচিত জীবনযাত্রা"য়।

'ঘরছাড়া' রাসেল, রবীন্দ্রনাথ : 'মনের চলার আনন্দ'

'তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের ভাবুক' রবীন্দ্রনাথ

'There have been two Bertrand Russells : one who died during the war; and another who rose out of that one's shroud, an almost mystic communist born out af the ashes of a mathematical logician !' উইল ডুরান্ট্-এর এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচর্চায়ও সমর্থিত। রাসেলের দ্বিজত্ব-ঘটনার প্রাক্কালে তাঁর সেই 'এক' ও অন্যতের একটা আংশিক আকৃতি 'পথের সঞ্চয়'-এর লিপিনৈপুণ্যে চিত্রিত আছে। ১৯১০-এর ইংলণ্ড প্রবাস। রবীন্দ্রনাথ তখন কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজে অধ্যাপক লোয়েস ডিকিন্‌সনের অতিথি। তাঁর গৃহে রাসেল-রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাক্ষাৎ প্রায়-নিঃশব্দ, কিন্তু গভীরার্থে প্রভাবসঞ্চারী। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে যা লিখেছেন তার বহুলাংশই তাই তথ্যভারহীন, প্রায় সবটা ভিতরের অনুকম্পে তাৎপর্যময়। সে-বর্ণনার পূর্বে স্বয়ং ডিকিন্‌সনের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : It is a June evening, in a Cambridge garden, Mr. Bertrand Russell and myself sit there alone with Tagore. He sings to us some of his poems, the beautiful voice and the strange mode floating away on the gathering darkness Then Russell begins to talk coruscating like lightning in the dusk. Tagore falls into silence But afterwards he said, it had been wonderful to hear Russell talk. He had passed into a 'higher state of consciousness' and heard it, as it were, from a distance. What, I wonder, had he heard ?

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথ কী শুনেছিলেন ? তাঁর গভীরগামী ধ্যানমগ্নতার পাশে রাসেলের সুদূরব্যাপী তার্কিক আলাপচারিতা যেন প্রকৃতই সন্ধ্যার শান্ত তন্ময়তার কোলে বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ। নীরন্ধ্র অন্ধকার মৌনে আশ্রিত কবির মর্মমূলে ওই তীক্ষ্ণ কূটাভাস যথার্থ নাড়া দিয়েছিল—সেবারের সঞ্চয়ে একটি প্রেরণার-মতো অভিজ্ঞতা। বিচিত্র সেই বিক্ষিপ্ত রাবীন্দ্রিক বর্ণনা বাগ্‌বর্ণবাহুল্য সংক্ষিপ্ত ক'রে, সংহৃত উপাদানে এমি দাঁড়ায় : যেমন বসন্তে সবটাই ফল ও ফুল নয়, তাঁর সঙ্গে দক্ষিণের

হাওয়া আছে, তার উত্তাপ ও আন্দোলন আছে, সুতরাং ফুলের আনন্দ-বিকাশ আছে, তেমি এখানকার মনোবিকাশের চারদিকে যে একটা আলাপের বসন্ত হাওয়া বইছে, তাতে ব্যাপ্ত গন্ধ ও বিকীর্ণ বীজ আছে, যাতে প্রাণের ক্রিয়া উৎসব ক'রে দিগ্‌দিগন্ত মাতিয়ে তুলছে: 'এই সহৃদয় চিন্তাশীল অধ্যাপকের (ডিকিন্‌সন) গ্রন্থমণ্ডিত বাসাটুকুর মধ্যে আমি তাহারই একটি প্রবল স্পর্শ পাইলাম।' 'ইহার সঙ্গে একসময়ে যখন এখানকার একজন বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক রাসেল সাহেব আসিয়া মিলিত হইলেন তখন তাঁহাদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল।' 'গণিতের তেজে কাহারও মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারও মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটি আমার কাছে সবচেয়ে সরস লাগিল।' 'যেখানে চিন্তার এমন একটা বেগ আছে সেখানে চিন্তার আনন্দ যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।...আমাদের দেশে চিত্তের সেই আনন্দলীলার অভাবটাই সকল দৈন্যের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে।' 'ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে; চিন্তার ঢেউ, কথার কল্লোল কেবলই নানাদিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিত্তকে আঘাত করিতেছে। ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।' 'ইহাদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার মুখেই আছে; তাহার চাকা আপনিই সরে। মানুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাঝ-রাস্তায়। এইজন্য ইহাদের কোনো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায়, তখন একেবারেই সুচিন্তিত কথার ধারা পাওয়া যায় এবং সেই ধারা দ্রুতগতিশীল।' 'একদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত ('কলেজের বাগানে') প্রাচীন তরুসভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপকবন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। আলাপের বিষয় বহুদূরব্যাপী। তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাজ-তত্ত্ব, দর্শন সকলরকম জিনিসই ছিল।' 'আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি বড়ো রমণীয়।' 'একদিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশজোড়া নিস্তব্ধতা, আর-একদিকে তাহারই মাঝখান দিয়া মানুষের চঞ্চল মন আপনার তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্য অভিসারে চলিয়াছে। যেন পর্বতমালার... পায়ের কাছটা ঘিরিয়া ঘিরিয়া নির্ঝরিণী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কেহই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; তাহার কলোচ্ছ্বাস কেবলই প্রশ্ন করিতেছে...প্রকৃতি এবং চিত্ত এই দুইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিদ্যালয়ের পুরাতন বাগানে বসিয়া অনুভব করিতেছিলাম।...এই বাণীস্রোতেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তাহার নিরন্তর

আনন্দ, ইহাই আমি সেদিন নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিলাম। ··এই চঞ্চল আলোকমালাই অবিচলিত মহৎ অন্ধকারের বাণী। ··যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদুকণ্ঠের কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।' ···'ইহা মনের চলার আনন্দ।'

ডিকিন্‌সন সাহেব এই বাংলাভাষী বর্ণনা পড়ে বুঝলে, জানতেন, রবীন্দ্রনাথ এখানে কেবল তাঁকে নয়, শুধু রাসেলকেও নয়, সেকালীন সমগ্র ইংলণ্ডীয় ভাবুক-সমাজকেই প্রত্যক্ষবৎ চিত্রিত করেছেন, আনন্দিত-আন্দোলিত হয়েছেন তার অফুরান চলার আবেগে, তার প্রশ্ন থেকে নবপ্রশ্নে বিচরণে, একটি মহৎ উত্তর থেকে মহত্তর আরেকটি উত্তরের সমাধানে উপনীত হওয়ার নিত্যব্যগ্র সন্ধান-সাধনায়, উচ্চারণে-আচরণে-কর্মে ও কোলাহলে সর্বত্রব্যাপী অভ্যাসবন্ধনহীন এক প্রমুক্ত জীবনযাত্রায়, স্বতন্ত্র স্বাধীন খোলা মনের সকারণ অবারণ চলার আনন্দে।

তখনো রাসেল স্ফুটনোন্মুখ। গণিতের অধ্যাপক হিসেবে বিদিত, কিন্তু তাঁর বৃহত্তর পরিচয় অনাবৃত হয়নি। ডুরাণ্টের 'প্রথম জন' রাসেলকেই রবীন্দ্রনাথ তখন প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু যেন পরোক্ষ করেছেন সেই 'দ্বিতীয়জন'কেও, যিনি অচিরকালে আবির্ভূত হবেন; মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড প্রমত্ততা তার গণিতযুক্তিজালের নির্মোক ছিন্ন করবে, তিনি বেরিয়ে আসবেন জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গলি থেকে বিশ্বনাগরিকতায় মথিত সর্বজাতীয় লোকের প্রশস্ত রাজপথে। সেদিকে চেয়ে, তাঁর কথা মনে ক'রে দু'বছর পরের রবীন্দ্রনাথ, বন্ধনমোচনের কালান্তরা কবিতাগুচ্ছ 'বলাকা'র বাণীভাষ্যকার ব'লে উঠবেন : 'যে-যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌছবার সিংহদ্বারস্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সর্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে (স্মরণীয় তার 'শঙ্খ', 'ঝড়ের খেয়া' ইত্যাদি কবিতা)। ·· আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সবজাতির সবলোকের। ···শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁছেছে। রোমাঁ রোলাঁ, বারট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সর্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। ···পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে। ···আমি কিছুদিন থেকে

('ডাকঘর' রচনাকাল থেকে) অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম।' কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে যা 'সঙ্গোপনে অগোচরে' লাভ করবার সামগ্রী, রাসেলের মতো যুক্তিবিজ্ঞানী বুদ্ধিমার্গীদের কাছে তা প্রত্যক্ষগোচর বিষয়। কালক্রমে তার্কিক, বিতর্কিত রাসেল তারই মুহুর্মুহু প্রস্তাবনা ও সম্প্রচার চালাতে লাগলেন। কেম্ব্রিজের বাগানে সেদিন তার প্রস্তুতিপর্ব দেখে এসেছিলেন কবি, রেনেসাঁস নাটকের প্রথমাঙ্কের মতো। পঞ্চমাঙ্কে পৌঁছিয়ে, ১৯৫৭-৫৮য় স্বয়ং রাসেল সে-বিষয়ে বলেছেন, 'আমি সারাজীবন ব্রিটেনের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবনের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে এসেছি। ··তার কারণ আমি চাই কোন মুহূর্তেই আত্মতৃপ্তির জড়তা যেন আমাদের গতিহীন না করে। · এই অতৃপ্তি এবং আত্মসমালোচনাই পশ্চিমী সভ্যতার প্রাণ। · নেতিবাদ আর হতাশাবাদ এক জিনিস নয়; আর এই অসন্তোষ আমাদের সভ্যতাকে স্থবিরতার হাত থেকে রক্ষা করছে।' চিরজঙ্গম কবিপ্রাণ সেদিন তার স্থবির-স্বদেশসাপেক্ষ আপন-কক্ষমধ্যে যে-পক্ষতাড়নার ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, এই অস্থির পাশ্চাত্য-মনীষার 'বিপুল সুদূরে'-আলোড়িত বিচিত্রৌৎসুক্যে তারই প্রতিধ্বনিত সহানুভূতি ছিল—পরবর্তী কালে উভয়েরই 'নবনবীন' অভিপ্রায়, স্রোতোদ্বেল প্রগতি, দুঃসাহসিক পরিণামে দুর্বার বাঁক-নেওয়ার নদী-প্রবৃত্তি ও সক্রিয়তায় তার সত্যতা প্রমাণিত।

কেবল রাসেল সম্পর্কে এ-বিষয়ে শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সেই 'চলার আনন্দিত' মুক্তমনের যে-অভিজ্ঞতা, তার অন্তঃসার তাই ক্রমোন্মোচ্য। রবীন্দ্রোক্ত সেই 'মনের চলার আনন্দ' কেন সেই একটি মানুষী-পরিণতির ভাঙাগড়ায় অবিরাম স্ফূর্ত মূর্ত মুক্ত ভঙ্গিতে অপরূপ রূপায়িত; গণিত থেকে মানবহিত পর্যন্ত বিস্তৃত-ব্যাপ্ত একটি পরমোপলব্ধি একান্ত-দার্শনিকতাই নয়, একটি অনেকান্ত দর্শন। সে-মহাবিষয়ের উপযুক্ত পূর্বাভাষ তাই এই 'হাস্যরশ্মি'চ্ছুরিত চিন্তালোকিত মন্তব্যে, বস্তুতই তা একটি প্যারাডক্স্, কিন্তু গাণিতিক 'রাসেল্স্ প্যারাডক্স্' নয়, দর্শনোত্তীর্ণ স্পর্শযোগ্য, মানবিকতায় সুঅভ্যস্ত তার্কিক রাসেলের এই যে 'witty attack': 'organic life, we are told, has developed gradually from the protozoan to the philosopher; and this development, we are assured, is indubitably an advance. Unfortunately, it is the philosopher, not the protozoan, who gives us this assurance.' 'মুক্ত মানুষ' আর বালসুলভ আশায় ও নরদেহধারী ঈশ্বর-কল্পনায় প্রসন্ন থাকতে পারে না; সে কেবল তার সাহসকে টান টান করে জাগিয়ে রাখবে, যদিও জানবে,

মৃত্যুকে সে ঠেকাতে পারবে না, কেউ তা পারে না, পারবে না। সত্ত্বেও সে হাল ছাড়বে না, যদি জয়ী না-ও হয়, সংগ্রামকে উপভোগ ক'রে যাবে ; এবং তার নিজ পরাজয়কে আগে-থেকে-বুঝে-নেওয়ার জ্ঞানই তার প্রতি উদ্যত বিধ্বংসী অন্ধশক্তির চেয়ে তাকে উচ্চতর আসন দেবে। তার বহিঃস্থ পশুশক্তির প্রতি তার পূজা পৌঁছবে না—লক্ষ্যহীন নিয়তিতে, যা তাকে পরাভূত করছে, তার বহু-সাধের সুনির্মিত সভ্যভব্য সব গৃহ ও বাগানকেই যা ছিঁড়েখুঁড়ে ছারখার করছে ; সে তার অন্তঃস্থ সৃজনশক্তিকেই পূজা দেবে, ব্যর্থতার মুখেও যে রণভঙ্গ জানে না, অন্তত কয়েক শতাব্দীর জন্য যে তার খোদিত ও চিত্রিত চিত্তসামগ্রীর কীর্ণসুন্দর সমাবেশ গড়ে তোলে, তুলবে, যেমন পার্থেননের স্বমহিম ধ্বংসাবশেষ।—

প্রাকযুদ্ধকালে এই ছিলেন রাসেল।

গণিতযুক্তিজালে ঘেরা, সংশয়িত, উৎকণ্ঠিত, দুস্তর-আশান্বিত।

তারপর এল বেড়াভাঙার দিন। কারণ মহামত্ততার ঘোর, আলোবাতাসমরা 'দুর্দৈব' তখন ঘনিয়ে এসেছে। রাসেলও বেরিয়ে এলেন। যুক্তি, তর্ক, সংখ্যাতত্ত্ব, অঙ্ক ও সংখ্যারাশির নিচে চাপা-পড়া শীর্ণ নীরক্ত অধ্যাপকের গুটিপোকা ছিঁড়ে প্রজাপতি-মানুষটি ফুটে উঠলেন, যেন প্রমুক্ত প্রমিথিউস, উজ্জ্বল অগ্নিশিখা—জগৎবাসী সচমকে দেখল, অফুরান সাহসের অধিকারী, মানবতার সংরক্ত প্রেমিক রাসেলকে। 'out of the recesses of his formulae the scholar stepped forth, and poured out upon the most exalted statesmen of his country a flood of polemic that did not stop even when they ousted him from his chair at the University, and isolated him, like another Galileo, in a narrow quarter of London.' সুদূর গ্যালিলিও কেন, তার নিকটতম ক্রোচের উপরেও এমনি 'জাতীয়' পুরস্কার বর্ষিত হচ্ছিল, হয়েছিল। রোলাঁ, বারবুসও ছিলেন। অবশ্য তার প্রজ্ঞাকে সন্দেহ করেও অনেকে তাঁর সত্তাকে স্বীকার করলেন ; কিন্তু তার বিস্ময়জনক এই রূপান্তর তাঁদের কাছে বিপদজনক মনে হ'ল—অ-ইঙ্গসুলভ অসহিষ্ণুতায় তাঁরা বেশ-কিছুক্ষণ দূরে রইলেন, বিমুখতায় ঘুরে দাঁড়ালেন। 'our embattled pacifist, despite his most respectable origins, was outlawed from society, and denounced as a traitor to the country which had nourished him and whose very existence seemed to be threatened by maelstorm of the war.'

এই 'ঘরছাড়া' সৃষ্টিছাড়া বিদ্রোহের পিছনে ছিল রক্তক্ষয়ী জাতিসংঘর্ষের প্রতি তাঁর তীব্র অনীহা। বিমূর্ত বুদ্ধি হতে চেয়েছিলেন (পূর্বোক্ত 'প্রথম' রাসেল), প্রকৃতই তিনি ছিলেন সংবেদনশীল অনুভূতি (আদি ও অকৃত্রিম রাসেল) এবং একটি সাম্রাজ্যের স্বার্থ অনুপাতে মরতে ও মারতে ধাওয়া গর্বিত তরুণদের (স্যাসুন-ব্রুকের কবিতা স্মরণীয়) জীবনের দাম তাঁর কাছে তাই সমধিক মূল্যবান মনে হ'ল (পূর্বোক্ত 'দ্বিতীয়' রাসেল)। 'He set to work to ferret out the causes of such a holocaust and thought he found in socialism an economic and political analysis that at once revealed the sources of the disease and indicated its only cure. The cause was private property, and the cure was communism.' তিনি দেখালেন, সব সম্পত্তিরই মূলে আছে চৌর্য আর হিংস্রতা। 'No good to the community, of any sort or kind, results from the private ownership of land. If men were reasonable they would decree that it should cease tomorrow, with no compensation beyond a moderate life-income to the present holders.'—তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, তাঁর 'Why Men Fight' প্রবন্ধে। রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির পোষকতা করে। যে-দস্যুতার ফলে সম্পত্তি গড়ে ওঠে, বেড়ে যায়, তার পক্ষে আইন, সংরক্ষণে অস্ত্রসজ্জা, যুদ্ধ—রাষ্ট্র তাই মৌলিক অশুভ। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে তাই শুভানুধ্যায়ী সমবায়-সংগঠন ও উৎপাদক সঙ্ঘেরই বহন করা কর্তব্য, তিনি জানালেন। তিনি আরো জানালেন, অঙ্গাঙ্গী ক'রে, স্বাধীনতাই সর্বোত্তম শুভ, নইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব। "Life and knowledge are today so complex, that only by free discussion can we pick our way through errors and prejudices to that total perspective which is truth. Let men, let even teachers, differ and debate ; out of such diverse opinions will come an inteligent relativity of belief which will not readily fly to arms ; hatred and war come largely of fixed ideas or dogmatic faith. Freedom of thought and speech would go like a cleansing draught through the neuroses and superstitions of the 'modern mind'." কিন্তু কৃত্রিম আধুনিকতার পক্ষে অর্জিত যাবতীয় পঙ্গু বিশ্বাস, অন্ধ গোঁড়ামি, অসুস্থ মনস্তত্ত্ব ও বিকৃতিকে ঢেকে বিরাজমান মনুষ্যত্ব,

ব্যক্তির সহজ সরল স্বচ্ছন্দ প্রবৃত্তি। সে-বিষয়ে তিনি: 'The instinctive part of our character is very malleable. It may be changed by beliefs, by material circumstances, by social circumstances, and by institutions.' এবং অর্থের চেয়ে শিক্ষাই দেয় শিল্পবরণের মনোভাব, তিনি বললেন, রেনেসাঁস তার প্রমাণ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূল তাঁর এই অভিমত, ইচ্ছা: 'to promote all that is creative, and so to diminish the impulses and desires that center round possession.' অতএব এই প্রয়োজনীয় প্রযোজনাকে ত্বরান্বিত করতে তাঁর স্বগৃহীত প্রথম নীতি হল ক্রমোন্নয়নের নীতি: 'the vitality of individuals and communities is to be promoted as far as possible.' দ্বিতীয় নীতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার, সহিষ্ণুতার: 'the growth of one individual or one community is to be as little as possible at the expense of another.' (দ্র° Why Men Fight এবং Mysticism and Logic)

'All this, of course, is rather optimistic—though it is better to err on the side of hope than in favour of despair··· His passion for the *a priori*, his love of "perfection more than life" leads him here to splendid pictures that serve rather as poetic relief to the prose of the world than as practicable approches to the problems of life. It is delightful, for example, to contemplate a society in which art shall be better respected than wealth ; but so long as nations rise and fall, in the flux of natural group-selection, according to their economic rather than their artistic power, it is economic and not artistic power which, having the greater survival value, will win the greater plaudits and the large rewards. Art can only be the flower that grows out of wealth ; it cannot be wealth's substitute. The Medici came before Michaelangelo.'

রাসেলের প্রোজ্জ্বল প্রজ্ঞাদর্শনে বিচ্যুতি খুঁজতে যাওয়া বৃথা, কেননা কালক্রমে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাই তাঁর রূঢ়তম সমালোচক হয়েছে। রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর আশাভঙ্গ এমন একটি ঘটনা। জমির রাষ্ট্রীয়করণ, সেখানে, অলিখিতভাবে, জোর করে ব্যক্তিগত মালিকানায় পর্যবসিত হয়েছে দেখে তিনি আঘাত পেলেন

এবং বুঝলেন যে, মানুষ এখন যা হয়ে উঠেছে, তাতে আর সে তার জমিজায়গার চাষবাসে, রক্ষায় তেমন সযত্ন উদ্যোগ দেখাবে না, যদি-না সে নিশ্চিন্ত হয় যে, স্বকীয় উন্নতিসাধন তার সন্তান-সন্ততিতেই বর্তাবে। 'Russia seems on the way to becoming a greater France, a great nation of peasant proprietors. The old feudalism has disappeared '—তিনি লিখলেন। বুঝতে শুরু করলেন, এই নাটকীয় ওলটপালট, তার যাবতীয় ত্যাগ ও বীরত্ব সত্ত্বেও, মাত্র রাশিয়ার ১৭৮৯-এ পর্যবসিত !

বরং তিনি একবছর চীনে শিক্ষকতায় কাটিয়ে বেশি ঘরোয়া বোধ করেছিলেন। সেখানে যান্ত্রিকতা কম, গতির তাড়না তত তীব্র নয়। চিন্তন ও মননের সুযোগ আছে—জীবন নিষ্পন্দ থেকে ছুরিকাঁচি চালাবার অবসর দেয়। 'In that vast sea of humanity new perspectives came to our philosopher ; he realized that Europe is but the tentative pseudopodium of a greater continent and an older—and perhaps profounder —culture ; all his theories and syllogisms melted into a modest relativity before this mastodon of the nations.'—"I have come to realize that the white race is not as important as I used to think it was." তাঁর চিন্তাধারা ভাঙতে শুরু করেছে। ১৯২৪ মে মাসে New York World-এর একটি সাক্ষাৎকারে এই ছিলেন, এম্নি হলেন রাসেল। শতাব্দীর প্রথম-পাদ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। রাসেলের সমাজদর্শনও পুনর্পরিবর্তিত। হতেই পারে। ইংলণ্ড থেকে আমেরিকা হয়ে রাশিয়া এবং অতঃপর ভারতবর্ষ ও চীনদেশ—এতদ্দূর-পরিক্রমা একটি জীবন্ত মনীষার পক্ষে অন্যস্বরসাধনায় যথেষ্ট প্রস্তুতি। 'The world has convinced B. Russell that it is too big for his formulae, and perhaps too large and heavy to move very rapidly towards his heart's desire. And there are so many hearts, and so many different desires ! One finds him now "an older and a wiser man" mellowed by time and a varied life ; as wide awake as ever to all the ills that flesh is heir to and yet matured into the moderation that knows the difficulties of social change.' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিনষ্টিজনিত সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাগুলি তাঁকে গণিতশাস্ত্র ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা থেকে প্রত্যক্ষ সমাজসমীক্ষায় সবিশেষ তর্কপ্রবৃত্ত, মনোযোগী ক'রে

দিল, অতঃপর তাঁর অধিকাংশ রচনাই বিবর্তমান বর্তমান সমাজ-রাজনীতি-ঘটিত সংকটমোচনে আমূলবিদ্ধ। মানুষের মনোজগতে দুষ্ট কামনাবাসনার উৎসসন্ধানে তিনি সারিবদ্ধ দেখলেন সন্দেহ ও ভয়, ক্ষমতার লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা—শুভঙ্কর সমাজ-সংগঠনে এসব, তাঁর মতে, অসামান্য বাধা এবং বিপত্তি। 'সুখের সন্ধানে' নেমে তাই তিনি লেখেন: 'The desire for excitement is very deep-seated in human being, specially in males' একদা এই উত্তেজনা-প্রশমনের কত সহজ সুযোগ ও অবাধ সুবিধাই ছিল! কালক্রমে কৃষিবিদ্যা আয়ত্তের সঙ্গে সঙ্গে 'life began to grow dull except, of course, for the aristocrats, who remained, and still remain, in she hunting stage.' এই মৃগয়াজীবী সভ্যতার রোগনির্ণয়ে তাঁর কোন ভুল হয়নি, আরোগ্য বিধানেও সমালোচনী সতর্কতার অভাব ঘটেনি। উপস্থিত-মতো তিনি বাতলেছিলেন, 'Happiness is promoted by associations of persons with similar tastes and similar opinions. Social intercourse may be expected to develop more and more along these lines, and it may be hoped that by these means the loneliness that now afflicts so many unconventional people will be gradually diminished almost to vanishing point' এর সবটাই আশাবাদে স্বপ্নিল ছিল না, বাস্তবচেতনা তাঁকে একথাও বলিয়েছিল: 'This will undoubtedly increase their happiness. but it will, of course, diminish the sadistic pleasure which the conventional at present derive from having the unconventional at their mercy.' এখানেই কালজ্বর ও ব্যাধি নিহিত। অগতানুগতিকদের ক্রমাগত গতানুগতিকের হাতে করুণার পাত্র ও খেলার পুতুল হ'তে হয়, হ'তে হচ্ছে! যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অসাম্য, বিশৃঙ্খলা, বিদ্বেষ, যুদ্ধোন্মাদনা, সর্বনাশ এই 'sadistic pleasure' চরিতার্থতার ভয়াবহ পরিণতি। স্ত্রী পুরুষ-সম্পর্কে সামাজিক সিংহাসীনদের নিদানেও যেজন্যে 'double standard'-এর খেলা তিনি দেখলেন, 'বিবাহ ও নীতি' গ্রন্থে তার বিপুল বিশ্লেষণ আছে; সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিরীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে, 'রমণীরমণরণ' থেকে বিশ্বরণাঙ্গণ পর্যন্ত যার বিস্তার ও ব্যাপ্তি, একে একে অনেক গ্রন্থে ও বক্তৃতায় উন্মোচিত করে তাঁর শ্লেষহাস্যাত্মক বিচক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি তিনি প্রমাণ করলেন। বলতে ছাড়লেন না: 'By self-interest Man has become gregarious, but in instinct

he has remained to a great extent solitary ; hence the need of religion and morality to re-inforce self-interest.' সংগে সংগে উচ্চারণ করলেন বিকৃত-নীতিধর্মগত নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির অভয়বাণী : 'If we could feel genuinely that we are the equals of our neighbours, neither their betters nor their inferiors, perhaps life would become less a battle ' কা কস্য পরিবেদনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ততা এবং তৃতীয়ের সন্ত্রাস, ইতস্তত খণ্ডযুদ্ধগুলিও বুঝিয়ে দিয়েছে, দিচ্ছে : 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। তিনি দুর্মর আশাবাদী। এবং একলা। তবু চিরচলন্ত।

১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার দান-কালে তাঁকে বিশেষিত ক'রে বলা হ'ল, 'ইনি আমাদের যুগের যুক্তিবাদ, মানবিকতাবাদের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র এবং পশ্চিমী চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতার নির্ভীক সমর্থক', আর তিনিও স্বভাবসুলভ বাকপটুতায়, অকাপট্যে পুরস্কার-গ্রহণী বক্তৃতায় ব'লে এলেন : 'Human beings show their superiority to the brutes by their capacity for boredom ' সংগে করলেন সভ্যতার নানা অভিনব রঙিন নেশা ও আতুরতার লক্ষণনির্দেশ : 'escape from boredom'-এর ব্যবস্থাস্বরূপ, "'Look at me' is one of the fundamental desires of the human heart. It can take innumerable forms from buffoonery to the pursuit of posthumous fame" এবং এই অদ্ভুত 'vanity'র পাশেই আরো অদ্ভুত 'enmity' : 'we love those who hate our enemies, and if we had no enemies there would very few people whom we should love.' যোগাযোগ ক'রে নেওয়া কঠিন নয়, কীভাবে কতদূর পর্যন্ত এই আত্মবিশ্বঘাতী enmity প্রবৃত্তিগত সংস্কারে পরিণত হয়ে গেছে, আধুনিক সভ্যতার পোষমানা, ভীরু ও ক্লান্তিকর জীবনযাত্রার মৌলিক ব্যাধির শ্রান্তিহর বহু দোষাবহ ক্ষত-ক্ষতিকর প্রতিষেধক-প্রীতিতে : 'civilized life has grown altogether too tame, and if it is to be stable, it must provide harmless outlets for the impulses which our remote ancestors satisfied in hunting'—'harmless outlet' খোঁজা হয়নি ; পশুমৃগয়া থেকে নরমৃগয়ায় গড়িয়ে গিয়েছে মাতাল ও রক্তচক্ষু সভ্যতা। 'অধিকার' 'অহমিকা' 'ক্ষমতাপ্রীতি' 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' মৌল মনোভাব দাঁড়িয়েছে—বিষম বাণিজ্য ও ভীষণ রাজনীতির 'মাতাল তরণী' এই চেতন-অবচেতন অন্তর্গত ঢেউয়ের ক্ষিপ্রক্ষিপ্ততম কর্মযোগ। 'Men who allow their

love of power to give them a distorted view of the world are to be found in every asylum : one man will think he is the governor of the Bank of England, another will think he is the king, and yet another will think he is God. Highly similar delusions, if expressed by educated men in obscure language, lead to professorships of philosophy and if expressed by emotional men in eloquent language lead to dictatorships'— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্বাহ্ণের এই 'সদুক্তি' শক্তিমদমত্ত অনেকের পক্ষেই 'কর্ণামৃত' হয়নি ; ইতিহাস তার মর্মান্তিক ফলাফল দেখেছে, অথচ সাময়িকভাবে ভ্রান্তি ও উদ্‌ভ্রান্তিজনকেরাই যে শিরোপা পেয়ে চলেছেন, শিরোধার্য হচ্ছেন, তার কারণ স্বয়ং রাসেলের একটি পরবর্তী পরিণততর সাক্ষাৎকারের সারালো উক্তি-প্রত্যুক্তি স্পষ্টভাবে দেখায় : 'আসলে সব-যুগেই যারা যুক্তিবাদী, দূরদর্শী, তারা সংখ্যায় কম। অধিকাংশ লোক স্থূল, চোখ-ঝলসানো, নাটকীয় হৈ-হুল্লোড়েই সহজে মজে।' 'জাতীয়তাবাদ পশ্চিমী সভ্যতার প্রভূত ক্ষতি করেছে, আজো করছে। স্বাজাত্যের মন্ত্র ব্যক্তির সহজ-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাকে সক্রিয় হতে দেয় না। একসময় ধর্ম এবং চার্চ এই কাজটা করত, আধুনিক যুগে সে-ভারটা নিয়েছে জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্র। জাতীয়তার মোহে ব্রিটেন ইয়োরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ফ্রান্স এবং জার্মানির সঙ্গে বারবার যুদ্ধ করেছে, এশিয়া এবং আফ্রিকার মানুষদের মানুষ ভাবেনি।' 'জাতীয়তা এবং গণতন্ত্র পরস্পরের বিরোধী আদর্শ ; অথচ আধুনিক সভ্যতার সূচনাকাল থেকে এ-দুয়ের মধ্যে একটা গোজামিল দিয়ে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। এই গোজামিলই হল পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল দুর্বলতা। যতদিন সাম্রাজ্য ছিল ততদিন এই গোজামিল নিয়ে আমাদের অহঙ্কারের অন্ত ছিল না। এখন সাম্রাজ্য হারিয়ে ইয়োরোপ ক্রমেই এই গোজামিলের চেহারাটা বুঝতে পাচ্ছে।' 'পশ্চিমের বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যদি আজ দুর্বল হয়ে পড়ে, তাতে শুধু পশ্চিমের ক্ষতি নয়, পৃথিবীর ক্ষতি। অন্য ধারে এশিয়া এবং আফ্রিকা যদি পশ্চিমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের ভাগ্য রচনা করতে চায়, তাতে শুধু এশিয়া আফ্রিকারই ক্ষতি হবে না, পশ্চিমেরও ঘোরতর ক্ষতি হবে। এদেশে যে খুব বেশি লোক একথা এখনো বুঝতে পেরেছে, তা বলা শক্ত। আমাদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল এবং দূরদর্শী তাঁরাও প্রধানত ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংরক্ষণ এবং পুনর্গঠনের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু পুব থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে পশ্চিমের পুনর্গঠন আজ একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজনেই পুবের সঙ্গে সহযোগিতার কথা আজ হোক কাল হোক তাদের ভাবতেই হবে।' একইভাবে ভাবিত হয়ে ইতিমধ্যে 'কমনসেন্স অ্যাণ্ড নিউক্লিয়র ওয়ারফেয়ার' গ্রন্থে তিনি আপসোস করেছেন পরমাণবিক যুদ্ধপ্রস্তুতি ও অস্ত্রঝন্‌ঝনি মহামারী প্লেগের চেয়েও ভয়ঙ্কর, প্রধান রাষ্ট্রগুলি এখনো তার প্রতিরোধে সমবেতভাবে অগ্রসর নয়—এতে সকলে মিলে সদলে আত্মহত্যার মহড়াই হচ্ছে। 'হ্যাজ ম্যান এ ফিউচার' গ্রন্থে আরো সোচ্চার কণ্ঠে বলেছেন—পশ্চিমী পৃথিবী এক বিচ্যুত ব্যাখ্যাতীত মৃত্যুকামনায় আজ আচ্ছন্ন। পরমাণবিক যুদ্ধের বীভৎসতা সম্বন্ধে সব তথ্য জেনেও পশ্চিমী রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এ-বিষয়ে কিছুই করছেন না। সর্বজনীন ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক সোভিয়েত প্রস্তাবকে পশ্চিমী দেশগুলি যে গুরুত্ব দেয়নি, রাসেল তাকে একটা বড়ো রকমের ভুল বলে মেনেছেন। বলেছেন : যদি তারা আন্তরিকভাবে অস্ত্রবর্জন চাইত, তাহলে এই মহাভুল করত না। কখনো উদারপন্থী, কখনো সমাজতন্ত্রী, কখনো শান্তিবাদী রাসেল, আদৌ যিনি নিজের কথায়, প্রকৃতপক্ষে, 'সুখদুঃখবাদী',-'সুখদুঃখভাগী', তাই শেষ পর্যন্ত চরমে-চড়া মানুষের মন থেকে চরম-দুঃখজনক মহামারী যুদ্ধপ্রেরণাকে উৎপাটিত করতেই তিনি চেয়েছিলেন। হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে তাঁর মেরু-বিপরীত সার্ত্র-এর সঙ্গেও প্রতিরোধের সমভূমিতে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। জোরের সঙ্গে বারবার বলেছিলেন : শান্তি, শান্তির বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ কোনো সমাজব্যবস্থার ভালোমন্দ শুভাশুভ মীমাংসিত হতে পারে যুদ্ধে নয়, সহাবস্থানে। বীরশোক আজ 'অসির ঝংকার' নয়, 'অশ্রু'।

বিশেষ করে এজন্যেই তাঁর জীবনের প্রত্যন্তে ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের বিপক্ষে তিনি জনমত গঠনের কাজ সর্বপ্রযত্নে করে যাচ্ছিলেন, ঐদেশে মার্কিনীদের বীভৎস অপরাধ সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে অবহিত করছিলেন। যেন তাঁর নিজেরই বিশিষ্ট অভিমত সাড়ম্বরে অভিনীত দেখছিলেন এই রাশিকৃত শোচনীয় ঘটনার ঘনঘটায় : 'ক্যানসারে কতকগুলি জীবকোষ সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকা নিয়ে দেহের অন্যান্য অংশে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে। অথচ এভাবে সে সারা দেহে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে। স্বার্থগতভাবে মানুষের শরীর হচ্ছে একক। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের স্বার্থ হাতের কনিষ্ঠার স্বার্থ-বিরোধী হতে পারে না। দেহের একাংশের উন্নতি করতে গেলে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় সারা দেহের উন্নতি করতে হয়।··· বিজ্ঞাননির্ভর সমাজকে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এমনিভাবে এক ও অভিন্নভাবে নিঃস্বার্থ হতে হবে। জগতের বিভিন্ন দেশের পরস্পর-নির্ভরতাই

অনুভূতিক্ষেত্রের প্রসারকে আজ অনিবার্য, অত্যাবশ্যক করে তুলছে।… উদ্দেশ্যের একতা সম্ভব হবে না যদি অনুভূতির অনৈক্য থাকে, সব অনুভূতির মধ্যে সাম্য না থাকে। প্রবাদ আছে যে, বেড়ালেরা লড়াই করে যতক্ষণ তাদের লেজের ডগাটুকু বাকি থাকে। পারস্পরিক প্রীতি থাকলে তারা সুখেই বাঁচত।'

মার্জার থেকে মনুষ্যপ্রসঙ্গ সুদূরস্থিত নয়। এমন-কি ডাইনোসরের অবলুপ্তি এবং ইঁদুরের 'ঊর্ধ্বশ্বাস চলা' ও 'রুদ্ধশ্বাস থামা'র সাক্ষাৎ জীবন্ততা এখনো মানবসভ্যতার পক্ষে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। তাই রাসেল একই প্রবন্ধে লিখেছিলেন: 'এখন আমাদের বুদ্ধি বেড়েছে, প্রয়োগ-কৌশল উন্নত হয়েছে। অতীতের অত্যাচারী মনোবৃত্তির নির্দেশে যদি এখনো চলি, আমাদের ধ্বংস তবে অনিবার্য। আমরা মহাকায় সরীসৃপ ডাইনোসরের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। তারাও একদিন সৃষ্টির অধীশ্বর ছিল। সেদিন যুদ্ধজয়ের জন্য তারা দেহের উপর অসংখ্য ধারালো শিং গজিয়ে নিয়েছিল। যদিও কোন বিরাটতর ডাইনোসরের কাছে তাদের পরাজয় হয়নি, তবু তাদের বিলোপ ঘটেছিল পৃথিবী থেকে, জায়গা ছাড়তে হয়েছিল ইঁদুরের মতো ছোটো জীবদের জন্য।'

'আমাদের ভাগ্যেও ওই একই ব্যাপার ঘটবে যদি বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে বিচক্ষণতার সংযোগ না ঘটে। মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি একদিন হাইড্রোজেন বোমা সমেত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেপণযন্ত্র চাঁদে গিয়ে নামবে এবং উভয়কে নিশ্চিহ্ন করবে। ভবিষ্যতের এই ছবি আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় বোধ হয় না। আমার মতে যতদিন না নিজের সংসারে আমরা শৃঙ্খলা আনতে পারি ততদিন চাঁদের শান্তি আমাদের না ভাঙাই উচিত। আমাদের নির্বুদ্ধিতা আজো পৃথিবীর মধ্যেই সীমিত আছে, তাকে বিশ্বজগতে বিস্তৃত করার জয় ঠিক জয় নয়। ইচ্ছাপূরণের যে-ক্ষমতা বিজ্ঞান আজ আমাদের হাতে দিয়েছে তাকে যদি অভিশাপে পরিণত করতে না চাই, ইচ্ছার সংযম তবে অবশ্যকর্তব্য। মহৎ উদ্দেশ্যেই এই নিয়ন্ত্রণ। এতকাল প্রতিবেশীকে ভালবাসার রবিবাসরীয় উপদেশ পেয়েছি এবং সোম থেকে শনিবার প্রতিবেশীকে ঘৃণা করে এসেছি। একদিন ভালবাসার কথা শুনেছি, ছয়দিন ঘৃণা করার সুযোগ নিয়েছি। ঘৃণার ফলাফল এ পর্যন্ত আমাদের নিজ সীমায়, অক্ষমতায়, সংকীর্ণ ছিল। কিন্তু যে-নতুন জগতে প্রবেশ করেছি সেখানে এ-সীমারেখা নিশ্চিহ্ন হবে। তখনো ঘৃণাবৃত্তি না ছাড়লে বিপর্যয় আসবে সর্বাঙ্গীণ এবং সামগ্রিক…।'

'এখন রাজনৈতিক উন্নতি দুই জাতির সহযোগিতায় সম্ভব, পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়। দ্বন্দ্বিতা যে চলেছে তার কারণ আধুনিক প্রয়োগবিদ্যার সঙ্গে

আমাদের অনুভূতির মিল হয়নি। যেভাবে তা চলেছে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় তাতে স্পষ্ট, তবু বিভিন্ন জাতি একে অন্যের প্রতিযোগী হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের প্রয়োগবুদ্ধি যতটা উন্নত হয়েছে, ভাবাবেগ ততটা উন্নত হয়নি। প্রয়োগকৌশলের অনুভূতিহীন বিস্তার সার্থক হয় না, কারণ তাতে অভিপ্রায়ের সমন্বয় নেই। ·· অজ্ঞান পেরিয়ে জ্ঞানের সন্ধানে নামলেই সব হয় না। সঙ্গে অমঙ্গল-ইচ্ছার বদলে মঙ্গল-ইচ্ছা চাই। ·· যাঁরা এই মঙ্গল চান বর্তমানের এই পথ-নির্বাচনের দিনে তাঁদের সমগ্র অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে যেন প্রকৃত জ্ঞানের পথটা বুদ্ধিমানের মতো বেছে নিতে পারি।'

রবীন্দ্র-মুগ্ধতার 'মনের চলার আনন্দে' পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যেতে যেতে, পৌঁছিয়ে, আত্মজীবনীতে তিনিই লিখতে পারলেন : 'Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart.' পুনশ্চ রবীন্দ্রনাথের কথায় : 'মানুষকে ছেড়ে কোনো দেবতাকে পাওয়ার কথা এ নয়, এ নয় পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গের দিকে তাকানো।' এ যেন কোনো জলাচল মতে ও ভাবে বদ্ধ না-থাকার মুক্ত মনের অবগাহন; 'রূপনারানের কূলে' 'সদসৎবিবেকী'র জাগ্রত প্রহরা ব্যর্থ হয়নি। দ্বিজত্বে সিদ্ধার্থ রাসেলকে আত্মস্থ দেখে এ-কথা সেজন্য আক্ষরিক সত্য বলে মনে হয় : 'Doubt is only the beginning of wisdom ; modesty is its end.'

এই রচনায় স্বয়ং রাসেলের বিভিন্ন রচনা এবং ডুয়ার্ট-এর একাধিক প্রবন্ধ, শিবনারায়ণ রায়ের প্রবাসের জর্নাল অংশবিশেষ ব্যবহৃত হয়েছে; রবীন্দ্রনাথ বলা বাহুল্য।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, তাঁর গদ্যশিল্পশৈলী

সদুক্তি আছে : সকালের দর্পণে দিনের মুখ ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকৈশোরশিক্ষার নানা আয়োজনে, প্রতিক্রিয়ায়, প্রভাবপ্রেরণাগত আত্মপ্রস্তুতিতে ভবিষ্যতের অনেকটাই যে বেশ একান্ত একাগ্র ক'রে ধরেছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। জ্যোতিঃপ্রকাশের লাইনটানা খাতায় বাল্যের সেই আট-ছয় চোদ্দমাপের তানমাত্রিক পদচারণে বা শ্লেটের পিঠে ললিতকোমল ধ্বনিমাত্রিক বৈষ্ণব পদের কৈশোরক অনুরণনে বা 'ভোরের পাখি' বিহারীলালের নিভৃত নির্জন মন্ময়তায় এবং বাইশ বছরের তারুণ্যে শোনা 'বাউল গানে'র "স্বাভাবিক" (তাঁরই কথায়) বা লৌকিক ছন্দে-সুরে যেমন তাঁর বিচিত্র-পথযাত্রী প্রতিভার সৃজনশীলতায় মর্মস্পর্শ প্রথম ঘটেছিল, তাঁর যুক্তিবাদী মননধর্মিতার সম্ভাবনা-সূচনাও তখন, একইভাবে সমতুল্য ধরনধারণে, প্রবণতায়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বসত্যবিষয়ে বহুবার নানাপ্রসঙ্গে একটি যে প্রধান প্রতিপাদ্য পেশ করতে চেয়েছেন, মুখ্যত কবি তিনি, তাই কবিতার বিষয়টাই এখন অগ্রগণ্য, সেটি হলো : মাত্র ব্যক্তিক-সামাজিক বা জাতীয় অহঙ্কারে ও স্পর্ধাপ্রকাশে নয়, অনুকরণে তো নয়ই, আপন একান্ত অনুভূতি ও তদনুয়ায়ী সামর্থ্যের যথাযথ উচ্চারণে যদি স্বকীয় 'মর্মস্থান'টির 'আবিষ্কার' স্পষ্টত ধ্বনিত হয়, কোনো কৃত্রিমতায় নয়, সাবলীল স্বাভাবিকতায়, স্বতঃস্ফূর্ততায়, সুকবিতার প্রতিষ্ঠা তবে সেখানেই। ১৮৮৩ 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় 'বাউলের গান' আলোচনা-কালে তিনি যা লেখেন, রবীন্দ্র-জীবনীকার সে-প্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন : 'এই প্রবন্ধের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা সম্পর্কে যে মন্তব্যটুকু করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই কাব্যজীবনের কথা।' এবং আমরা বলি, এ তাঁর কাব্যসমালোচন-জীবনেরও কথা। সেই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য আত্মোপলব্ধি বা স্বকীয় 'মর্মস্থান'-'আবিষ্কার'। তখন তিনি বাইশ বছর-বয়স্ক তরুণ, লিখেছিলেন "...কোন কোন কবি...যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভভাগে পরের অনুসরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, .. অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন তাহা কোন একটি বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে, চারিদিকে হাতড়াইতে হাতড়াইতে, সহসা নিজের যেখানে মর্মস্থান,

সেইখানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাঁহার বিনাশ নাই।…ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, তাঁহার প্রাণের মধ্যেই একটি বাদ্য আছে। বাজাইতে গিয়া উল্লাসে নাচিয়া…কহিলেন…আমি যে কথা বলিব মনে করি, সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে।" (দ্র° সমালোচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত-২, পৃ ১৩১, বি. ভা. সং.) সেদিনই পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্য-ভাবিত আধুনিক আত্ম-বিশ্বপ্রেম নয়, বাউলের খাঁটি দেশজ বিশ্বাত্মবোধের বিশুদ্ধতা তাঁর মনে যে-প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল, তা হলো, সংক্ষেপে : "**Universal love** প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভাল শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে।" এই স্মৃতি মাত্র নয়, এই অনুভূতি ও উপলব্ধিই ছিল তাঁর জীবনের 'চিরপাথেয় চিরযাত্রার'। পরে তাই তাঁকে একই প্রসঙ্গে বলতে শুনি : "বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।" এবং আরো স্পষ্ট করে : 'আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই একটা বাউল কোলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,—কোথায় পাব তারে / আমার মনের মানুষ যে রে। / হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে / দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে। —কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণবেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম। তাঁর গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে-শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। "অন্তরতর যদয়মাত্মা" উপনিষদের এই বাণী তাঁদের মুখে যখন "মনের মানুষ" বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল।' সেই তরুণ মনে যা ছিল সেদিন 'বড় বিস্ময়', পরবর্তী পরিণত বলিষ্ঠ জীবনে তা-ই হয়েছিল তাঁর অন্যতম বড় বিশ্বাস, 'অন্তরতর'কে অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির বলীয়ান দিনের অপেক্ষা তাঁকে করতেই হয়েছে, কেননা 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। ক্রমশ বয়স ও অভিজ্ঞতাগুণে স্বপ্রবণতা ও স্বতঃস্ফূর্ত নৈপুণ্য মিলিয়ে ভূমাবোধে, বিশ্বাত্ম-অনুভবে তিনি যে পৌঁছতে পারবেন, পৌঁছবেনই, তারই সূচনা ঘটেছিল সেই প্রথম মরমী-সংস্পর্শে, 'মর্ম'-স্পর্শে, অপরিস্ফুট স্বোপলব্ধির অনতিস্বচ্ছ 'ধ্রুবতারা'য়—পরে আর-কিছুতেই 'পথহারা' ও নিরাশ্রয় হওয়ার ভয়-শঙ্কা তাঁর তাই রইল না ; 'ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে' সেই যে 'সহসা দেখিলেন,

তাঁহার প্রাণের মধ্যেই একটা বাদ্য আছে', সেই অতি-নিজস্ব 'মর্মস্থান'টি অধিকার করার আনন্দ-আবেগেই তিনি অতঃপর আপন 'প্রাণের সকল সুরগুলি' একে একে স্বকীয় 'ভাষা ও ছন্দে', স্বভাবে বাজিয়ে চলবেন, দেখবেন, 'আমি যে কথা বলিব মনে করি, সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে'। ক্রৌঞ্চ-শোক-অভিভূত শ্লোক-বিস্ময় তাই 'বাল্মীকি প্রতিভা'র তরুণ কবি-মনের উপযুক্ত বিষয়, চিরজিজ্ঞাস্য—পরবর্তী সুপরিণত 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় তারই নিবিড় নির্ণয়, পরিণামসাধন—'সারদামঙ্গলে'র বিহারীলাল শুধু তাঁর বয়ঃসন্ধির হাতড়িয়ে-ফেরা অস্থিরতা-অনিশ্চয়তাটুকু পেরিয়ে যেতে অরুণালোকেব দিশারী, রবিকরোজ্জ্বল-পূর্ব ভোর, আর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে 'অপণ্ডিতের মুখে' 'গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়' সেই 'বাউলের গান'ও তাঁকে তাঁর সেই নবীন তারুণ্যে, আপন 'মর্মস্থান'টিতে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেওয়ার ভৈরবী। উত্তরকাল তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতিকীর্তির বিশাল সম্পন্ন স্বাভাবিক প্রবণতায়, স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠায় সেই তরুণশ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিশ্রুতির ভূমিকা তথা তাঁর পরবর্তী সাফল্য-সার্থকতার পরিণামে তার যে গুরুত্ব, তারও স্পষ্টাক্ষর সাক্ষ্য বহন করছে।

ফলত ঐ 'ভারতী'রই পাতায় পাতায় তথাকথিত 'কৃত্রিম' মধুসূদনকে খণ্ডিত ও লণ্ডভণ্ড ক'রে সেই যে নবীন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ক্রমপ্রকাশ সেদিন, তা তাঁর দিক চেয়ে অপরিণামদর্শী আতিশয্য ও ভ্রান্তি ততটা নয়, যতটা নিজস্বত্বসচেতন স্বেচ্ছাস্বাধিকার ঘোষণার 'প্রমত্ত' ইসারা। রবীন্দ্রনাথের শিরায়-স্নায়ুতে এপিকের কোন সমর্থন নেই, যতই তিনি পরে কোনোদিন 'ক্ষণিকা'-পরিহাসে বলে থাকুন : 'আমি নামব মহাকাব্য সংরচনে / ছিল মনে'। লিরিক তাঁকে 'আজন্মসাধন ধন' 'মানসসুন্দরী'র মতো ঘন আশ্লেষে জড়িয়ে ধরেছিল, তিনিও তাই কতকটা অর্বাচীন দম্ভভবে 'মহাকবি' মধুসূদনকে নির্মম বাক্য-ব্যবহারে অগ্রাহ্য করেছিলেন (আর তারই ঝোঁকে অত্যন্ত অন্যমনস্কতায় 'ব্রজাঙ্গনা'র মাত্রাবৃত্তে মধুসূদনের স্বচ্ছন্দবিহার পর্যন্ত লক্ষ করেননি, পরে পরমায়ুপ্রান্তে তাঁর সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনকালে সবিস্ময় নতুন পাঠে তাঁকে ঐ ভূমিকায় যেন প্রথম আবিষ্কার ক'রে চমকে ওঠেন, আফশোস করেন—'এপিক' কবি হিসেবে তাঁর অগ্রগণ্যতার বিড়ম্বিত খ্যাতিই এজন্য অনেকাংশে দায়ী—অবশ্য তাঁর 'বীরাঙ্গনা'র পত্রকবিতায় ধরা এক ধরনের 'ড্রামাটিক মনোলগ'গুলি, বিশেষত সেখানকার কয়েকটি অসামান্য নারীর মৌলিক মনোভাব, অনুভব, বিচার ও বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের ক'টি উল্লেখ্যতম কাব্যনাটিকায় প্রভাব ও প্রেরণা বিকীর্ণ করেছে); নিতান্ত বাল্যশিক্ষাকালেই আভিধানিক অর্থ ও প্রতিশব্দগত ভাষাবিদ্যার যুযুৎসু হিসেবে

মেঘনাদবধের পঠনপাঠন তথা তার পীড়নকারী অপপ্রয়োগ তাঁর এ-সাহিত্যিক অনীহার কারণ সত্ত্বেও 'তন্ময়' নয়, 'মন্ময়' খণ্ডকবিতার গীতধর্মিতায় স্বাভাবিক ঝোঁকই 'মহাকবি'-মধুসূদন-পরিহারের মূল। তাই তদবধি কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন 'হাজার গীতে'র 'কাঁকন-কিঙ্কিণী'তে মুগ্ধ অবিরাম 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় বা 'সুদূরের পিয়াসী' চিরচাঞ্চল্যে ক্রমাগত এগিয়েছেন, স্থিরধীর দৃঢ়তায়; তেমনি কাব্য-নাট্য-কথাসাহিত্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাঁর স্বমনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির অকম্পিত প্রতিফলন ঘটিয়েছেন বহুবার—নিকট-সমসাময়িকদের নিয়ে নিপুণ আলোচনা-বিচারেই হোক (যথা 'আধুনিক সাহিত্য'—এখানে অবশ্য লক্ষণীয় যে, 'ভারতী'র পাতায় উপর্যুপরি মধুসূদনই যেহেতু ছিলেন তখনকার একমাত্র আঘাতসহনক্ষম সত্ত্বগত যোগ্য কবিপ্রতিভা—অথচ তাঁকে তিনি পরিণত গ্রন্থিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনায়, যেমন এই গ্রন্থেই, একবারও স্মরণীয় ক'রে তোলেননি, নিশ্চয়ই তা এক শোচনীয়তম ক্ষতির দৃষ্টান্ত, পরে পরিণততর বিচারে-বিশ্লেষণে নানা প্রসঙ্গেই তাঁর পূর্বপ্রমাদের প্রায়শ্চিত্ত ব'লে কিছু কিছু মূল্যবান আলোকপাত ঐ মধুসূদন-প্রসঙ্গেই তিনি অবশ্য অনিবার্যত করেছিলেন—কেননা মধুসূদন তখনকার মতো, তাঁর কাছে, পরিহার্য হলেও, চিরকালের মতো বাংলা কাব্যে অস্থিমজ্জার মতোই যে অপরিহার্য হয়ে গেছেন); প্রাচীন ভারতীয় লেখকদের (বিশেষত কালিদাস) বহুবর্ণময় ভাবাদর্শবর্ণনায় হোক (যথা 'প্রাচীন সাহিত্য'); দেশজ গ্রামজ সাহিত্যসংগ্রহের আনন্দ-আমন্ত্রণে ও গভীর বিশ্লেষণেই হোক (যথা 'লোকসাহিত্য') অথবা তাঁর সায়াহ্নকালীন সাম্প্রতিক বাংলা, ইংরেজি বা অন্য প্রতিবেশী সাহিত্যের সুমতি-দুর্মতি-নিরীক্ষাতেই হোক (যথা 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ')।

রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি ও সাহিত্যজিজ্ঞাসু ছিলেন না; সামাজিক হিতচর্চা ও পরাধীন দেশের অবশ্যম্ভাবী রাজনীতিচিন্তার পুরোগামী লেখক হিসেবে তাঁকে যে ক্রমে ক্রমে সাব্যস্ত হতে হলো, সেজন্য তাঁর সাময়িকী সম্পাদনা বা সংস্পর্শের দায়িত্ব (ভারতী, সাধনা, 'বঙ্গভঙ্গ'-যুগীয় ভাণ্ডার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের হাত ঘুরে বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শন নবপর্যায় বা প্রবাসী ও সবুজপত্র বিশেষত স্মরণীয়) একমাত্র কারণ নয়। দেশবিদেশের সমকালীন আদর্শ-সংঘাতজনিত স্বজাতির সামগ্রিক কল্যাণচিন্তাই তাঁর বিবেকে এসে যে নিত্যনতুন উদ্বিগ্ন চেতনার আঘাত হেনেছে, এক্ষেত্রে মুখ্য প্রতিক্রিয়া তারই। এবং যেহেতু র‍্যাশনলিটির সংগে গদ্য-লেখকদের প্রত্যক্ষ কারবার, রবীন্দ্রনাথও তাই তাঁর গদ্যের মাধ্যমে সেদিনকার অন্যতম প্রধান তর্ক ন্যাশনলিজ্‌ম্ বনাম ইণ্টারন্যাশনলিজ্‌ম্-এর সত্যমিথ্যাবোধে

কণ্টকিত হয়ে আসল ব্যাধির নিরূপণে ও প্রতিকারে নেমে এলেন। এর সূত্রপাত তাঁর প্রথম বিলাতগমন-প্রসূত য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে। স্বদেশিয়ানায় বিদেশি স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে বিক্ষেপ ঘনীভূত হয়েছিল সেদিন, প্রবীণ জ্যেষ্ঠাগ্রজের সংগে অতিনবীন অনুজের নাতিবিস্তৃত মতান্তরে ও বিতর্কে যা শিকড় মেলল, তারই ক্রমপ্রসার তাঁর জীবনব্যাপী অচিরাচরিত সমাজসমীক্ষায়, রাজনীতি-চর্চায়, ইতিহাসবিচারে। 'আর্যামি' ও 'হিন্দুত্ব'র অহংকার, 'আদি ব্রাহ্ম-নব্য ব্রাহ্ম' বিসংবাদ জাতীয় "একঝোঁকা সংস্কার আন্দোলনকে তিনি চিরদিনই অগ্রাহ্য করিয়াছেন"। তাঁর বাইশ বছরের নবযৌবনেই তিনি সমাজহিতৈষণার সারসত্যে পৌছন, "আমাদের সমাজের পদে পদে এতশতপ্রকার কর্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলা অস্পষ্ট বাঁধিবোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না।..." পক্ষান্তরে "সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারিদিক হইতে বিকশিত" করে তোলাই বরং সমীচীন। 'ন্যাশনল'-আতিশয্যে সমাজপুরুষদের যে-উৎসাহ সেদিন ফেনিয়ে উঠেছিল, অতঃপর সে-সম্পর্কেও তিনি সোৎকণ্ঠ সোচ্চার হয়ে লিখেছেন: "ন্যাশনল থিয়েটার, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপার ইত্যাদি।...সম্প্রতি ন্যাশনল ফণ্ড আর একটা কথা শুনা যাইতেছে।—একমাত্র political agitation-ই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।" তাঁকে তাই পথনির্দেশ করতে হল: "আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।—ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।—ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না।—ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্ম-নির্ভরের পথ স্থায়ী।" এবং সেই আত্মনির্ভরে পৌছবার পথ আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তি-সাক্ষাৎ, অতএব বাস্তববোধবুদ্ধির সহায়ক ইতিহাসচেতনা। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠের চিরসত্যটিও তাই তাঁকে ক্রমশ উপস্থাপিত করতে হয়েছে। এবং সেইসঙ্গে সমাজের ব্যাধিকে নিছক সামাজিক মনে করে কখনো তার সস্তা সুলভ পণ্ডিতী প্রতিকারে তিনি অবতীর্ণ হননি। দেশবিদেশের রাজনীতির সংগে, বিশেষত যখন 'রাজা' ইংরেজ বিদেশি, ও 'প্রজা' ভারতীয় দেশি, নিজেদের সমাজব্যাধিকে যুক্ত করে দেখেছেন, ঐতিহাসিক ভাবে মূল্যবান তাঁর প্রথম যুগের লেখা 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ এ-প্রসঙ্গে মনে পড়তে বাধ্য। এখানে তিনি ইংরেজ চরিত্রে 'অলক্ষ্মী-প্রবেশপথ' যেমন অব্যর্থ লক্ষ্য করেছেন, ভারতবাসীর বর্তমান লক্ষ্মীছাড়া অসহায় অবস্থাকে তেমনি নিপুণ বিশ্লেষণে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। আবার এখানেই ভাবপ্রবণের মতো থেমে না গিয়ে ইংরেজের সংগে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষে আত্ম-সম্মান-রক্ষার অমোঘ ঔষধটি কালজয়ী বৈদ্যের ভংগিতে বাতলে দিয়েছেন: "যে

নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না, সে পৃথিবীতে সম্মান পায় না।" এবং সেই সম্মান-পুনরুদ্ধারে ভারতবর্ষের সত্যচরিত্রসন্ধানে তিনি অতঃপর বিশ্ব-ইতিহাসে বিস্তৃত হয়ে গেছেন। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের সামান্য উপলক্ষে যে-চেতনার জন্ম তার ক্রমপরিণতির পথসন্ধান দেখে হয়তো বিহ্বল হওয়াই সম্ভব, যখন তাঁর এ-পর্যায়ী গ্রন্থপঞ্জী বা কালানুক্রমিক চিন্তাসংগ্রহে 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষে'র আত্মানুসন্ধানের পাশে 'রাজাপ্রজা' ও 'স্বদেশে'র এমন-কি 'সমাজে'র তীক্ষ্ণ তীব্র বিপুল অবস্থাপরিক্রমাকে তুলে এনে ধরতেই হয়। শিক্ষাবিষয়ক রচনাগুলির দর্পণেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সুকৃতি-দুষ্কৃতির চেহারায় তিনি যা ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর বৃহত্তর সমাজহিতচিন্তার ললাটকুঞ্চন, জটিল ভ্রূকুটিও, যে প্রতিভাত তা দেখে, এবং মধ্যযুগের 'হিন্দু মুসলমান'-'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ও অন্ত্যযুগের 'কালান্তর' 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধধৃত তিক্ত-বিরক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুধ্যানে বসে কিছুতেই এ-সিদ্ধান্তকে এড়ানো চলে না যে, তিনি একই সত্তায় সাংসারিকের মত আত্মোপকারে অধার ও ঋষির মত নির্মোহ-সত্যদর্শী। সে-সত্যদর্শন তথ্যের বিবরণমাত্রে নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অন্তস্তলস্পর্শী, এ-জাতীয় যে-কোন রচনাই তার প্রমাণ। ফলত তাঁর শিক্ষাসমাজদর্শনের ভিত্তিমূলে স্বদেশি সমাজ ও স্বায়ত্তশাসনের মাটিছোঁয়া বাসনা থাকলেও তাঁর অন্তর্দর্শী আকাঙ্ক্ষা আরো উচ্চগামী নিখিল মানবহিতের বহুস্তর ও বহুতল-সমন্বিত মণ্ডপের শীর্ষস্পর্শী। এজন্য ভাবুকতা বা কল্পনাবিলাস নয়, কাণ্ডজ্ঞান ও বাস্তববুদ্ধিই তাঁর প্রণোদনা।

জীবনকে অখণ্ড শিল্পমর্যাদায় স্পন্দিত ও মন্দ্রিত করতে চেয়ে তিনি যে অনেক প্রাবন্ধিক অভিজ্ঞান রেখে গেছেন, তার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বিশিষ্ট তাঁর ধর্মবোধ-মর্মরিত গদ্যরচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মদর্শনের অন্তঃসার নিবেদন করেছেন, 'ধর্মে'র উপদেশমালায় তো বটেই, সর্বোপরি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে, যেখানকার মানবধর্ম-বিশ্লেষণে উপনিষদী শান্তসুদূর বিজন আবহাওয়ায় আধুনিক জীবনের জনতাযন্ত্র-বিক্ষুব্ধ শ্বাসকষ্ট ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু তাল তার মৃদু, যেহেতু সমাজব্যাধির মারি, রাজনীতির বিষ, ইতিহাসের লাঞ্ছনা উক্ত কষ্টবোধের প্রত্যক্ষ জনয়িতা নয়—অথচ এই স্থানকালে উপদ্রুত আত্মাই মূল! বিধ্বস্ত অহংকার এ-সাধনবৃক্ষের জটিল শাখা-প্রশাখা, নির্বিকল্প আত্ম-চেতনার অগ্নিশুদ্ধ পরমান্যচিন্তাই সফল ফুল। রবীন্দ্রনাথ এখানে স্বেচ্ছানির্বাসিত, যেহেতু নির্বাসন ব্যতিরেকে এ-ভাবনির্যাস উচ্ছ্বসিত হতে বাধা পায়, যথার্থ 'আত্মপরিচয়ে' ব্যাহতি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম বা আধ্যাত্মিক চিন্তাকে আনুষঙ্গিক অন্য সামাজিক চিন্তার সমপাংক্তেয় করতে চাননি হয়তো একমাত্র এই কারণে যে, অন্যত্র সব বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মানুষ ব্যবহারিক, স্বয়ং

তিনিও তাই ; অথচ এক্ষেত্রে মানুষকে এমন নির্মল-আধ্যাত্মিক হতে হয় যা অন্য সংসর্গে ও প্রসঙ্গে অসাধ্য। এই পর্যায়ে পরিণতকালের আশ্চর্য লেখাগুলি যেজন্যে নামতই 'শান্তিনিকেতন'-মার্কা নয়, জন্মসূত্রে, রসচরিত্রেও তথৈবচ। প্রসঙ্গত দূর বাল্যে একাদশ-বর্ষীয়ের সেই উত্তর-উপনয়নপর্বে গায়ত্রীমন্ত্রে যে-ঝোঁক দেখা গিয়েছিল ও সেই মন্ত্রজপকালে গ্রহমণ্ডলসমেত আকাশের বিরাট রূপকে মনে আনার যে-বিশ্বানুভূতিপ্রবণ চেষ্টা, তা অবশ্যই স্মরণে আসে।

জগৎ ও জীবনের সব দেশে যাঁর ঘরখোঁজার পালা, তিনি অনায়াসে ধর্মচিন্তার পাশে বিজ্ঞানজিজ্ঞাসাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন, মানুষের সমগ্রতায় সে যে এক বড়ো আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালে ভাব-অনুভূতি-উপলব্ধির অনুষঙ্গী হয়ে বস্তুসত্য-সন্ধানের আয়োজন তো নিত্য ব্যাপার, একরকম অভ্যাস ও সংস্কারের মতো। তাই ধর্ম তাঁর কাছে যে-সঞ্জীবনী বিশ্বানুভূতি ধারণ করে, গ্রহনক্ষত্রসমেত বিশ্বের সামাজিক বাহ্যজ্ঞান সে-তুলনায় কতখানি চিন্তা-চেতনা-পরিণতির সহায়ক, তা তলিয়ে না জেনেও বলা চলে যে, রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি-দৃষ্টিতে একটি আরেকটির সম্পূরক। তত্ত্ব ও তথ্যের মতো, এ-দুয়ের সম্মিলিত আলোই মানুষকে সত্যে পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রত্যন্ত বেলায় উপনীত হয়ে 'বিশ্বপরিচয়' নামে যে-বিস্ময়কর বিজ্ঞানবিষয়চর্চা করলেন, সে-উপলক্ষে তাঁর উক্ত তথ্যসন্ধানী অভিপ্রায় যেমন, তাঁর প্রয়োগপ্রবণ কাণ্ডজ্ঞানের অভিব্যক্তিও তেমনি স্বীকার্য। যতই তিনি কবি হোন, মাত্র কবিতা বা সাহিত্যপাঠে জীবনের বিকাশ যে অসম্পূর্ণ তা তিনি খুব জানতেন। তাই হিমালয়ে পিতার কাছে জ্যোতিষ্কশাস্ত্রীয় শৈশবশিক্ষা সফল করেছেন তিনি 'বিশ্বপরিচয়' ছাড়াও, মধ্যবয়সে তাঁর অনূদিত-সংকলিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা 'প্রসঙ্গ কথা'য় (প্রবাসীতে প্রকাশিত), পরযুগে কৃষিপরীক্ষায় ও উদ্ভিদ-বৃক্ষ-পরিচর্যায়, শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠায় ও সম্প্রসারণে ; এহেন সর্বত্র মাত্রাতিক্রম না করে বিজ্ঞানচেতনা ও যন্ত্রবিদ্যায় তাঁর যুক্তিবুদ্ধিসম্মত কার্যকর ভূমিকাস্বীকারের স্পষ্ট বিচক্ষণতা তাই লক্ষণীয়।

সচরাচর কবিকে বড়ো জোর ছন্দ সম্পর্কে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু হতে দেখা যায়, সাহিত্যের ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে নয়। রবীন্দ্রনাথ 'বালকে'র যুগ থেকেই সেদিকে আগ্রহী ও উৎসাহী কর্মী। 'মেঘনাদবধ'কে তার কাব্যসৌন্দর্য চূর্ণিত করে ব্যাকরণশিক্ষার্থীর অভিনিবেশপ্রার্থী হতে হয়েছে, এমনি আরো কত অঘটন নিয়তই ঘটে, প্রাত্যহিক জীবনে সেই প্রয়োজনে যথার্থ কাজে লাগার মত যথাযথ কাজ রবীন্দ্রনাথ তাই আকৈশোর সাধিত করেছেন, যার চরম ফললাভ 'শব্দতত্ত্বে'র সরস ব্যাকরণে, 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে'র পাণ্ডিত্য-বর্জিত ভাষা-ইতিবৃত্তে, 'ছন্দে'র

কবিজনোচিত কলাবিধিভাষ্যে। তাঁর এ-জাতীয় রচনাপ্রসংগে আমাদের একজন অগ্রগণ্য ভাষাতাত্ত্বিকের মত বিশেষ অনুধাবনযোগ্য : 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের গবেষণা অনেক বিষয়ে উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নাম চিরদিন বরণীয়।' এখানে এ-প্রয়াস তাঁর আরো উল্লেখযোগ্য এজন্যে যে, দেশের শিক্ষাসংস্কার ও সংগঠনে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও অন্যান্য জরুরি ব্যবস্থাবলম্বন বিষয়ে তাঁর শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলিতে বিশেষত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বারবার চাতকের মতো যে-তৃষ্ণাজল তিনি প্রার্থনা করেছেন, তাঁর সে-প্রার্থনার কতকাংশ তিনি নিজেই পূরণ-সম্পাদন করে গেছেন। অন্তত পক্ষে চরিতার্থতা-সাধনের কষ্টসাধ্য আত্মনিয়োগী প্রথম অধ্যায়। এখানেও তিনি নিদর্শন রেখে গেছেন তাঁর বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগী মাত্র না হয়ে বিরল কর্মযোগীসুলভ নিটুট ন্যায়বিধানের, যা নিজেকেও ছুটি দেয় না, ওজর বা অজুহাত জানে না, মার্জনা করে না।

রবীন্দ্রনাথে চিরকাল যে-দুই শক্তির লীলা চলেছে, কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রাতিগ, পরস্পর-বিরুদ্ধ রচনার সাক্ষ্যে প্রয়োজন নেই, একজাতীয় রচনাতেই তাঁর অনেক প্রমাণ মিলবে। যেমন ডাইরিজাতীয় ও চিঠিপত্র-ধারায় প্রথম যুগের য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে বা ইন্দিরা দেবীকে লিখিত 'ছিন্নপত্রে', মধ্যযুগের ভানুসিংহের পত্রাবলীতেও, যতই ব্যক্তিগত চিঠির অন্তরঙ্গতা মাঝে মাঝে ফুঠে উঠুক, তার সর্বত্র প্রায়ই আপনাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার, ছড়িয়ে দেয়ার একটা ব্যাকুলতা আছে। এবং প্রতিনিয়তই তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন—বৃহত্তর গ্রামনির্ভর সমাজের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তায়, প্রকৃতি-দৃশ্যগন্ধের অবগাহন-সমেত মানুষী সম্পর্কের নানামুখী স্বার্থ-সংঘাতের জটিলতাসন্ধানে, বিশ্ববিধানের বিশাল বৈচিত্র্যগত ঐক্যচেতনায়; ইতস্তত বহির্মুখীনতা অন্তর্জাগরণে সহায়ক হয়েছে, জাগ্রত প্রহরারত অন্তরপ্রদেশ বহির্বিশ্বে আত্মপ্রসার-অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে, ক্বচিৎ উদাসীর বেশে অন্যমনা, প্রায়শই বিষয়ীর সংকল্পে উদ্দেশ্যবাদী। বাঙালি রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ হননি, তখনো তাঁর মধ্যে এই কেন্দ্রাতিগ স্বভাব অগৌণ নয়; আবার যেদিন থেকে বিশ্বচেতনায় তিনি সবিশেষ উদ্বুদ্ধ, কেন্দ্রাভিগতায় উৎসাহ হারিয়ে কেন্দ্রাতিগ মনস্বিতায় মাত্র মুখ্য সুখ খুঁজে ফেরেননি। বিশেষত পরিণত বয়সে বিদেশ-পরিক্রমায় বেরিয়ে ডাইরি ও চিঠিপত্রের স্পষ্ট-অস্পষ্ট নিদর্শনগুলি যথা 'যাত্রী', 'জাপানযাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথে ও পথের প্রান্তে' প্রভৃতির আত্মসমাচার একরকম নগণ্য; কিন্তু বালিদ্বীপের মনোহারী নৃত্য, জাপানের আত্মশক্তিনির্ভর স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্যচেতনা, বলশেভিক রাশিয়ার নব্যতন্ত্রী

শিক্ষাসমাজসংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রয়োগসাফল্য-সমীক্ষায় তিনি সতত পাঠ নিয়েছেন গতি-প্রগতিশীল দেশ ও জাতিগঠনের, উন্নত রুচি ও চরিত্ররচনার, তথা সমাজ ও সভ্যতা-পরিবর্তনের। আত্মপ্রসার ও প্রতিষ্ঠারই সে আরেক মানচিত্র। ছোট ছোট ঢেউবলয় ভেঙে ভেঙে বৃহত্তর মানবসভ্যতার দিগ্বলয় গিয়ে ছুঁয়েছেন। তারপর ফিরে এসে ছোটকে বড়ো করতেই চেয়েছেন, তাকে খাটো ও হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করেননি। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন তাই বৃহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে, মহৎ শিল্পের রচনায় উৎসর্গীত হলেও তাঁর প্রজাবৎসল সমবায়-সচেতন জমিদারের বিচক্ষণ ভূমিকা, বিষয়চিন্তিত সংসার-পরিচালক (মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিপত্র দ্রষ্টব্য) অথবা পুত্র-কন্যা-জামাতার ভবিষ্যৎ-বিচারক পরমাত্মীয়ের (বেলা দেবী-রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে লেখা চিঠিপত্র) স্থিতধী ভঙ্গি তাঁকে কখনোই একেবারে ছেড়ে যায়নি। তিনি সময়-স্বভাবের দাবিমত উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য-বোধকে বিস্তৃত করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে যথোচিত বিতরণ করেছেন। ইতিপূর্বে গ্রন্থিত বা ইতস্তত প্রকাশিত কিন্তু অগ্রন্থিত তাঁর শেষবেলাকার চিঠিপত্র তাঁর এই বিশিষ্ট রূপকেই ধারণ করে আছে। তাদের মূল্য তাই রবীন্দ্রনাথের জীবন-শিল্প-অনুচিন্তার উপায় হিসেবে অসামান্য। এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ছবি আপন হাতে তুলে দিতে তাঁর কার্পণ্য যখন সুবিদিত, এত নিপুণ গদ্যশিল্পী, ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধ সম্পর্কে এমন সজাগ ও বিবেচক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আত্মবিষয়ে গোপনতাপ্রিয়তা তাঁর স্বজীবনমূলক লেখাগুলিতে যেহেতু আলোর চেয়ে আলো-আঁধারই বেশি ঘনিয়েছে, উক্তের চেয়ে অনুক্ত, প্রথম জীবনের সজীব সবিশেষ বর্ণনার পাশে পাশে মধ্য ও শেষ জীবন সম্পর্কে কঠিন ঔদাসীন্য ও নীরবতা, তখন ঐসব চিঠিপত্র ডাইরি বা তজ্জাতীয় ব্যক্তিগত রচনাবলী বিচিত্রোৎসুক রবীন্দ্রনাথকে অন্তরঙ্গভাবে জানার নির্ভরযোগ্যতম দলিল। তবে সেখানেও যুক্তি-ন্যায়বাদী রবীন্দ্রমনীষা তাঁর মৌল স্বধর্মে দৃঢ়স্থিত-প্রতিভাত, তথা যুগপৎ একান্ত-একাগ্র ও অনেকান্ত-নানাগ্রগী।

'জীবনস্মৃতি'-রচনায় রবীন্দ্রনাথ একটি অভূতপূর্ব কবিজীবনী লোকগোচর করলেন। চিরকাল তিনি শুধু কবির জীবনই যাপন করছেন, এই এক অদ্ভুত ধারণা তাঁর ছিল। এবং তাঁর অসংখ্য কবিতায় যে-কবিজীবনী আছে, তার বাইরে আর কোন্ 'বৃত্তান্তে' পাঠকের তাই প্রয়োজন?—এমন মনোভাব-বশতই যখন থেকে তিনি কবিয়ানার জলভাগ ছেড়ে আসল কবিত্বের শক্ত জমিতে এসে পা রেখেছেন, তখন ও সেখানেই ('কড়ি ও কোমল'-'মানসী'র সন্ধিলগ্ন) তার সম্পর্কে, 'জীবনস্মৃতি'তে, যেন পুনরুক্তি করা থেকে বিরত হয়েছেন। এই

সুলিখিত-পরিকল্পিত গ্রন্থটির আনুষঙ্গিক হিসেবে 'ছেলেবেলা' ও 'গল্পসল্প' যেমন পাঠ্য, 'আত্মপরিচয়'ও তেমনি, অথবা ততোধিক। কারণ 'জীবনস্মৃতি'কে ধরে প্রথমোক্ত তিনটিতে তিনি যা বলেছেন তা তাঁর কবি হওয়ার ইতিহাস হতে পারে, ব্যক্তিত্বের উন্মেষ তথা আত্মপ্রকাশের অভিজ্ঞতা-বিবরণীও, কিন্তু 'আত্মমাহাত্ম্যে'র যথার্থ, সম্পূর্ণ উপলব্ধি নয়; যে-জন্যে 'আত্মপরিচয়ে'র নির্যাসিত মর্মজ্ঞতার আত্মস্ত সত্যকথনে পাঠককে অভিনিবেশ করতেই হবে। কবি টেনিসনের বৃহৎ জীবনী পাঠের পর কবি শ্রান্তচিত্তে যে-ভাবপোষণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া থেকে 'জীবনস্মৃতি'-পরিকল্পনার উৎস সম্ভব, কিন্তু তাতে কবিপক্ষে কিছু বিভ্রমের লক্ষণ বর্তমান। তিনি উক্ত গ্রন্থের অধ্যয়নশেষে 'কবিজীবনী' নামে যে-প্রবন্ধটি লেখেন তাতে তার মূল ভাবটি এই : 'কোন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।' তিনি যে-কবি, সে-কবিকে তাঁর জীবনচরিতে খুঁজতে বারণ করছেন, যেহেতু এই উক্তিকাল পর্যন্ত, অথবা হয়তো শেষ দিন পর্যন্ত, তিনি তার কবিপরিচয়ই স্বীকার করে গেছেন, কর্মীপরিচয় নয়। অথচ আমরা জানি তাঁর মধ্যে এ-দুয়ের কী আশ্চর্য সম্পর্কসূত্র ও নিবিড় রাখিবন্ধন রয়েছে। আমরা তাই যতই তাঁর নেপথ্যজীবন সম্পর্কে কৌতূহলী হই, ততই নিরাশ হয়ে ভাবি যে, এ কেমন ধরনের আত্মগোপনপ্রবণতা যা রবীন্দ্রনাথের সংযত শুভ্র জীবনাচরণের দিকে চেয়ে অশেষ কৌতুকপ্রদ, ভিক্টোরীয় শুচিবায়ু-শালীনতাবোধকেও যা হার মানায় এমন আপত্তিজনক, ভিক্টোরীয় যুগের প্রধান কবির উল্লিখিত জীবনী তো বটেই, অন্যলিখিত কবিজীবনী ও স্বয়ং কবিলিখিত জীবনীর অনিবার্য পার্থক্যসীমা মেনেই অবশ্য এ-উক্তি।

যখন তাঁর জীবনব্যাপী বিচিত্রপথগামী উদ্যোগ ও উদ্যমের সমগ্র রূপটা একদৃষ্টে অথবা ভেঙে-ভেঙে নানা চোখে দেখি, বিশেষত যখন তাঁর কৌতুকরসসৃষ্টির সাবলীল চিরপ্রবাহ লক্ষ্য করি, তখন বুঝি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো 'মর্বিডিটি' দূরের কথা, আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় যাকে 'অবসেসন' বলে, তাও প্রায় অনুপস্থিত। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র সাময়িক 'মেলাঙ্কলি' ছাড়া জীবনের অন্য কোনো পর্যায়ে তাঁকে কৌতুকরসবিহীন বিরক্ত বিস্বাদে বা সামান্যতম তিক্ত বিষাদে আবিষ্ট দেখা যায়নি, যত শোকাহত, দুঃখভারাক্রান্ত, বিচ্ছেদব্যাকুল মুহূর্ত তাঁর জীবন ঘিরে বারবার আসাযাওয়া করুক, তিনি চিরকাল সুস্মিত রশ্মি বিকিরণ করে গেছেন, মাঝে মাঝে

মেঘের আসা-যাওয়ায় তার লাবণ্য বেড়েছে মাত্র। মৃদু থেকে তীব্র নানাভাবে নানারূপে উক্ত বিকীর্ণ রশ্মিপ্রকৃতিকে পাওয়া গেছে। কৌতুকবোধ রবীন্দ্রজীবন ও শিল্পরচনায় এমন এক আলোকশিখা যা কখনো অগ্নিকাণ্ড ঘটায় না, কিন্তু প্রয়োজনে অগ্নিসম্ভব স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। নির্মলহাস্যযুক্ত কৌতুক তাঁর শাশ্বত অন্তঃপুরিকা হয়তো, বিদ্রূপ বা কশাঘাতেও তিনি অক্ষম বা অপটু ছিলেন না—এই ক্ষীণ ও ক্ষণ-প্রলয়ঙ্কর রূপ অবশ্য তাঁর সুনিহিত শুভঙ্কর রূপের আরেক দিক, যেন পলি-উর্বরতা বা প্লাবনী বর্ষণোন্মুখ আষাঢ়ী আকাশ, 'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা', সুগন্ধকণ্টক-যুক্ত কেয়ার তুল্য—ব্যঙ্গকৌতুক ও হাস্যকৌতুক সংকলনদু'টি স্পষ্টতই এ-জাতীয় রচনা-সমষ্টি। অন্যান্য শ্রেণীর প্রায় সব রচনায়, বহুসংখ্যক কবিতায়ও, তাঁর এ-ভূমিকাবরণ অবশ্য দর্শণীয়। সেই তাঁর বিশেষ পরিচয় ও বিশাল বৈশিষ্ট্যের অনন্য বিশ্লেষণ তিনি স্বয়ং দিয়েছেন তাঁর 'পঞ্চভূত' রচনার দুই অংশে : 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'য়। 'পঞ্চভূতে'র পঞ্চ উপাদানে সচরাচর-বহির্ভূত আর যে-উপচারই থাক, মূল উপচার সেখানে অনিন্দ্য অপূর্ব শুভ্র সংযত সলাস্য ('স্রোতস্বিনী'ও 'দীপ্তি'র গুণে) কৌতুক : অনেক গভীর কথা কৌতুকছলে কত সহজেই তিনি বলেছেন। অনেক 'সহজ কথা' সহজে বলা যায় না হয়তো, অনেক কঠিন কথা যায়, কঠিন সত্য কথা, যদি তা সহজ কৌতুকাশ্রয়ী হয়। তার প্রমাণ এ-শ্রেণীর রচনায় সুপ্রচুর। যদিচ তিনি পঞ্চভূতের শুরুতে বলেছেন, 'সত্যের কথা রাখিব না, বন্ধুর কথা রাখিব', পরিশেষে দেখা যায় তিনি উভয়ের কথাই রেখেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের চরিত্রও তা-ই ; দুই বিপরীতে এমন কি বহু বিপরীতেও তিনি আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটাতে পারেন। ভূতনাথবাবুর 'পঞ্চভূত'-এর পাঁচটি চরিত্রচিত্রণ তথা বিচিত্র মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে-নিয়ে খণ্ড খণ্ড সত্যসন্ধিৎসায় অখণ্ড সমগ্র-সত্যে ('হোল ট্রুথ') উত্তরণ-উদ্যম প্রবন্ধসাহিত্য-ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব চাষ, প্রয়াস। জীবনের সর্বত্র তিনি যে বিরাট অথচ স্বচ্ছন্দসুঠাম সাফল্য দেখিয়েছেন তার মূলে তাঁর এই কৌতুকদৃষ্টি, কৌতুকরসিকের দূরাবস্থিতি। গদ্যপ্রবন্ধের অনবদ্য রচনার আলোকে তাঁর এ-পরিচয় অমূল্য নজির হয়ে আছে বিশেষত 'পঞ্চভূত' ও 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অনেক রত্নস্বর্ণাক্ষর পাতায়, গরিষ্ঠসংখ্যক অতুলনীয় ভাষণে-ভাষ্যে, ক্বচিৎ আংশিক, প্রায়শ সামগ্রিক।

২

বৈচিত্র্যে ঐক্য-অন্বেষণ রবীন্দ্রনাথের জীবনশিল্পে ও সাধনায় একটি বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য। তিনি তাঁর 'বিচিত্ররূপিণী' কবিতাসুন্দরীর একটি 'বিজন' ঐক্যস্বরূপ

খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁর কথায় যে-পালার নাম : সীমার মধ্যে অসীম সাধনার পালা। কাব্যের শ্লোকে শোক অর্থাৎ করুণাবেগ যেমন রসাত্মকতার মূল, গদ্যশিল্পীর প্রবন্ধবাক্যেও তেমনি 'রিজন' বা ন্যায় হলো শিকড়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যগত সে-ন্যায়কে, (তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে যেমন তিনি নিজেই করেছিলেন) একটি পালানামে সূত্রবদ্ধ করে নেওয়া যায়, তা হলো অসীমের মধ্যে সীমাকে মুক্ত ও সুসংগত করার পালা। রবীন্দ্রনাথে এ-দুই পালা, আলোছায়ার মত, তাঁর বিপুল বিচিত্র ঐশ্বর্যময় জীবনের যেমন অলঙ্কার, তেমন সামঞ্জস্য। রবীন্দ্রনাথ যে অনেক বড়ো তার কারণ তাঁর আয়ুষ্কালে কখনোই, জীবনের কোন অবস্থায়ই, তিনি সীমার বাঁধন মানেননি, ক্ষুদ্র বা সঙ্কীর্ণের সঙ্গে সন্ধি করেননি, মহতের আকর্ষণে নিয়তই মহীয়ান হতে চেয়েছেন, হয়ে উঠেছেন। তাঁর বিবিধতানবিস্তারী গদ্যসাধনার সভাক্ষেত্রে তাঁর সেই মহৎ সংগতিসাধন, বিরল ন্যায়নিষ্ঠা বারবার ফুটে উঠেছে। তা 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নয়, ঝলমল চিত্তেরই ঝলক।

বাংলাদেশে জ'ন্মে পরাধীন ভারতবর্ষের হতভাগ্য নাগরিক হয়ে তাঁকে ব্যবহারিক জীবনের নানা স্বার্থবুদ্ধি-প্রসূত কলরবে কোলাহলে আন্দোলনে জড়িত হতে হয়েছে, তাঁর মন্তব্য মতামত সিদ্ধান্ত পেশ করতে হয়েছে ; জীবনের সবক্ষেত্রে স্থানকালের সীমা তিনি সর্বদাই মেনেছেন, যা না মানলে তাঁর অস্তিত্ব তাঁর কাছেই জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠে ; যেমন দুটি বড়ো দৃষ্টান্ত : কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-প্রচেষ্টার প্রতিবাদে তাঁর খালিপায়ে রাখি-হাতে কলকাতার পথ-পরিক্রমা, সঙ্গে তাঁর সেই কণ্ঠভরা স্বদেশীগানের কল্লোলিত বরাভয় এবং জালিওয়ানালাবাগের সেই মহাদুঃখে-শোকে পরাধীন জাতির মর্মান্তিক অসহায়তার লজ্জা-গ্লানি ছিঁড়ে তাঁর একক ক্ষোভ-ক্রোধের ওজস্বী প্রকাশ মাত্র বিদেশী শাসকের প্রতি বজ্রময় পত্রনিক্ষেপে নয়, তাদের দেওয়া সম্মানের রাজবেশ তাদেরই মুখে ছুঁড়ে দেওয়ার সেই অমিত আত্মপ্রত্যয়ী বলীয়ান বর্জনে-প্রত্যাখ্যানে, নবপর্যায়ী বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলন-সূচনার ঢের প্রাক্কালে তা এমন অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ কীর্তি যে, এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইতিহাসে তাঁর সেই কৃতিত্বের স্থান, নিরপেক্ষ সত্যসন্ধিৎসায়, আর-পাঁচটির মধ্যে একটি মাত্র নয়, প্রথম পথিকৃতেরও নয় শুধু, প্রকৃষ্টতমেরই দৃষ্টান্ত। তখন সেখানে আর কে ছিলেন, আর কে এসেছিলেন ? তাই তিনি সত্যই 'দি গ্রেট সেন্টিনেল'। তবে তিনি কর্মে অধিকারীভেদ জানতেন, মাত্রা মানতেন। তাই একেক সময় এসেছে, যখন তাঁর কিছু-করা বা বলার পালা তিনি সংযত করেছেন অপূর্ব বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে, বিরল নৈপুণ্যে, কোন 'স্তুতি নিন্দার জ্বরে'ই তিনি কাঁপেননি, তাকে টানতে পারেনি চারপাশের হাততালি-উৎসুক মানুষ, তাই ধরতে পারেনি, ভুল বুঝেছে, কটুকাটব্য

করেছে। কিন্তু এটাই ভাগ্যের পরিহাস যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে একটি স্বাধীন দেশ ও জাতির পক্ষে আশ্চর্য এক সৌভাগ্যসূর্যরূপে দেখা দিতে পারতেন, সেখানে পরশাসনে বিচূর্ণ, অনাচারে আভগ্ন, আতিশয্যে অশ্লীল, দুর্ভাগ্যপঙ্কে পতিত মলিন একটি জাতিকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে পথ দেখাতে হয়েছে আর সেপথ আশু-সমস্যা-সমাধানের পথ না হয়ে শাশ্বত পরাভব-মোচনের শপথ হতে চেয়েছে চিরকাল, তাই তা ঘুরে ঘুরে অনেক দূরে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং অত দূর-দুর্গমে অভিলাষ যে-জাতির ললাটে অলেখা, সে-জাতির পক্ষে শীতের সূর্যকে মেঘাচ্ছন্নই মনে হবে ; হয়েছেও। সে-ভ্রান্তির দক্ষিণা রবীন্দ্রনাথকে অকাল-বিসর্জনে অনেকবারই দিতে হয়েছে ; যদিও তিনি আপন কর্তব্যকর্মে চির-অবিচল ও দুঃখী স্বদেশবাসীর প্রতি দানে-দাক্ষিণ্যে অকৃপণ। প্রয়োজনমতো জনতার মধ্যে তাই প্রায়ই তাঁকে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। দাঁড়িয়েছেন। ফিরে গিয়ে ফের নির্জনতায় দেশের কাজ জাতির কাজ ভবিষ্যৎ-বিস্তৃত নিজস্ব সৃষ্টিকর্তৃত্বের কাজ তথা বিশ্বের কাজ ক্রমাগত অবিশ্রাম অশ্রান্ত শ্রমে ও নিষ্ঠায় করে গিয়েছেন—ধীরোদাত্ত বীরোপম জীবনশিল্পীর সে-কাজ। সেই সুস্থ স্বাভাবিক দায়দায়িত্ব-সচেতন কাজের মানুষটি তাঁর বিশিষ্ট সুষ্ঠু ন্যায়বোধ তাঁর বিচিত্ররূপী গন্তব্যাহনে কেমন অব্যর্থ সাফল্যে তুলে ধরেছেন, ইতিপূর্বে তা বলা গেলেও বিষয়টাকে আরেকটু বিশদ করে দেখা যাক। তাঁর সাহিত্যবোধ ও চিন্তার ক্ষেত্রে আত্মোপলব্ধির গুরুত্বের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। মহাকাব্যের নকলনবিশ অতিকায় কাব্যের চিত্তাকর্ষক যুগ চলছিল, নিঃসন্দেহে যুগন্ধর ছিলেন মধুসূদন ; কিন্তু তাঁর অনুকারীরা—প্রধান হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র গুরুর অনুপাতে ছিলেন এতই লঘু যে, তাঁদের ব্যর্থতাও কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে একাধিক দৃষ্টান্ত হয়ে ছিল। তাঁদের হাতে মহাকাব্যের সেহেন তুচ্ছ পরিণতি, কৃত্রিম ফ্যাশন-দুরন্ততা তাঁর কাছে 'মুখশ্রী'র বদলে 'মুখোস' পরার নামান্তর ছিল (তাঁরই সৃষ্ট অমিত রায়-এর মতে 'ফ্যাশনটা হলো মুখোস, স্টাইল মুখশ্রী')—স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযায়ী মহাকাব্যের রূপ-গঠন-পরিকল্পনায়, সামগ্রিক অবয়বে ও আবেদনে যে কঠিন তদ্গতচিত্ততার সীমানির্দেশ আছে, তাকে ছাড়িয়ে যেতে 'মন্ময়' রবীন্দ্রনাথ স্বতঃস্ফূর্তি ও মুক্তির আশ্রয়দাত্রী গীতিকাব্য ও সঙ্গীতরচনার অসীমতাই সেই 'কোন্ সকালে' অমোঘভাবে বেছে নিলেন। এবং ভাবের ক্ষেত্রে যে-দু'টি বিষয়ে তিনি মুখ্যত নিমগ্ন হলেন, সৌন্দর্য ও ভালোবাসা, তাদের তিনি বুঝলেন যথাক্রমে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে অনন্ত-উপলব্ধির পরিচয়ে। আর সমালোচকরূপে সাহিত্য ও সৌন্দর্যতাত্ত্বিক সেই কবিকর্মীদের তিনি হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিলেন যাঁরা

সসীম সান্ত সৌন্দর্যসম্ভোগ উত্তীর্ণ হয়ে অসীম অনন্ত জীবনসাধনায় সুস্থিত হয়েছেন—প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের মধ্যে কালিদাস, মধ্যযুগীয় বাংলার চণ্ডীদাস, তাঁর সমকালীন মাতৃভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল এবং আধুনিক কালের বিবিধ রূপচর্চা ও ভাবতান্ত্রিকতা গভীর ঔৎসুক্যে লক্ষ্য করে যাঁদের মধ্যে জাগতিক জৈব মোহ-বন্ধনের অতিশয় আর্তনাদ বা ভঙ্গিসর্বস্ব শৌখিনতার আস্ফালন দেখলেন, তাঁদের তিনি অস্বীকার করলেন। শেলিঘাতী এলিঅটের 'জার্নি অব্ দ্য ম্যাজাই' অনূদিত করেও তাঁকে অঙ্গীকার করেননি, 'অরিজিনল' বলে তাঁকে তবু যেটুকু স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁর অনুপন্থী-অনুকারীদের, দেশি বা বিদেশি, তিরস্কারই করেছেন। সর্বমোহমুক্তি সৎসাহিত্যে অবশ্যকাম্য ভেবেছেন, তাই অতন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অগণ্য গুণ ভক্তিভরে মেনে নিয়েই তাঁর অত্যন্ত হিন্দুয়ানিকে অগ্রাহ্য করেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাঁর সবল জ্ঞানযোগ প্রশংসনীয় দেখেও, আনুষঙ্গিক দেবচরিত্র-নির্মাণের থিওরিপ্রবণতাকে 'উচ্চসাহিত্যের লক্ষণভ্রষ্ট' বলেছেন। ধর্ম, শাস্ত্র, মতবাদ, আইডিয়া-সর্বস্বতা বা নীতির অতিরঞ্জন—সব নিগড়কেই তিনি সাহিত্যের হিতে পরিহার্য মনে করেছেন; দুর্বলের চেয়ে প্রবলের অপর-অনুরক্ত পদানুসরণকে সবিশেষ অবাঞ্ছনীয় বলে, প্রমত্ত-শক্তিমানের আত্যন্তিকতা বা অনিরপেক্ষতাকে স্খলন ও মোহান্ধের স্পর্ধা জেনে সমধিক নিন্দা করেছেন; নিখিল মানব-মনোমুক্তির শাশ্বত ঐতিহ্যকে বরণীয় মনে করে সেই একই কার্য-কারণে নিবেদিত সব সার্থক সাহিত্যপ্রয়াসের উত্তরাধিকারকে স্বাগত জানিয়েছেন; কিন্তু সেজন্য যে-কোন মনোহারী আংশিকতাদুষ্ট অপপ্রচারকেই আত্মখণ্ডন বলে ঘোষণায় কার্পণ্য বা ইতস্তত দেখাননি।

এই দ্বিধাকুণ্ঠাহীন অভিমতজ্ঞাপন শুধু সাহিত্যবিচারে নয়, শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস-চর্চায়ও তিনি সারাজীবন বিকীর্ণ করে গেছেন। বাংলা বা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বন্ধনে জন্মসূত্রে ধরা পড়েছেন বলেই যেমন তিনি নিছক বাঙালি বা ভারতীয় নন, ততোধিক অন্য-কিছু, তিনি বিশ্ব-নাগরিক; তেমনি ইংরেজি তথা য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি যত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই থাক, তথাগত যে-কোনো নীতিহীনতা ও অত্যাচারকে তিনি বারবার শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণে তীব্র সমালোচনায় প্রত্যাঘাত করেছেন, কোনো আপোষরফায় সহজ ও নিরাপদ মীমাংসা খোঁজেননি। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণচিন্তায় সমধিক সোৎসুক, তাই দুই বিপরীত মেরুর সুনিরূপণ ও সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন সেই কোন্ পূর্বাহ্নে, শাসকের দুর্বিনীত শক্তির মদমত্ততা ও আস্ফালন একদিকে, শাসিতের দুঃসহ অসহায়তা অন্যদিকে ('ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি এজন্য বারবার লক্ষণীয়)।

অথচ ভাবাতিশয্যে কোনো পক্ষকেই বিকৃত করেননি : এ-প্রসঙ্গে পরিণততর চিন্তায় 'কালান্তরে'-'সভ্যতার সংকটে' চূড়ান্তভাবে তাঁর দুর্লভ দূরদৃষ্টি ও ন্যায়বিচারের রঞ্জনরশ্মিপাত ঘটিয়েছেন—আমূল সমস্যার উন্মোচনে, সামগ্রিক অব্যবস্থায় ধীরস্থির ধিক্কারে। এখানেও স্থানকালাবদ্ধ সসীম স্বদেশহিতকে অসীম নিখিলমঙ্গলে সামঞ্জস্যযুক্ত, সঙ্গত ক'রে দেখে মোহমুক্ত মননের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। সমাজ-বিশৃঙ্খলা ও ধর্মাধর্মবোধের অস্থিরচিত্ততায় একই নিরপেক্ষ পরীক্ষার আলো ফেলে তাঁর স্বাস্থ্যবান রুচির শুচিতা তিনি সর্বপ্রযত্নে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বৃহত্তর মানবজন্ম-উল্লাসের প্রশস্তি করেছেন, সঙ্কীর্ণ জাতিধর্ম-অসূয়াবুদ্ধিকে সর্বনাশা ব'লে পরিহার করেছেন। এমনকি স্বয়ং ব্রাহ্মধর্মের আবহাওয়ায় বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে নিজেকে আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত মহত্তর হিন্দুধর্মের অন্তর্গত ব'লে ঘোষণা করেছেন, যার রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যানে শাশ্বত মানবধর্মেরই প্রতিষ্ঠা : 'হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদীঅরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাত-পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা ধরিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।' এই আকাশলগ্ন ধর্মের ছায়া যে-ইতিহাস-সমুদ্রে পড়েছে, সে ভারত-সমুদ্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-ভারত মধ্যযুগের রাজস্থান বা মহারাষ্ট্র-ইতিবৃত্তেই শুধু ধৃত আছে ব'লে যাঁরা ভাবেন, রবীন্দ্রনাথের বসবাস তাঁদের থেকে বহুদূরে। কাজেই ঢের উঁচু থেকে, অনেক উঁচু করে স্বদেশকে স্বধর্মকে স্বদেশের ইতিহাসকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তাঁর ভারতবর্ষ 'ভারততীর্থ', যেখানে বাইরের বৃহৎ পৃথিবীর সবাই এসে 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে' এবং তাঁর 'বিশ্বভারতী' 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্', তাই শান্তিনিকেতন সত্যসত্যই 'সব-পেয়েছির দেশ'। আর এই ঐক্য-ঐকান্তিক ভারতবর্ষের উপযুক্ত বেসরকারি রাষ্ট্রদূত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন বয়সে ও পর্যায়ে যে-দেশেই শুভেচ্ছা-সফরে গিয়ে থাকুন, সে-দেশের ঐতিহ্য, গতিপ্রকৃতি, প্রবণতা, রুচি, ধর্মকর্মদর্শন, জীবনযাত্রার ভঙ্গি শেষ পর্যন্ত যা-ই হয়ে থাকুক, তাদের 'তীর্থ' মনে করতে তার একটুও বাধে নি, মার্ক্স-লেনিনের ভাব-কর্মোজ্জ্বল সোভিয়েট রাশিয়াকেও তাই ; কেননা বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিক উপায়ে মানব-মহাযজ্ঞের পরমতম উপার্জন সেখানে তিনি সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে তাঁর স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের সে-পর্যন্ত সাফল্য-দৃষ্টান্তে সার্থকতায় চরিতার্থ হয়েছেন (দ্র° 'রাশিয়ার চিঠি,' 'সভ্যতার সঙ্কট' এবং এ-গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ)। বস্তুপুঞ্জের কটাক্ষে নয়,

মানবকল্যাণের করস্পর্শেই বারবার তিনি দেশসীমার বাইরে বৃহৎ বিশ্বের দশ দিগন্তে ধেয়ে গিয়েছেন সহৃদয় সৌহৃদ্যে, সপ্তসিন্ধু পারাপার করেছেন অসুস্থতা ও বার্ধক্যের উপেক্ষায়, তাঁর চিঠিপত্র ডাইরিতে সেসব বিষয়াশ্রয় এক বিপুল বিরল নজির হয়ে আছে।

আপনি আচরি' ধর্ম অপরে বুঝাও—চৈতন্যদেবের পর এই ব্রতচারী ধার্মিকতা রবীন্দ্রনাথে সবিশেষ সফল হয়েছে, যে-ধর্মদার্শনিকতা তাঁর মধ্যে এক অপরূপ আধ্যাত্মিকতার রূপেগুণে বিশিষ্ট। তাই দেখি 'আত্মপরিচয়ে' তাঁর যে-আত্মোপলব্ধি (সত্যই তা এক আশ্চর্য 'আত্মমাহাত্ম্যের মণিহার') ঘনীভূত, 'মানুষের ধর্মে' তারই বিশদ বিচ্ছুরণ বহুব্যাপী—স্বয়ং দীক্ষিত ও পরীক্ষিত না হয়ে কোনো ধর্মশিক্ষাই তাঁর স্ব-অনুশাসনে সাড়া জাগায়নি ; আর উপনিষদ ও কালিদাসের কল্যাণী মর্মবাণী, বৈষ্ণবমহাজনদের ঝঙ্কৃত গূঢ়ানুরাগ, সর্বোপরি লোকপ্রিয় মধ্যযুগীয় মরমিয়া সাধকদের অনুপ্রাণিত বাঙলার নিজস্ব বাউল মিলেমিশে তার সুমার্জিত চেতনাদর্পণে প্রতিফলিত নির্মল আলোক—যা 'রূপসাগরে ডুব' দিয়েই 'অরূপরতনে'র সন্ধান দেয়, ধ্যান জাগায়। লোকাচারের অনর্থসীমা চূর্ণ করে পরমার্থের সেই অসীম সাধনায় সুন্দর-ভয়ঙ্কর ও জীবন-মরণ সম্মিলিত, প্রসন্ন সঙ্গমে সহাবস্থিত, যেন 'অর্ধনারীশ্বর'। মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েই অমৃতের স্পর্শ প্রাপ্য, দুঃখতাপের দারুণ দাবদাহে 'বন্ধু'র অন্তরঙ্গ সঙ্গ ও সান্নিধ্য, যেন গ্রীষ্মের বর্ষণ। তাই মর্ত্যকে অতিক্রম না ক'রে মর্ত্যসুষমাতেই স্বর্গলাবণ্য, মানবলীলার সুস্মিত শৈশবেই 'নন্দনের সংবাদ' তিনি অবলীলাক্রমে পেয়েছেন, দিয়েছেন। স্বয়ং যেখানে উপনীত সেও যেন আরেক শৈশব, প্রজ্ঞাবানের 'অমল' শৈশব, তাই বসুধার 'সুধা'-বিজড়িত, মহত্তর। তাঁর ধর্ম শাস্ত্রীর নয়, 'সান্ত্রী'র, জীবনবাদী কবি-কর্মীর, সীমাবন্দী মুক্তি-ইচ্ছুক মানুষের—'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী'কে যিনি জীবনের বাঁকে বাঁকে খুঁজতে চেয়েছেন, পেয়েছেন সৌন্দর্যতৃষ্ণায়, প্রেমে, ইন্দ্রিয়জ অনুভবে, অবশেষে ফুলের অন্তঃসার সুগন্ধের মতো অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির আত্মমগ্নতায় ; হয়ে গেছেন কস্তুরীমৃগের 'আপনগন্ধ'-আবিষ্কারের আবেগ, আবেশ। ফলে ইহলোক-রূপতন্ময় আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার এমন সব আশ্চর্য সুন্দর রচনা সম্ভব হয়েছে, যা কাব্যক্ষেত্রে যেমন গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিপর্ব এবং তৎপূর্ব 'নৈবেদ্য' (যা শোকাতুরা রমণী ও জননীর শান্তিকামনাতৃপ্তির পরমাশ্রয় রূপে একটিই নয়, একাধিক স্বদেশিবিদেশি স্মৃতি-শ্রুতি ঘটনায় সমর্থিত), গদ্যক্ষেত্রে তেমনি 'শান্তিনিকেতন'-ধৃত ভাষণ ও ভাষণধর্মী অপূর্ব প্রবন্ধগুলি—এদের সঙ্গে তুলনীয় সামগ্রী বিশ্বসাহিত্যে বিরল ; কেননা এখানকার অনুভবে আন্তরিকতা, উপলব্ধি-বিকিরণে সততা হলো সেই স্বতঃস্ফূর্ত গুণ ও নৈপুণ্য, যা অন্যত্রদুর্লভ ; আর এসবের রাবীন্দ্রিক সমাহার এমনই

লবণময়, লাবণ্যমণ্ডিত, যা নইলে সমস্তই শুষ্ক সমাচার, বিস্বাদ ব্যঞ্জন। সর্বোপরি তিনি, তাঁর এজাতীয় গদ্যরচনাগুলিতে শুধু বন্ধু ও প্রিয়ের 'বাণী' নন, প্রাণবন্ত প্রসারিত করচাপ, ঘনিষ্ঠ স্পর্শ।

আধ্যাত্মিক সমুন্নতি ও সার্বিক সার্থকতা লাভ করতে ব্যবহারিক জীবনে আধুনিক মানুষের মানসিক উৎকর্ষ যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক, সেই প্রয়োজন লক্ষ্য ক'রে ইহলৌকিক জ্ঞানার্জনে কৃতকার্যতা তাঁর বিপুল বিশ্বচেতনার প্রধান অন্বিষ্ট ছিল। সেজন্য তাঁর দেশকালোচিত ভবিষ্যদর্শী ভাবনা ও উদ্যোগ ছিল নানামুখী, পরিশ্রম ও প্রয়োগ একজন পরাক্রান্ত কর্মীপুরুষের সমান। তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তা ও বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা তাই অত্যন্ত মৌলিক, অগতানুগতিক। সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের আনুকূল্যে ও স্বভাবপ্রবণতার কার্যকারী উদ্যমে তথা তদনুযায়ী পরিকল্পিত কর্মসূচী-প্রণয়নে তিনি চিরাগ্রহী, অগ্রণী ছিলেন। এমন শিক্ষাব্যবস্থার তাই তিনি চিরবিরোধী, যার দৌরাত্ম্যে মানুষের চিত্ত খর্ব হয়, দৃষ্টি সীমিত, পৃষ্ঠদেশ ন্যুব্জ, কল্পনাশক্তি অকর্মণ্য। সেজন্য প্রাথমিক থেকে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষাকেই একমাত্র বা প্রধান বাহন করে তুলতে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা নয় শুধু, প্রচেষ্টাও ছিল অনির্বাণ। তিনি এমন শিক্ষা চেয়েছিলেন যার প্রভাবে মানুষের ঘর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পীড়নকারী ব্যবধান দূর হবে, উভয়ের মধ্যে শুধু যান্ত্রিক যাতায়াত-সম্পর্ক নয়, মনের স্বচ্ছন্দ সাবলীল সংযোগ-সম্বন্ধই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পাবে। এমন বিজ্ঞানচর্চারও তিনি বিরোধী যা মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর, বিভীষিকাময়, তিক্ততা ও বিরক্তিজনক। তাঁর সাধ্যমতো তাই তিনি সহজসুন্দর বৈজ্ঞানিক 'বিশ্বপরিচয়' লিখে যেমন বিস্মিত করেছিলেন, তেমনি ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ব্যাকরণকেও সরল সরস করেছিলেন, সহজপাঠ থেকে উচ্চপর্যায়ের 'লোকশিক্ষা'-চর্চার বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনইতিহাসের গ্রন্থপ্রণয়নে মাতৃভাষার দৃঢ়ভিত্তি শিলান্যাসে সযত্ন ও সচেষ্ট হয়েছিলেন, 'বাসভূমি'কে যথার্থ 'মাতৃভূমি' করে তুলতে স্বদেশের সারস্বতসমাজকে সংহত উদ্দেশ্যসাধনায় একত্র করেছিলেন. তিনি স্বয়ং সেখানে সদৃষ্টান্ত প্রথম-উপস্থিত। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বভাব-স্বাচ্ছন্দ্য যুক্ত করে বিজ্ঞানের আপাত-বিবিক্তি তিনি সরিয়ে দিয়েছেন, ছন্দ-শাস্ত্রকেও শাস্ত্রীয়তার দূরত্ব পরিহার করিয়ে আনন্দের ভোজে পাংক্তেয় করেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কত মনোহারী, যেন প্রাণস্পর্শী। শুষ্ক বুদ্ধিচর্চাকে তিনি হৃদয়ের নিকটাত্মীয় করেছেন, পড়ুয়ার সত্যকার বান্ধব হয়েছেন। কেননা তিনি জানতেন, বিতর্কের সামগ্রীকে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রিয় করে তুললেই সে-সম্পর্কে জড়ত্ব কেটে যায়, ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ বাড়ে, আগ্রহ বড় হয়ে ওঠে। এই প্রাকটিক্যাল বা

প্রায়োগিক কাজেও তিনি কনভেনশনের সীমা ছাড়িয়ে কনসায়েন্সের অসীমে পৌঁছেছেন।

স্বধর্মের বিষয়ে মূল বক্তব্যে তাঁর গদ্যরচনার আদত পালাটারই যেন সন্ধান মেলে, যা আমাদের অন্বিষ্ট। তিনি লিখেছিলেন : 'আমার স্বধর্ম কী তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়।' এবং তাঁর 'আত্মপরিচয়ে'র সারকথায় যেন আমাদের এ-যাবৎ বক্তব্য-বিশ্লেষণেরই মর্মটি পাই : 'আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে-সাধনা হচ্ছে আবরণমোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।' আমরা যে দেখেছি, তাঁর সাধনা কাব্যের ক্ষেত্রে সীমায় অসীমের আবাহন এবং প্রবন্ধ-গদ্যচর্চায় অসীমে সীমার বিসর্জন—এ-দুইই তাঁর ঐ আবরণ-মোচন-সাধনার রূপান্তর, নামান্তর। যেখানেই আবরণ-মোচনের পালা, সেখানেই অন্তর্দর্শন, অবগাহন ও 'অসীমধন' খোঁজার আয়োজন। সেখানে কাছে থেকে দেখায় ছোট করে দেখার, ভুল দেখার ও বোঝার আশঙ্কা; তাই 'দূরে রাখবার সাধনা'ও পরিণামে দ্রষ্টার নিত্যসত্য আমিত্বকে দৈনন্দিন তথাগত 'আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা'। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু শুধু কবি নন, তিনি প্রগাঢ় জীবনশিল্পী, আর সে-পরিচয় তাঁর আদ্যন্তে চ মধ্যে চ বিকীর্ণ—তাঁর বিচিত্র গদ্যরচনায়ও সে-চারিত্রের মনস্বী রশ্মি বিচ্ছুরিত; সর্বাধিক তাঁর আত্মজীবনমূলক রচনায়। এখানে যে তিনি তাঁর প্রাত্যহিক ব্যক্তি-আমিকে নির্মম পরিহার করেছেন, অন্তত বিস্তারিত বর্ণনায় আনেননি, তার মূলে তাঁর ঐ আভ্যন্তরীণ সাধনার সঙ্কেত, জীবনের কোনো বাইরের ঘটনা বা তথ্যে যা ধরা পড়ে না বলে তাঁর ধারণা। তাছাড়া 'নিজেকে দূরে রাখবার' গূঢ় প্রয়োজনে ভিতরের সাধনায় তিনি এতই নিবিষ্ট ও মহৎ ছিলেন যে, বাইরের কোনো বড় ঘটনাই তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারত না। 'জীবনস্মৃতি'তে তাই তিনি বাহ্যজীবনের কোনো বৃহৎ ঘটনা বা বিষয়কেই আমল দেননি, আন্তরিক প্রবণতা ও অভীপ্সার একটা বাঞ্ছিত বাঁকফেরায় এসে থেমে গিয়েছেন এবং সেই বাঁক নিতে শৈশব-কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যেসব অভিজ্ঞতার কমবেশি ভূমিকা ছিল, তার মন্ত্রসংহত বর্ণনাতেই জীবনস্মৃতির মতো ব্যক্তিগত মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত করেছেন। 'ছেলেবেলা'-সমেত তাঁর সমস্ত আত্মপ্রসঙ্গকথায় ব্যক্তিগত মূল্যবিচার তাঁর এতই অনন্য যে, আমরা যাকে গৌণ বলি তাকে তিনি মুখ্য করেছেন, আমাদের মুখ্যকে গৌণ, তথাকথিত সামান্য হয়েছে অসাধারণ, অসামান্য সাধারণ। আর যে-ব্যক্তি এত চেনা ও

জানা, অথচ তার ব্যাখ্যা-বিচারে বসে প্রায় নৈর্ব্যক্তিক বিবরণী মাত্র পেশ করা, এমনকি সেসব বর্ণনাও নয়, ভারি অদ্ভুত মনে হয়! বিশেষত তাঁর পক্ষে, যিনি খুবই জানতেন যে, তাঁর জীবনকথায় অজস্র আলোচ্য আছে, সহস্র প্রকাশ্য। কিন্তু বিশালবিচিত্র জীবনশিল্পচর্চার অন্যত্র যেভাবে ও যতভাবেই তিনি তাদের প্রকারান্তর প্রকাশ ঘটিয়ে থাকুন, গদ্যভাষী আত্মকথায় তিনি নিজের বিষয়ে একরকম চুপচাপ কাটিয়ে গেলেন, নির্লিপ্ত-নির্বিকার। আত্মচরিত্রচিত্রণেও তিনি নিজসীমা অতিক্রম করে গেছেন, স্বদেশ স্বকাল সবকিছুকে; যেখানে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন সেখানে কোনো অনিত্য ও অস্থায়ীর প্রবেশ নিষিদ্ধ, চিরপ্রকৃতি-চিরমানুষ-চিরসুন্দরের সেই আশ্চর্য জগৎ, যা একমাত্র 'ডাকঘরে'র অমলের বিশ্বতুল্য, সেখানে জলজ্যান্ত মূল-ব্যক্তির নড়াচড়া ক্রিয়াকলাপের নাটকীয় বিস্তারগত সাড়া না পাই, হ'য়ে-ওঠা-হ'তে-থাকা ব্যক্তিত্বের সনেট-সংহত প্রাণবন্ত ইসারাটি পাই।

৩

রবীন্দ্রনাথের ন্যায়ানুগত্য ও যৌক্তিকতা যেমন বিশিষ্ট, তাঁর বিন্যাসদক্ষতা ও গদ্যশিল্পশৈলী তেমনি বিচিত্র, অনন্য। প্রাণসত্ত্বের গঠনে-পরিণামে যেমন হেরিডিটি ও ইনডিভিডুয়ালিটি, মনোবিকাশ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তেমনি হেরিটেজ ও পার্সোনালিটি (এলিঅট একেই ট্রাডিশন ও ইনডিভিডুয়াল ট্যালেণ্ট বলেছেন); আর এ-দুয়ের ঐক্যসমন্বিত রবীন্দ্রগদ্যের একটি শিল্পশৈলীগত মীমাংসাই এখন আমাদের লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে দেখি, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও মানবজিজ্ঞাসা যেমন তাঁর 'হিরো' বা অধিনায়ক রামমোহনের মনুষ্যকল্যাণকর্মী উদারনৈতিক ঐক্যধর্মে শিকড় পেয়েছে, তাঁর সাহিত্যিক গদ্য-রূপরীতি তেমনি সেকালের প্রধান ও প্রকৃষ্ট 'আদর্শ' বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধবিচিত্র প্রকাশদক্ষতায় প্রাথমিক আস্থা খুঁজেছে। নিজস্ব বিকাশের পথে যেতে-যেতে তিনি চিন্তায়-চেতনায় যেমন, শৈলীতেও তেমনি, সেকালীন নবজাগ্রত বাংলায় রামমোহনের বনিয়াদী গ্রানিট স্তর, বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের ভারসাম্যশিল্পসন্ধানী মাধ্যমিক পলি-পর্যায়, দেবেন্দ্রনাথের উন্নত ভাবোল্লাস ও সংযম-সৌষম্য, সবিশেষ বঙ্কিমের উর্বর প্রাচুর্য গভীর আত্মপ্রত্যয়ে অঙ্গীকার ও অতিক্রম করে এসেছেন। এমনকি তাঁর প্রথমদিককার গদ্যপ্রয়াসে উনিশ-শতকী নক্সাসাহিত্যের ভাষাভঙ্গিও গৃহীত, ব্যবহৃত। যেমন; 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' যখন তিনি লেখেন: 'আমি যে ঘরে বোসতেম সে ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত কচ্চে। আমি একপাশে বসে লিখচি, দাদা এক পাশে একখানা বই হাতে করে ঢুলচেন', তখন বাক্যগঠনে, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, বানান ও উচ্চারণ-

সমেত, পূর্বোক্ত নক্সাসাহিত্যরীতির দেখা পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়। এ-ধরন তখনকার কলকাতার শিষ্ট কথ্যরীতি, সুতরাং তাঁর 'চলিত' লেখার প্রথম প্রচেষ্টায় একরকম অপরিহার্য ; তাছাড়া এ-ভাষণভঙ্গি ভবিষ্যতেও রবীন্দ্রনাথকে একেবারে ছেড়ে যায়নি, মাঝেমাঝেই দেখা গেছে (যেমন 'পুনশ্চ'র ভূমিকা, 'সভ্যতার সঙ্কট' ২য়-৩য় অনুচ্ছেদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) ; তবে আশ্চর্য এই যে, প্রথমবারেই তিনি এ-কায়দায় মার্জিততর সর্বতোভব্য সুঠাম সৌষ্ঠবে পৌঁছে গিয়েছেন, যার কোনো পূর্ব-নিদর্শন তখন ছিল না এবং পরেও 'সবুজপত্র'-প্রাক্কালে আর হয়নি, এমনকি তিনি নিজেও এই 'চলিত'-চালে সেই 'সবুজপত্র'-সমকালীন রচনাবলীর আগে আর হাজির হননি ! অথচ মুখের ভাষার নির্দিষ্ট নিশ্চিত একটি অস্খলিত লেখ্য রীতি সেই উত্তরকৈশোরেই রবীন্দ্রনাথ বেঁধে ফেলেছিলেন, যা প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নদের হাতে আদৌ অসাধিত ও অসম্পন্ন ; তাঁরা সাধু-চলিতের বর্ণ-সংকর বা গুরুচণ্ডালীতে সমাচ্ছন্ন ছিলেন। অতঃপর সে-সময়ের অবশ্যম্ভাবী সম্মোহন নয় শুধু, অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্রেই তিনি অভিনিবিষ্ট হন—কাব্যের তুলনায় গদ্যে তিনি ঈষৎ ধীরেস্থিরে এগিয়েছেন—তবে 'বঙ্কিম' তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যের মতো সুস্থিত কিন্তু প্রচ্ছন্নই ছিল, রাবীন্দ্রিক সৃজনশীলতা তথা স্বাতন্ত্র্যসন্ধানকে একটুও আড়াল করতে পারেনি। সুলিখিত সাধু রীতির গদ্যে তখন বঙ্কিম ছাড়া সাধারণভাবে কোনো উপায় ছিল না ; কিন্তু বহুবলশালী পারিবারিক প্রভাব, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথের অনুচ্চার স্বকীয়তার সৌষম্য-সৌন্দর্য-প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের নীতিরীতিকে স্বতন্ত্র-উজ্জ্বল সাফল্যলাভে খুব সহায়ক হয়েছিল—বঙ্কিমের থেকে তিনি প্রগতিশীল ছিলেন, তৎপ্রচলিত বাক্যনির্মিতির চালচলনকে তাই তিনি গ্রহণ করেও ঢেলে সেজেছেন, অনেক অন্তরঙ্গ করেছেন, বাঁকানোচোরানো ; কিঞ্চিৎ শিথিল অথচ সবলস্বচ্ছন্দ, প্রবাহধর্মী ; অলঙ্কৃত কিন্তু ভারগ্রস্ত নয় ; রেখায়ত তটস্থতা নয়, গোলায়ত চঞ্চলতা, বেগ ; কিছুটা দূরান্বয়ী, কিন্তু সাবলীল, প্রাঞ্জল ; ঘোরালো, অথচ ঘোলাটে নয় ; দীর্ঘবন্ধ, কিন্তু প্রবহই গদ্যছন্দময় (মূলত কবির লেখা গদ্য, তবু তাঁর প্রসঙ্গ-প্রয়োজনায় কবিত্ব থাকলেও কবিয়ানা নেই—যদিও তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে উপমাও যুক্তি), স্বতঃস্ফূর্ত, গতিশীল ; ভাবাবেগপূর্ণ, কিন্তু ভাবাতি-শয্যহীন।

সমসাময়িকদের বিচারে বঙ্কিম যখন তাঁদের অন্তঃসার তথা তাঁর মর্মজ্ঞতা নিবেদন করেন এভাবে :

"মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—

জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালীর অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না।”

কিংবা সেই বহুবিশ্রুত আহ্বান-আমন্ত্রণ-ঘোষণাধর্মী অভিপ্রায়-বাণী :

“ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল। সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লিখ ‘শ্রীমধুসূদন’।”

তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও লিখনরীতিকে বিষয়মুখী বা অবজেক্টিভ না ব'লে উপায় নেই। তাঁর মতো প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট উচ্চারণ, অথচ তাঁর নিজের থেকেও বক্তব্যবিষয়ে বা অপরের দিকেই তাঁর মনোযোগ এখানে মুখ্য আকর্ষণ, মূল প্রভাব বা শক্তি। উভয়ত্র অবস্থানুযায়ী বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা ও অভিলষিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞাতব্যই প্রাধান্য বিস্তার করে—বিজ্ঞাতা বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং, অথচ জ্ঞেয় তথা অনুষ্ঠেয়ই পাঠককে টানে, হানা দেয়।

পাশাপাশি অনুরূপ সমকালিকদের বিচারে রবীন্দ্রনাথকে এর মেরু-বিপরীত মনে হয়। যেমন, যথাক্রমে তাঁর ‘বিহারীলাল’ বা স্বয়ং ‘বঙ্কিমচন্দ্র’-প্রসঙ্গ (আধুনিক সাহিত্য) :

“সে-প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে-সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।”

“একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল ; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে তাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গে কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।”

উভয়ত্র ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভালোলাগা সবেগে ও সানন্দে প্রকাশিত। বিষয়ের যা জোর, তার চেয়েও বিষয়কে ঘিরে একান্ত মন-মর্মর এখানে প্রবল। উপমায়-উৎপ্রেক্ষায় এমন কি অতিশয়োক্তিতেও অবিচলিত এই সাবজেক্টিভ রীতিই রাবীন্দ্রিক। ভাবনা যা-ই হোক, স্বানুভবের সঞ্চারশক্তি এখানে

অনুরক্ত-ভাবগ্রাহী সমালোচকের সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধাবোধকে সমধিক মর্যাদাবান করে তোলে—বঙ্কিমী বাক্যের সংক্ষিপ্ত সংহত বিষয়নিষ্ঠা নয়, দীর্ঘবন্ধ রাবীন্দ্রিক ভূষিত-ভাষণের ব্যক্তিত্বই এখানকার অগ্রগণ্য সামগ্রী। বহু বিশেষণ-ব্যবহারে, উজ্জ্বল অলঙ্করণে ব্যক্তিগত আলোক-সন্নিপাতই যেন বিশেষ দ্রষ্টব্য ; প্রতিতুলনায় বুঝি বঙ্কিম যা সঙ্কেতে বিকীর্ণ ও যথেষ্ট মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ তা বিস্তারে যথেচ্ছ-আলোড়িত করে তুলতে চান। বক্তব্যের চেয়ে বক্তাই প্রধান হয়ে ওঠেন। ফলত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যবিচারে কেন, সর্বত্রই বিষয়তন্ময়, বস্তুনিষ্ঠ ; আর রবীন্দ্রনাথ ভাববিমুগ্ধ, আত্মপ্রকাশপ্রবণ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের ভবভূতি-বিচার ও রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-মূল্যায়ন আমাদের এই বক্তব্যে আরো সমর্থন। কালিদাস-শেক্সপীয়র তুলনাত্মক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শকুন্তলা, মিরাণ্ডা ও ডেসডিমনা এবং রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা-টেম্পেস্ট (শকুন্তলা) তৌল-প্রবন্ধটি এদিক থেকে বারংবার পাশাপাশি পাঠ্য, স্মরণীয়। কেবল কালিদাসের নয়, সব আলোচিত কবি বা নাট্যকারের বা কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকের—সাহিত্যসত্যের, সৌন্দর্যতত্ত্বের তিনি তল খুঁজেছেন, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, মর্ম উদ্ধার করেছেন নিজের আগ্রহ-উৎসাহকেই দ্বিগুণ করে তুলবার জন্য—শিল্পরূপ-বিচারের চেয়ে সমগ্রসৃষ্টির লাবণ্যস্বরূপটিকেই যেন চিনিয়ে দিতে নয়, চিনে নিতে চেয়েছেন—চিহ্নিত করেননি, চিন্তিত করেছেন। তাই তাঁর গদ্যশৈলী বঙ্কিমের মতো প্রত্যক্ষ নয়, প্রচ্ছন্ন ; ঋজু কাঠামোর নয়, নম্য স্বভাবের। বক্তব্য বা ভাষ্য-সমেত বলার উচ্চারণও তাই যেন শ্রাব্য, গুঞ্জনগত সম্প্রসার ; দৃশ্যধরনের সম্প্রচার নয় ; যেন লিরিক, ড্রামাটিক নয়।

তাঁর আত্মোপলব্ধির আনন্দসত্যসমৃদ্ধ 'ধর্ম'-গ্রন্থের এই অংশ যদি ঘনিষ্ঠভাবে দেখি—বঙ্কিমের বিষয়সতর্ক জ্ঞানগর্ভ 'ধর্মতত্ত্বে'র তুলনায় এই অনুভবমূলকতা যে কত বেশি আন্তরিক ও একান্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাও অচিরে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে :

"আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কতলোকের কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।"

এখানে এই মাত্র একটি বাক্যে (তৃতীয়) পাঁচবার 'কত' শব্দটির প্রয়োগসমেত বিশেষণকীর্ণ আধিক্যপ্রবণ ভাবের বিস্তারী প্রবাহ রবীন্দ্রনাথের একেবারে নিজস্ব। কোনো ভাব বা চিন্তার উত্তুঙ্গতা, গভীরতা ও দুরূহতাকে তিনি এমন শব্দ-পুনরাবৃত্তি-

প্রবৃত্ত 'চলোর্মি-আঘাতে'ই উদ্বেল ক'রে তুলতেন; পক্ষান্তরে বঙ্কিম অনেকটা 'যাদঃপতি রোধঃ'-তটস্থতা। যে-কোনো প্রসঙ্গেই তবু তাঁর এই আধিক্যপ্রবণতা যে সামান্য স্খলন বা শৈথিল্যকে আমলে আনেনি, দুর্বার গতিতে প্রবহমান থেকে আসল ভাবটিকে ভাসিয়ে একাকার করে দেয়নি, বরং স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল ও উন্নত রূপেই অবিকল রেখেছে এবং অবিচলিত; রবীন্দ্রগদ্যের অনন্য অসামান্য কৃতিত্ব সেখানেই। আপন আনন্দ-ভালোবাসা-ভালোলাগা-নির্ভর তাঁর 'সাহিত্য'-গ্রন্থভুক্ত শিল্পসৌন্দর্যতাত্ত্বিক প্রবন্ধগুলি এই মন্ময় মণ্ডনকলার নিদর্শন, বিষয়ের দাবিতে যতটা তন্নিষ্ঠতা অপরিহার্য, ততটাই গৃহীত। এমনকি ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবাশ্রিত চিত্রবর্ণনায়ও তাঁর এক স্বভাব, এক স্বরূপ প্রতিফলিত, যেমন 'রাজাপ্রজা'য় 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে :

"কে না জানে দরিদ্র বাঙালী কর্মচারীগণ কতদিন সুগভীর নির্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কি অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়, সে-তীব্রতা এত আত্যন্তিক যে সে-অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে—কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধান বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়োসাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে।"

সুদীর্ঘ বাক্যবন্ধের বিশেষণবহুল অকুণ্ঠ-বর্ণনাময় 'বাঙালী'জীবনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ সেদিন যেমন মূল্যবান ছিল, আজকেও তেমনি গভীর মনোযোগ দাবি করে। কেন? বিষয়ের গুরুত্বে তো বটেই, বিচারেরও নৈপুণ্যে।—বলা উচিত ব্যাধির যথোচিত সমীক্ষায়, মূল্যায়নে, বিশেষত লেখকের দূরাবস্থিতি সত্ত্বেও এর আন্তরিকতায়—তার তাপ, চাপ ও প্রভাব এতটাই যে, মনে হয় এই লেখকও বর্ণিত বাঙালিদের অন্যতম, মাত্র সহানুভূতিজনিত অনুমানে নয়, সমানুপাতিক অভিজ্ঞতায়—সুতরাং আত্মধিক্কার অথচ অসহায় 'শিকার' হিসেবে নিরুপায়ত্বের স্বীকার, দুঃসহকরুণ পরিস্থিতিপ্রসূত এই মনোভাব তাই লেখকের মাত্র জাতিগত নয়, যেন ব্যক্তিগতও।

সুতরাং বিষয় যা-ই হোক, যুক্তি ও আবেগকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধবাক্যে অদ্ভুত সমন্বিত করেছিলেন। আবেগের ভাগ সমধিক সত্ত্বেও তা কখনও উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হয়নি। অথচ বারবার আমাদের মনে বাজতে থাকে তাঁর বাক্যগঠন, রীতি ও শৈলীর অপূর্বক্ষমতা, আসলে যা তাঁর চিরাচরিত সেই অলঙ্কৃত ক'রে বলা, বিশেষণে বিশেষণে উজ্জ্বল ক'রে বলা, উৎসব ক'রে বলা। বঙ্কিমী ধরনে টানটান কাটা

কাটা কঠিন-সংহত নয় ; বরং টানা টানা, অবাধ প্রবাহময়, বহুদূরগামী। লেখকের যে-কোন বিষয়ে আন্তরিক অংশগ্রহণেই তা এহেন দীর্ঘবন্ধ সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে, গতিময় আকারে-আয়তনে, বিলম্বিত লয়ে, আশ্চর্য প্রবহমান ; পুষ্পিত-পল্লবিত অথচ সঞ্চারিনী। এজন্য তাঁর সহৃদয় ভাবাবেগ ও নিরপেক্ষ মনন সংযুক্ত-সম্পৃক্ত হয়ে যুগপৎ সাফল্যলাভ করেছে মনে হয়। তবে এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের শেষ কুড়ি বছরের গদ্যের প্রসঙ্গে আর ততখানি প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ।

প্রাগন্তিম রবীন্দ্রনাথ পূবের মতো সবসময় বিবিক্ত মননে অটুট থাকতে পারেননি। বিশ্বভারতীর আচার্য-ভূমিকায় নয় শুধু, সমকালীন দিগভ্রান্ত চতুস্পার্শ্বে, স্বদেশ ও বিশ্বের নৈরাজ্যধূসর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদীক্ষাগুরুর আসনে তাঁকে আরূঢ় হতে হলো একদিন, সমাসীন থাকতে হলো বহুদিন এবং এই আরোহণপর্বের প্রায় সবটা জুড়ে তাঁর মননশীল চিন্তাচেতনার বাহনগদ্য হলো চলিত গদ্য, 'সবুজপত্র'-প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণাগুণে যার রীতিটা খেয়ালী, নীতি শিক্ষণের। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর ('বীরবল') আধুনিক কালোপযোগী কসমোপলিটান মনের 'বিদূষক'-প্রবণতা, তর্জনস্বভাব তথা সেই চালের প্রচারধর্মিতা কোনোদিন খুব বড়ো হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু তাঁর ও ঝোঁকটা বুঝিয়ে বলার দিকে, বুঝিয়ে দেয়ার দিকে সমধিক উদ্যত হয়েছে। ফলে চলিত গদ্যরীতির রাবীন্দ্রিক ঠাটে আর পূবের ভারসাম্য প্রায়ই অবিচলিত থাকেনি। লেখার চালটা পাল্টেছে, সঙ্গে চলিত গদ্যের নিছক ক্রিয়া-সর্বনামগত নয়, বাক্যগঠনগত শব্দবন্ধগত চিন্তাপ্রয়োগগত, সক্রিয় শিল্পীর সর্বাঙ্গীণ মানসিক প্রতিক্রিয়াই বদলেছে। পূর্বকালীন গদ্যরচনার যে-শব্দভার তা কমেছে, সঙ্গে কিছু টান টান ধরনের ইস্পার্তী ধার বেড়েছে ; অথচ সৌন্দর্য-সামঞ্জস্যে অর্থাৎ সাজসজ্জা-পারিপাট্যে ঠাসবুনোন না এসে, কিছুটা আড়ম্বর-বাহুল্যই এসে গেছে। গদ্যশৈলী ও শিল্পপ্রতিভায় 'ধনী' তিনি ছিলেনই, 'গৃহিণী'ও ছিলেন, সম্প্রতি সেই 'গৃহিণী'পনায় পূর্বের ধৈর্য-স্থৈর্য কমে গিয়ে, ঠিক অসহিষ্ণুতা নয়, তবে মাত্রাতিক্রম লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাই দেখি : 'সাহিত্য'-গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ'-প্রসঙ্গের মাত্র একটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ একদা সত্য-সৌন্দর্যের যে ধ্রুব নিশানা দিয়েছিলেন, 'সাহিত্যের পথে'-গ্রন্থে পৌঁছে 'তথ্য ও সত্য' বা 'সৃষ্টি' প্রভৃতি প্রবন্ধের বহু অনুচ্ছেদে অবিরল বর্ণনায়-বিশ্লেষণে তাকে শুধু আভাসিতই করেছেন, ততোধিক সাফল্য সম্ভব হয়নি। আচার্যের ভূমিকায় বক্তৃতামঞ্চের প্রভাবই নয়, গুরুগিরির কথাও এখানে গুরুত্বহীন এজন্য যে, রবীন্দ্রনাথ কোন চাপানো সাজগোজে কোনদিন আগ্রহ দূর কথা, উৎসাহ তো নয়ই, ঔৎসুক্য বা কৌতূহল পর্যন্ত দেখাননি—তাহলে তা তাঁর উত্তরকালীন উৎকণ্ঠিত অনির্লিপ্ততারই

ফল ? অথবা 'খেয়ালী' গদ্যরীতির ? রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে প্রকৃতই আর পূর্বের মতো আশাবাদী, প্রফুল্ল-প্রসন্ন ছিলেন না, থাকা সম্ভব ছিল না ; তাঁকে যে জটপাকানো বহু কটুকুটিল বিপরীত দায়দায়িত্বে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল—বিকল-বিকৃত বিশ্বের, ভারতের, বাঙালির নানাবিধ অব্যবস্থায়, বিপর্যয়ে ! ফলে তাঁর বক্তব্য-পরিবেশনে, বিশেষত যেখানে অন্যসাপেক্ষ মতামতদানে তাঁকে দ্বিধায় বা কুণ্ঠায় ফেলা হয়েছে, অস্বস্তিতে তাই সতর্কতায়, মাঝে মাঝেই তিনি স্বাভাবিক আত্মস্থতার বিসর্জনে তৎসম্পর্কিত সাময়িক, অতি-প্রভাবিত ভাষণদানের অমিতাচার বয়ে এনেছেন। সাহিত্যবিষয়ক রচনা-বক্তৃতাও অব্যতিক্রমী। সাম্প্রতিক আধুনিকতার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় যেমন 'শাশ্বত আধুনিকতা'য় অত্যাসক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া চালত গদ্যরাতির একটি মহদ্দোষও মানতে হয়। এ যেন লেখককে অনেকটাই ঠেলে দেয়, ঠেলে নিয়ে যায়—রবীন্দ্রনাথেও এ-পর্যায়ী বেশ-কিছু রচনা তাই হয়তো অতিরিক্ত, উপচে-পড়ার মতো দেখায়। অথচ এ-কালের একেবারে ভিতর-থেকে-আসা তাঁর কয়েকটি রচনা (তা চলিত রীতির সর্বোৎকৃষ্ট মান ও মাত্রা, যেমন : 'ছেলেবেলা', 'মানুষের ধর্ম,' 'বিশ্বপরিচয়' ও 'সভ্যতার সঙ্কট')। 'বিশ্বপরিচয়ে'র ক'পাতা উল্টে দেখলেই বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগে, আত্মস্থ শিল্পীর প্রত্যয়ে এ-রীতির সদ্ব্যবহার এতই উদ্দীপিত ও উজ্জ্বল যে, পারিভাষিক শব্দ (তাঁরই নিজস্ব সম্পদ)-সজ্জিত বিজ্ঞানপ্রসঙ্গের আলোচনাও যেন উল্লসিত আমন্ত্রণ—বিদ্যালয়ে বা সভাগৃহে নয়, অন্তরঙ্গ ঘরোয়া বৈঠকে, আনন্দ ও জ্ঞান যেখানে পরস্পরের হাত-ধরা, 'বন্ধু' ও 'সত্য' উভয়েরই কথা রাখা যেখানে সহজ, সচ্ছল, সাবলীল ; এমন উৎসাহজনক লোকবিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রবেশক-গ্রন্থটিও কিনা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ! দুরূহ দার্শনিকতার ব্যাসকূটহীন প্রগাঢ় চিন্তাচেতনা-সমৃদ্ধ 'মানুষের ধর্ম'ও কেমন অনর্গল, পরিচ্ছন্ন, প্রবাহের মতো প্রভাবশীল ! 'ছেলেবেলা'র সান্নিধ্য তো এক আমূল অমল অভিজ্ঞতা, যেন নিসর্গসঙ্গসুখ, দুরারোগ্যেরও অবগাহনযোগ্য পরমায়ু। এবং পক্ষান্তরে 'সভ্যতার সঙ্কট' যে বজ্রকণ্ঠ বরাভয়, তা নিঃসন্দেহ—তবে ব্যাধির যেমন অমোঘ বিশ্লেষণ ও বিচার, তদনুযায়ী ঠিক কোনো প্রতিকারের স্পষ্ট মীমাংসা নেই ; হয়তো এজন্য যে, রাষ্ট্র-প্রশাসন ও রাজকোষ এখনও পর্যন্ত যাদের হাতে, তখন তো বটেই, তাদের বীভৎস শাসনে-শোষণে, চূড়ান্ত দমনে-পীড়নে 'বিচারের বাণী'ও 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে', সঙ্কট ও ব্যাধির মূলে যে তারা, রবীন্দ্রনাথ তো জানতেনই একথা এবং তারা কবিকোবিদদের সত্যভাষণে তথা মীমাংসায় চিরবধির ! তবু যেহেতু এই রচনা কবিতা নয়, প্রবন্ধ , তাই এখানকার পরাভবহীন মনুষ্যত্বচিন্তা, শিরদাঁড়াওয়ালা মানবচেতনা, দুর্গত-আর্ত ও বিপন্নের শিয়রে আদৌ

সাশ্রু শুশ্রূষা নয়, ওজস্বী চিকিৎসা; বিশেষত আপোষহীন সংগ্রামীদের কাছে আজও এর সত্যবলিষ্ঠ আদর্শবাদী প্রেরণামূল্য অমেয়।

তাই একথা আজ বলা বাহুল্য যে, বাংলা গদ্যের সাম্রাজ্য রবীন্দ্রনাথই বাড়িয়েছেন, বিশেষত চলিত গদ্যের। এবং মাত্র পঁচিশ বছরে। আর সেই সম্প্রসারণ এতদূর যে, তাঁর মৃত্যুর তেতাল্লিশ বছর পরেও (প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর অনুপ্রাণিত অন্নদাশঙ্করকে বাদ দিলে) কেবল সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের প্রাবন্ধিক গদ্য ছাড়া স্পষ্টত তাঁর থেকে ব্যতিক্রম আর কিছুই আমরা দেখতে পাই না। আর এই উল্লেখিত ব্যতিক্রমক'টি তো রবীন্দ্রনাথ নামক প্রবল পরাক্রান্ত নিয়মের রাজত্বেরই পরিমাপ, কেননা প্রতিতুলনা। বস্তুতপক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ ততটা নয়, যতটা প্রবন্ধলেখক ও গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথই আজ প্রচলশক্তি। তাঁকে নিয়ে অর্থাৎ তাঁর শেষাবধি-চর্চিত চলিত গদ্যের বহুবঙ্কিম বহুভঙ্গিম রূপশিল্প নিয়ে আমরা অতঃপর বহুদূর-দুর্গমে যেতে পারি, আরো নানা পরীক্ষানিরীক্ষা সাধতে পারি, এমন অনেক অদ্ভুত অস্ত্র বানাতে পারি যার আদ্য পরিচয়—মূল ধাতু সেই আশ্চর্য 'সাফ ইস্পাত' রবীন্দ্রগদ্য। 'মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে করো—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।' (বিবেকানন্দ)। বাংলা গদ্যে শুধু সাধু রীতিই তো নয়, সঙ্গে বঙ্কিমী ঠাট-এর কাটাকাটা কাঠিন্য কাটিয়ে রাবীন্দ্রিক নমনীয়তার (রমণীয়তার নয়) এটিই মহত্তম দান, সত্তম কীর্তি। একদা বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, এখন, এখনও রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বিচিত্র-চিত্রচরিত্র-প্রকাশক গদ্যশৈলী—শিল্পগুণ ও নৈপুণ্যে যার সম্ভাবনা প্রাকৃতিক শক্তি মহানদীতুল্য, বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন দ্রুতি-দীপ্তি ও মতিবেগশীল, প্রত্যক্ষগোচর যেটুকু, ততোধিক প্রচ্ছন্ন; কিন্তু তার পর্যাপ্ত প্রবাহের চিরচলন্ত ক্ষমতায়-দক্ষতায় আজও কোনো কমতি নেই।

শরৎচন্দ্র, বাংলা উপন্যাসের তৃতীয় পুরুষ

১

"More than any other literary form, the novel is obsessed with the impact of change upon personality."

বাংলা উপন্যাসে তখন দুই পুরুষ অতিক্রান্তপ্রায়। শরৎচন্দ্র আবির্ভূত হলেন, আর রাতারাতি, চমকপ্রদ বলতেই হয়, বাংলার পাঠকচিত্তকে জয় করে নিলেন। অথচ বঙ্কিম ইতিমধ্যে তাঁর প্রকৃষ্ট প্রতিভাগুণে স্থায়ী ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়েছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় ধীরস্থির পদক্ষেপে সেই প্রতিভাবলয়ের পরিক্রমা-অন্তে মাত্র এক যুগ আগে ঔপন্যাসিকরূপে তাঁর আপন মণ্ডল খুঁজে পেয়েছেন। 'চোখের বালি'তে সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত ভঙ্গিতে তাঁর যে সমাজসমীক্ষা প্রতিফলিত তাতে বঙ্কিমের উত্তরাধিকার ন্যায়তই উপস্থিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিহিত-সন্নিহিত ভাববাস্তব দৃষ্টি, তাঁর নব-প্রবর্তিত বিস্তারিত মনোবিশ্লেষণই সেখানকার মুখ্য মুন্সিয়ানা, আকর্ষণ। অনতিকাল পরে 'গোরা' ও 'চতুরঙ্গে', যথাক্রমে ব্যাপক ও সংহত শিল্পরূপে, অর্ধযুগ অন্তর-অন্তর, রবীন্দ্রনাথের পরিণততর মানব-সমীক্ষা বঙ্গজসমাজে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ আদৃত হয়নি। পক্ষান্তরে, শরৎচন্দ্র উক্ত সময়-সমাজে যে সাড়াজাগানো জনপ্রিয়তার বিরল কৃতিত্ব গড়লেন, তাঁর অন্য-অনেকসহ 'বড়দিদি', 'বিন্দুর ছেলে'-ত্রয়ী, 'পল্লীসমাজ' ও সর্বোপরি 'শ্রীকান্ত'-১ম, 'পরিণীতা', 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি প্রকাশে, তার সঙ্গে প্রতিতুলনায় সেযুগের বঙ্কিমপূজা ও রবীন্দ্রপ্রশস্তির দূরত্ব খুব সহজেই পরিমাপযোগ্য; স্বয়ং শরৎচন্দ্রেরও অকল্পনীয় সেই অত্যাশ্চর্য জয়জয়কার, পর্যাপ্ত স্তুতি ও যথেচ্ছ নিন্দার যুক্ত তুমুল অভিব্যক্তি, তাই, উক্ত বঙ্কিম-রবীন্দ্রপরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য; কেননা ঐতিহাসিক সেই মূল্যায়নে বিষয়টা যতটা বিশদ করা যায়, শরৎচন্দ্রের প্রতি যেমন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রের প্রতিও বুঝি সুবিচার হয়। আর শরৎচন্দ্র যেহেতু বাংলা উপন্যাসের সুচিহ্নিত তৃতীয় পুরুষ, তাঁর প্রসঙ্গে তাই পুরুষানুক্রমের বিচার প্রথমেই অবশ্যকর্তব্য।

সেই সঙ্গে উপন্যাসের জন্মক্ষণ, বিবর্তন ও ভবিতব্য-চিন্তার আনুষঙ্গিকতাও

এসে পড়ে। বিশেষত এ-ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক জীবনসঙ্কটের একটি গ্রন্থিলতম মুহূর্তে নবাগত উপন্যাস দেশে দেশে মানুষের হাতে মানুষেরই অচৈতন্যে শল্য-চিকিৎসায় যেমন পুনঃপুনঃ কাজে এসেছে, বাংলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর বঙ্কিমই সেই অব্যতিক্রম-সাধনার পুণ্যশ্লোক প্রথম পুরুষ, বাংলাদেশের নবজন্ম-লগ্নে যিনি বাঙালির সর্বাঙ্গীণ ভাগ্যবিধাতা হয়েছিলেন। এবং সেদিনই বাঙালির জীবনে এক মহাসঙ্কট ঘনিয়েছিল তার জীবনযাপনের দ্বিধায়, জীবনধারণার সংশয়ে-বিরোধে ও জীবনাচরণের বিরোধজয়ে অথচ অনিশ্চয়তায়। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যদি ঔপন্যাসিকরূপে সেদিন দর্শন দিতেন, তবে হয়তো, তিনি যে অভাবনীয় কলাবিদ্ ছিলেন, তদনুসারে আজ এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই থাকতেন। কিন্তু তাঁকে সেদিন বাঙালির ভাগ্যত্রাতার ভূমিকায় জাতীয়সঙ্কটকে জাতীয়কল্যাণে রূপান্তরিত করতেও অবতীর্ণ দেখি। তাই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষরূপে জাতীয় ত্রাণের মহৌষধ তিনি তখন দিলেন বটে, কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, ঔপন্যাসিক-সত্তায় তিনি সেইসঙ্গে সেদিন বুঝি আরও কিছু দিলেন না, দিতে পারলেন না, যা হলে আজকের প্রসঙ্গ ঠিক এভাবে লিখিত হতো না; বঙ্কিমকে বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎরূপে নয় শুধু, সফলতম শিল্পীরূপেই দেখতাম, তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠ সমগ্র ব্যক্তিত্বের গরিষ্ঠ গৌরবোচ্চারণে তাঁর মুখ্য-মহাকবি ও কথাকোবিদ-ভূমিকার সাফল্য এমন অপেক্ষাকৃত বিমিশ্র রূপ নিত না। বাস্তবিকপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিকরূপে স্মরণ করতে গিয়েও আমরা কেন দেখি, তিনি কোঁতের ধ্রুববাদের চিত্তচমৎকার প্রবক্তা, প্রচুরতম ব্যক্তির প্রভূততম কল্যাণসাধনে কেন তাঁকে বার বার নিবিষ্ট হতে দেখি বাঙালি জাতির ইতিহাসচর্চায়, কৃষ্ণচরিত্রের নবব্যাখ্যায়, ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনে? কেন তিনি মাত্র ভাবোন্মাদ কবি না হয়ে, বস্তুনিষ্ঠ স্রষ্টা না হয়ে, বিশেষ সন্ধিসময়চারী একটি সৃজনশীল ক্রান্তিকালীন উদভ্রান্ত দেশের, দেশবাসীর দিশারী হতে গেলেন? আর কেনই বা তাঁর পরাসত্যসন্ধ আদর্শবেগবান উপন্যাসগুলির পাঠ সমাপন করতে গিয়ে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিতে হয় তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে', তাঁর চিত্তবৃত্তি- সমন্বয়-সাধনার ধ্যানে-জ্ঞানে-কর্মে? সমগ্র উনিশ শতকের কাঙ্ক্ষণীয় দুরাকাঙ্ক্ষার বিপুল দায়-ভার তিনি, শতকান্তে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাদে, একাই বহন করলেন, আর ধারা-বাহিক দায়িত্বে ও জাতীয় কর্তব্যের জন্মঋণশোধে কবি-কর্মীর এষণায় জড়িয়ে গেলেন সমগ্র বাঙালি, কালান্তরে সমস্ত ভারতবর্ষ ও অন্তিমের নিখিল বিশ্বকল্যাণের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী রবীন্দ্রনাথকে। একথা অনস্বীকার্য যে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া বঙ্কিমই ছিলেন জীবনশিল্পী রবীন্দ্রের এক মহামান্য 'মডেল'।

জন্মযোগে রবীন্দ্রের ললাটলিপিও অনুরূপ। আর দেশকালপাত্রপ্রবাহে তাঁর জীবনচর্চা যথেষ্ট সঙ্কটবহুল, সমস্যা-সমাধানে-নবসমস্যায় বহুধাগ্রস্ত, তুঙ্গজটিল-সত্ত্বেও তার প্রশমন যে এসেছে সেই একই পূর্বাগত প্রবাহে, তা অনুপেক্ষণীয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা উচ্চারণের কালে বঙ্কিমের আবির্ভাব। সেই স্বাধীনতা-স্পৃহা যাতে স্বেচ্ছাচারিতার রূপ না নেয়, সেই অতন্দ্রপ্রহরাব্রতে বঙ্কিমের মূল্যবান আয়ু ও শক্তির বহুলাংশ নিঃশেষিত, ধমনীশিরার অনেক রক্তস্রোত; উপন্যাসের সামাজিক-ব্যক্তিক মানব-ভাবনায়ও তাই তিনি তাঁর ন্যায়যুক্তি প্রবল করে তুলে সহৃদয় সংবেদনের মাত্র কতকাংশই দিতে পেরেছেন। 'অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম অকালে শুকাইল', এ-প্রসঙ্গে তাঁর চরম খেদোক্তি। অবশ্য রোহিণী-চরিত্রে তিনি মনুষ্য-মন-সন্ধিৎসার আরেক কৃতিত্ব দেখালেন, তা হলো সেই সামন্ততান্ত্রিক আবদ্ধতার মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-উন্মোচনে অত্যাবশ্যক 'সু-কু'র অনিবার্য দ্বিধাদ্বন্দ্বের অভিঘাত এবং বেপরোয়া বিপজ্জনক বাঁচার তথাকথিত স্বাধিকার-প্রমত্ততার নির্মম সর্বনাশা পরিণাম। সেই স্বল্পস্থায়ী দ্বিধাদ্বন্দ্ব যথোচিত মূল্যবান হলো রবীন্দ্র-দ্বান্দ্বিকতায়, তাঁর কঠিন সমন্বয়ে। প্রথম পর্ব সাধিত করেছিলেন বঙ্কিম তাঁর যুক্তিযুক্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রবৃত্তিবর্গের সংঘাতবহুল আন্দোলনে, দ্বিতীয় পর্ব সাধলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহৃদয় বুদ্ধির সহানুভূতিতে। বিনোদিনীর পরিণতি তারই নিদর্শন। রোহিণীতে যা মাত্র প্রবৃত্তি-প্রকৃতিগত মোহ-ক্ষোভের সাংঘাতিক জ্বালা, বিনোদিনীতে তাই সামঞ্জস্যলাভের স্নিগ্ধতা। এবং ইতিমধ্যে কালস্রোতে শিক্ষাদীক্ষায়-প্রতিষ্ঠায় আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতার স্ফুরণে বিস্ফোরণ হতে দেখছি, ব্যক্তি-দ্বিত্বের সূচনা দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তিবহুত্বের উদ্ঘাটন : 'শচীশে'র যে 'এক অঙ্গে এত রূপ', 'চতুরঙ্গে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথও কি তা জানতেন, তাঁর অত বড়ো মাপের গোরাকে দিয়েও তিনি ব্যক্তিবিকাশের এ-বিস্ফোরণ ঘটতে দেননি, সম্ভব ছিল না। তাই যুক্তিমনন-ধর্মী বঙ্কিমের বস্তুনিষ্ঠায় চিত্তবৃত্তির যে-ঐকযোগ একদা ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলনের দুরূহ রূপ ছিল, রবীন্দ্রনাথে প্রকৃত কবির ভাববশে তাই হল সহজ-মানবীয় অঙ্গীকারের বৈচিত্র্যে ঐক্য ও ঐক্যে বৈচিত্র্যসন্ধান; তাঁর ভাবকল্পনায় বিচিত্র মানুষের মনোভূমিতে বিচিত্র চিত্তবৃত্তি, বিচিত্র সুখদুঃখানুভূতির সহযোগ সুনিবিড় হয়ে এল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপনিষদী প্রভাতী রাগ ছাড়াও, তাঁর যৌবনের নেপথ্যস্তব্ধ শাশ্বত প্রকৃতি-প্রাণ-সম্পৃক্ত-সমৃদ্ধ বাংলার পল্লীগ্রামীণ মানব-সংসারের মৃত্তিকালীন অভিজ্ঞতায় তাঁর মৌলিক কবিসত্তার মেঘ ও রৌদ্র বিজড়িত করলেন। তাই বুদ্ধিযোগী বঙ্কিমের ইন্দ্রিয়-অনুশীলনাত্মক 'ধর্মতত্ত্ব' রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শবাদী আত্মবলীয়ান কল্পনায় সাবলীল 'মানুষের ধর্মে' রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথ মানুষের সামাজিক পারিবারিক

পটভূমিকায় ব্যক্তিমানুষেরই কল্যাণে তার জৈব প্রবৃত্তিকে সৌন্দর্য-সামঞ্জস্যবোধে প্রসাধিত করে তুললেন—কবি-কথাকোবিদের সহজাত অন্তর-মন্থনশক্তি তাঁর সহযোগী, আর মানুষের এতাবৎকালীন ব্যক্তিসংগ্রাম-সচেতন আত্মপ্রত্যয়। বস্তুত বঙ্কিম যে-প্রত্যয়ের সাধনা উদ্দীপ্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথে এসে তার যথার্থ আস্থাশীল গভীরতা মিলল। বঙ্কিমের কালপাত্রোপযোগী 'রূপ'তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তি-তাড়নার প্রবলতা রবীন্দ্রনাথের হৃদয় দিয়ে হৃদয়ানুভবের আন্তরিক শক্তি, অন্য-সাপেক্ষতা, পারস্পরিক সহানুভূতি তথা 'আঁতের কথা' উপলব্ধির প্রবণতা দাঁড়াল।

আন্তরিক এই পরস্পর-বোঝাপড়ার পরমলগ্নে, গভীরায়ত মৌল-মনুষ্যত্বমূল্য-বোধের শুভ মুহূর্তে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তাই 'মেসের ঝি' সাবিত্রীকে নিয়ে তাঁর অভিমান ও অহঙ্কার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, দুঃসাহসে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, ঐতিহাসিক পারম্পর্যের পরিণামে তা যেন ততই স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত। যদিও বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র আক্ষরিক অর্থে 'outsider'। এক হিসাবে সত্যসম্পর্ক-শূন্য প্রবাসী, এমনকি শিক্ষাপ্রস্তুতিবিহীন। কিন্তু তিনি তাঁর সাবিত্রী, কিরণময়ী, ইন্দ্র-অন্নদাদি-শ্রীকান্ত ও পিয়ারীকে নিয়ে যখন মঞ্চে আবির্ভূত, সুরেন্দ্র-মাধবী, রমা-রমেশ, দেবদাস-পার্বতী ইত্যাদি অবশ্য অন্যভাবে ইতিমধ্যেই পল্লীনগর-বাংলার প্রীতি কুড়িয়েছে, তখন যে তাঁর সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত মনুষ্যমূল্যবোধের রক্তিম প্রকাশই তাঁকে ঘন ঘন জয়বাদ্যে নিনাদিত করে তুলেছে, তা দেখতে পাই। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল রবীন্দ্রকর্ষণায়, ফসল তুললেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের 'সূক্ষ্মকল্পনা'র 'প্রভাবে ভিতরে ভিতরে [যে] একটা উৎকণ্ঠা' জেগেছিল, শরৎচন্দ্র এই নিগূঢ় উৎকণ্ঠাকেই বাস্তব-বাঙ্ময় করে তুললেন। 'যে সামাজিক ও পারিবারিক বিধিব্যবস্থার বশে, বাঙালির জীবনে আত্মত্যাগের মহিমা ও স্বার্থরক্ষার দৈন্য, এই দুয়েরই বেদনা করুণ হইয়া উঠিয়াছে—যে-ট্রাজেডি কোন অতি-মানুষ নাটকীয় ট্রাজেডি হইতে কিছুমাত্র কম নয়, তাহাকেই তিনি সাহিত্যের আকারে সুপ্রকাশিত করিলেন।' (মোহিতলাল : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, শরৎচন্দ্র দ্র°) অবিসম্বাদী সত্যোচ্চারণে তিনি তাই রবীন্দ্রনাথকে অচিরেই গুরুগৌরব দান করে একদিকে বললেন, 'আমি সাহিত্যে গুরুবাদ মানি', আরেকদিকে : রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের জন্যে লেখেন, আমি লিখি তোমাদের জন্যে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ লেখকদের লেখক, শরৎচন্দ্র সাধারণ পাঠকদের, জনগণের।

তাছাড়া আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য তাঁকে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র করেছে। শরৎচন্দ্র ভাগ্যবান যে, তাঁকে দেশবাসীর ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে আসতে হয়নি, রবীন্দ্রনাথকে যেমন হয়েছিল, অথবা রবীন্দ্রপূর্বে বঙ্কিমকে। ভাগ্যনিয়ন্তার বিপদ

এই যে, ভাগ্যবিপর্যয়-মোচনে তাঁকে যতই নির্বিকার উত্তমর্ণ সেজে সর্বত্যাগী নেতৃত্ব দিতে হয়, ততই তিনি অধমর্ণদের কাছ থেকে দূরে সরে যান, তাঁকে যেতেই হয়; নির্লিপ্ত নেতাকে কবে একাসন দিয়েছে ভাগ্যবঞ্চিত ভাববিকল জনতা? তাছাড়া এই বিশেষ রুচিশিক্ষাগত সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের দিশা সত্যই দুরধিগম্য, কোন সহজ স্নিগ্ধতার, সহৃদয়বৃত্তি ও প্রবণতার উৎসাহজনক নয় এই পথাতিবাহন— ধ্যান-জ্ঞান-কর্ম এই ত্রিকাণ্ড মিলিয়ে আত্মশক্তিলাভের যে আহ্বান, অন্তরঙ্গ প্রেম ও ভাবযোগ সত্ত্বেও বহিরঙ্গ এই ত্রিশক্তি-সাধনার যে নিগূঢ় সঙ্কেত, তাই বিশেষত রবীন্দ্র-বঙ্কিমকে সচরাচর দুর্গম করে তুলেছে; পক্ষান্তরে, শরৎচন্দ্র সহজিয়া বাউল দরবেশের মতো, সূক্ষ্ম-সৌকুমার্য-রুচিবাহুল্যহীন সাধারণ অপরিশীলিত মনোভাবে, কতকটা কথক-ঠাকুরের ধরনে মানুষের হৃদয়ে সরাসরি প্রবেশ করেছেন; তাঁর জীবনাচরণ, রসরুচিসংস্কার এমন অসাধারণ ছিল না কখনো, যা তাঁর পক্ষে অচিরাৎ জনচিত্তজয়ে কোন বাধা ঘটাতে পারে। সর্বোপরি তাঁর বস্তুভাবাবেগবাহী চিত্তদ্রব ভাষাবর্ণনার মাদকতা, দ্রুত সম্মোহন তো ছিলই। যুক্তি, ন্যায়, ধর্ম, মেধা, মনন এ-সবের সুকঠোর অনুশাসন এড়িয়ে তিনি তাঁর সহজ সরল অস্তিত্বের রক্তঅশ্রুগলিত অনুভবে, অনুভাবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের চিন্তাধারাকেই যেন স্বকীয় পন্থায় আরেকভাবে রচনা করে নিয়েছিলেন; সেই রচনাশক্তি, সেই পুনর্নিমাণের কৃতিত্ব তাঁর। আমাদের কথাসাহিত্যের এই তৃতীয় পুরুষের কেন্দ্রীয় গুণবৈশিষ্ট্য তাই তাঁর সর্বাত্মক ঔপন্যাসিক রচনানৈপুণ্যের, পূর্বঐতিহ্য-বিগ্রহণ ও স্বীয় অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক বর্ণনায় তাঁর সামঞ্জস্যে, হৃৎস্পন্দিত অনুকম্পায়ী ক্ষমতায়।

বলা বাহুল্য, বহুকথিত তাঁর বঙ্কিম-প্রতিক্রিয়া ও রবীন্দ্র-প্রভাব সত্ত্বেও তিনি সাধারণের হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ে, তাঁদের মনীষার মর্ম উদ্ঘাটন করেননি, সেই মনীষামণ্ডিত হৃদয়ালোকের সহজপন্থী বিকিরণ ঘটিয়েছেন—এক হিসাবে এঁদের আপাত দিককেই স্তুতিনিন্দায় সুপাচ্য করে তুলেছেন এবং অনস্বীকার্য যে, সমগ্রভাবে এঁদের শিল্পিত মননের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। বিস্তৃতভাবে তা পরে আলোচ্য। উপস্থিত স্বীকার্য যে, সাধারণ্যের হৃদয়কেন্দ্রে সত্বর উপনীত হতে তিনি তাঁর মাত্রাজ্ঞানের শক্তি-অনুযায়ী বিচক্ষণতার নির্ভুল পরিচয় দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র মাত্র ঔপন্যাসিক হতে চেয়েছিলেন, সময়সঙ্কীর্ণ ঔপন্যাসিকই ছিলেন তিনি। সর্বাত্মক জীবনসঙ্কটের ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা তাঁর ছিল না। দুরদুর্গম বঙ্কিমবিচারের বৈফল্য তারই নিদর্শন। আরো সন্নিকট ও আপাতসুগম বিনোদিনীর কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথকেই যে তিনি তাঁর একান্ত-একাগ্র 'নারীর মূল্য' বোধেই সুগভীরে গ্রহণ করলেন, সেও তাঁর অপ্রশস্ত অথচ একমুখী পথপরিক্রমার

পূর্বসঙ্কেত। অনিবার্যত প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের সুবিচিত্র উপন্যাসাবলীর মাত্র প্রথম পদক্ষেপই শরৎচন্দ্রের এত প্রিয় ও প্রশস্তিযোগ্য হলো কেন? তার সুনির্দিষ্ট কারণ আমরা এখানকার পরবর্তী অংশে দেখব, উপস্থিত আমাদের বিচারে এ-ঘটনা যে শরৎচন্দ্রের নিতান্ত অন্তর্নিহিত, 'চোখের বালি' ও তাঁর নিজের অধিকাংশ উপন্যাসের এই তিনটি সামান্য লক্ষণ তা স্পষ্ট প্রমাণ করে :

১। 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ যে মানুষের 'আঁতের কথা' বের করে আনার, বর্ণনার আধুনিক পদ্ধতি তথা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও মনোবিশ্লেষণ দেখালেন, শরৎচন্দ্র তারই ব্যাপক প্রয়োগ করলেন পরবর্তীকালে; জন্মসূত্রেও তিনি এই ঋণশোধে প্রতিশ্রুত ছিলেন মনে হয়: স্মরণীয় যে, তিনি তাঁর কীর্তিহীন সাইকো-অ্যানালিস্ট পিতার ভাববাহন পুত্র। ২। নারীত্বের প্রতি সহজ শ্রদ্ধাযোগে আপাত-অসতী নারীকেও ফলত-সতী ও শ্রদ্ধেয় ক'রে দেখানোর প্রথম কৃতিত্বও 'চোখের বালি'র। অপরিণতবুদ্ধি গোবিন্দলালের রূপজ মোহের, লালসার বশ্য ও পোষ্য হয়ে রোহিণী যা হতে পারেনি, অনুরূপভাবে মহেন্দ্র সম্পর্কেও বিনোদিনী, সার্থকতার সন্ধান তো সে পেল পরিণতমন বিহারীর প্রেমে ও শ্রদ্ধায়। শরৎচন্দ্র সারাজীবন নারীকে এই সার্থকতাই দিতে চেয়েছেন নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে, নানা অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাবে-প্রতিক্রিয়ায়। এই সূত্রে লক্ষণীয় তাঁর বিশেষ প্রীতিজনক থীসিস : 'নারীত্ব আর সতীত্ব এক জিনিস নয়' এবং তার প্রতিষ্ঠাই যে তাঁর মুখ্য ব্রত ছিল তিনি তা রমা-রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রীর মাধ্যমে তো স্তরে স্তরে বটেই, প্রত্যক্ষত স্পষ্ট পতিতাদের গোপন মহত্ত্ব-মনুষ্যত্ববর্ণনায়ও যেমন প্রায় সব উপন্যাসেই সঞ্চারিত করছিলেন, সমকালে তাঁর 'সাইকো-এথিক্যাল' প্রবন্ধসমষ্টি 'নারীর মূল্যে'র উচ্চকণ্ঠ প্রচারেও তেমনি তিনি পুরুষপ্রধান সমাজের নারীনিপীড়ন সম্পর্কে হার্দ্যযুক্তিময় সন্ধান ও তাঁর সিদ্ধান্ত সুগোচর করলেন। 'Scientific-ethical' উপন্যাস রূপে 'চরিত্রহীনে'র স্বয়ংপ্রদত্ত ঐ অহঙ্কারী আখ্যাও তাঁর পূর্বোক্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নিজস্ব স্বয়ংনির্ভর অভিজ্ঞতার স্পর্ধিত সৎসাহস ছাড়া এক্ষেত্রেও বৃক্ষমূলের দুরন্ত শক্তিরস রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'রাবীন্দ্রিক' উপন্যাস 'চোখের বালি'ই সঠিক জুগিয়েছে। ৩। গ্রন্থভুক্ত নরনারীনির্বিশেষ সব পাত্রপাত্রীর জন্যে যে সহৃদয় সংবেদন 'চোখের বালি'তে সন্নিকট সামাজিক-ব্যক্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি ও সমাজ-অনুবীক্ষণে, দেখা যায়, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর সুগভীর মর্মবেদনা। সাধারণ্যে এই সুদুর্লভ সহানুভূতির নিবিড় নৈকট্য, সংস্পর্শ নয় শুধু, সান্নিধ্য-সংযোগ শরৎচন্দ্রকে অচিরেই সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছিল। •

অবশ্য তাঁর জাগ্রত বুদ্ধিবিচারের বিতর্ক-দুর্বল অতিমাত্রিক হৃদয়চর্চা তাঁকে তৎকালের সীমাপ্রান্তে ভারসাম্য-বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসাবেও দাঁড় করিয়ে দিল, অনুরূপ-প্রকৃতির ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সম্পর্কে প্রযুক্ত কাজামিআঁর উক্তি এ-প্রসঙ্গে তাই শরৎচন্দ্রে প্রায়শ ব্যবহার্য: 'His strenuous energy was not always a substitute for careful art. His faults in taste and in style, the failings of his intuitive verve, are obvious ; his literary individuality lacks polish. He sacrifices balance for the sake of intense effects ; his expression obeys monotonous habits ; he repeats himself to excess'

বলা দরকার যে, শরৎচন্দ্র যেমন তাঁর দেহসংস্কার, অনুভূতি ও হৃদয়ের অতিচর্চায় ক্ষণে ক্ষণে ভারসাম্য হারিয়েছিলেন, নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, পিতামহ বঙ্কিমচন্দ্রেও তাঁর ন্যায়বাদ, বুদ্ধিযোগ ও যুক্তিধর্মের অতিশয়োক্তি আরেকরকম ভারসাম্য-অনটন ঘটিয়েছিল, পুনরাবৃত্তি হয়েছিল তাঁর অনিরপেক্ষতার। মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথ শান্ত মননে ও অক্ষিপ্র সহৃদয়তায় সমন্বিত, পুনরাবৃত্তি-পরাঙ্মুখ, নিত্যনবীন। অবশ্য তিনি বঙ্কিম-শরতের মতো বহুপ্রসূ ঔপন্যাসিক নন।

এবং ডিকেন্স সম্পর্কে ব্যবহৃত কাজামিআঁর এ-উক্তিটিও শরৎচন্দ্রের প্রযোজ্য, অনেকটা একই ক্ষেত্রে হেতুসম্ভব ব'লে, ঘটনাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রেও : 'At every turn in his stories, we come upon the favourable or unfavourable opinions of the author—a kind of sentimental commentary on his own work ; and these instances of bias, intensified by polemical preferences and arguments (বিশেষত বঙ্কিমে), too often bore or annoy the readers'।

এইভাবে আমরা পেয়েছি 'চোখের বালি' ও বিশশতকী রবীন্দ্রনাথের সহজিয়া উত্তরসাধককে, বাংলা উপন্যাসের তৃতীয় পুরুষ শরৎচন্দ্রকে, উনিশ শতকের সুকঠিন-সমাজ-সংগঠনের বঙ্কিমী শিলান্যাসে যিনি সুস্থিত, প্রথম বিশশতকের ব্যক্তিসমাজ-সংঘাতে যিনি রবীন্দ্রানুগ নমনীয় ও করুণ, আর আগতপ্রায় চতুর্থ পুরুষের অতিব্যক্তিস্বতন্ত্র ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতাক্ত চেতনায় তথা অপচয়-যাতনায় যিনি যুগ-সন্ধিযাপিত করাগ্রভাগ গোচরে-অগোচরে বেশ বাড়িয়ে ধরেছেন।

২

"To be alive, to be whole man alive : that is the point. And at its best, the novel, and the novel supremely, can help you. It can help you not to be a dead man in life."

D. H. Lawrence.

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' এখানে আহরণযোগ্য। তাঁর স্বতন্ত্র জীবিত-জাগ্রত অস্তিত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব-নির্ণয়েই তার প্রয়োজন :

"…এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না। প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল।…অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।'

তারপর এল বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। কোন-কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।…"

আলোচ্য লেখকের মনে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের প্রতিক্রিয়া যে বৈপরীত্যে মেরু-প্রতিম, তা উদ্ধৃত অংশের প্রধান লক্ষণীয়। বঙ্কিমকে তিনি মুখস্থ করেছেন, অনুকরণ ক'রে ব্যর্থ হয়েছেন। আত্মস্থ করেননি, অনুসরণ ক'রে সফল হননি, রবীন্দ্রনাথ যা প্রাথমিকভাবে করেছিলেন, হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে (আদৌ দৃষ্টিভঙ্গিতে) তিনি 'একটা নূতন আলো'র সন্ধান পেলেন, 'অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে' এমন করে দেখতে পাওয়া, যা আত্মপরিচয়েরই নামান্তর, তা হলো তাঁর পক্ষে একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, সময়ের ব্যবধানে সৃষ্টিপ্রেরণাও। শরৎচন্দ্রের উপযুক্ত বাতাবরণ এতেই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কেবল পুরুষানুক্রমিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সাধারণ রীতিতে নয়, নীতিগত ভাবেই, স্থানকালসম্ভব-স্বভাবত, তিনি বঙ্কিমের যুগোচিত মহৎ আদর্শসন্ধানের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বাস্তবসমীক্ষাকেই সমধিক মূল্যবান মনে করেছেন। এবং বঙ্কিমের সমগ্র ব্যক্তিত্বের ধ্যান না ক'রে, পিতৃঋণস্বীকৃতি ও আত্মদর্শনের

৭

তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন, বিপরীতক্রমে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আংশিক একদেশদর্শী দৃষ্টিপাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তার বড়ো প্রমাণ তাঁর এই স্মৃতিচারণ-প্রসঙ্গের উক্তি :

"·· ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু রইল না। ভালই হ'ল। হিন্দুসমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর-একটা দিক ? সেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম ?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা ক'রে মরেছে।" স্বতঃস্ফূর্ত ভাবোচ্ছ্বাস হিসাবে পড়লে এর মূল্য কম নয়, কিন্তু যুক্তিযুক্ত অনুচিন্তায় এ-বিচার অবিচার, স্ববিরোধও দুর্লক্ষ্য নয়। বঙ্কিম হিন্দুত্বের দিক থেকেই পাপ-পরিণাম আঁকেননি, এঁকেছিলেন সূক্ষ্ম প্রত্যয়স্থির গভীরদায়িত্বসচেতন এক সবল ব্যক্তিত্বের দিক থেকে, নব-সৃজনশীল একটি ভূ-কম্পিত সমাজের উৎসুক দৃষ্টি তাঁর পিছনে উদ্যত ; আর সে-পাপ রোহিণীর নয়, সে-পাপ গোবিন্দলালের—ব্যক্তিত্বহীন, চরিত্রশক্তিহীন, অসার ও উদ্‌ভ্রান্ত, অমেরুদণ্ডী গোবিন্দলালের। বঙ্কিমের চোখ রোহিণীর সে-ঘটনায় অশ্রু-সহানুভূতিপূর্ণ হয়েছিল ঠিকই, তবে তার বহিপ্রর্কাশ শরৎচন্দ্রের মতো কোন সাবেগ স্পষ্টোচ্চারণ না ক'রে মাত্র তাঁর 'কবিচিত্তে'র মর্মস্পর্শ দিয়েছিল মিতবাক্ ব্যঞ্জনায়, সঙ্কেতে : পিস্তলের শব্দ শুনে ভৃত্যবর্গ ছুটে এল, "দেখিল, বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে।" আর সেই বালকচিত্ত, 'বালকনখর'যুক্ত "গোবিন্দলাল কোথাও নাই"। রোহিণীর প্রতি প্রীতিস্নিগ্ধ সহানুভূতি, অন্তত এক্ষেত্রে, শিল্পসঙ্গত সংযমে এর চেয়ে আর কী দেখাবার ছিল ? বিশেষত, রোহিণীর হত্যাঘটনা দিয়ে গোবিন্দলালের বালকোচিত ভ্রমর-রোহিণী-সঙ্কট মীমাংসার ব্যর্থতার প্রতিই যখন বঙ্কিমের মূল কটাক্ষ ? তাছাড়া, 'বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ' রোহিণীর চিত্র নগণ্য ভৃত্যবর্গের উপমা-কল্পনায় কি আমরা ঠিক চাক্ষুষ করছি, না কবিচিত্তবান বঙ্কিমের সুমার্জিত হৃদয়দর্পণে ? বঙ্কিমের কালযাত্রা ও মাত্রাবোধ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অনভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির অভাব এ-অবিচারের জন্যে দায়ী। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমবিচারে বলেছেন, 'তখন সময় আরও কঠিন ছিল'। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই বঙ্কিমপ্রসঙ্গে এমন ভ্রান্তি কখনো

দেখা যায়নি—বিশেষত রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানে, কর্মে ও দায়িত্ব-পালনে বঙ্কিমের সত্যকার উত্তরসাধক ছিলেন। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার, সেও তাঁর সেই মনোজ্ঞ 'কল্পনা'দৃষ্টির, শরৎচন্দ্রের ভাষ্যমতো, যেখানে ছায়া পড়েছে সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ অন্দরমহলের, সুনিহিত-সন্নিহিত 'আঁতের কথা'র। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-রচনাকৃতিত্বের স্বয়ং-নিবেদিত দাবিও ছিল তাই। তিনি বঙ্কিমের মতো মানব-চরিত্রের বৃহৎ রূপচিত্রশালায় দাঁড়িয়ে তার মৌল স্থূল প্রবৃত্তির ক্ষুধাতৃষ্ণা, তজ্জনিত 'সু'-'কু' দ্বন্দ্বসংঘাত ও দেশকালপাত্রোচিত আদর্শ-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেননি; তিনি মানবমনের গভীরে নেমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে তার ছোট-বড়ো প্রবৃত্তির মূল্যবান অন্তঃস্রোতকেও বাস্তবসঙ্গত ও মনোজ্ঞ ক'রে তুলেছেন, যত না বিবৃতিতে, ততোধিক ব্যঞ্জনায়, সঙ্কেতে। বিশেষত 'নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম'-কথার বিচিত্র বঙ্কিমোত্তীর্ণ প্রকাশে, নানা ভাবানুষঙ্গে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতায়। সেখানে তিনি অবশ্য তাঁর কালোচিত কর্তব্যই সমাধা করেছেন, সেই পর্যবেক্ষণে পাপপুণ্যব্যতিরিক্ত পরিণতমন মনুষ্যত্বের যথাযোগ্য মর্যাদাযোগে। শরৎচন্দ্র উক্তধারার স্বাভাবিক শিল্পী—ব্যক্তিগত জীবন-যাপনের বৈশিষ্ট্যে, লক্ষ্যস্বাতন্ত্র্যে, রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় মানবমনের অতলে অবগাহনেচ্ছা তাঁর সমধিক, অনুবীক্ষণক্ষমতাও (রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ শরৎচন্দ্রে অনুবীক্ষণ হয়েছে) ঢের, তাই তাঁর আবেদন সহজ চিত্তরঞ্জনে বহুবিস্তৃত, সর্বজনীন। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা উদ্ধারযোগ্য : '···শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।···যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে এমন আর কারো লেখায় হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।' এবং এখানে এসে স্বয়ং শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তিও স্মরণীয় : **"In Bengal, perhaps, I am the only fortunate writer who has not had to struggle."**

বিষয়টাকে বিশদ করতে গেলে দেখি, সত্যই যুদ্ধ করেছিলেন তাঁর পিতৃপিতামহ, যুদ্ধজয়ের মাত্র অন্তিম শরক্ষেপ তাঁর। এখানে তাঁর এই যে ভূমিকাটি, তা বিশেষিত করতে রবীন্দ্রনাথের মানবীয় বস্তুবিশ্বের সেই বিস্মিত-বিস্ময়কর প্রথম পাঠ, 'গল্পগুচ্ছ'-'নষ্টনীড়ে'র আবির্ভাব অবিস্মরণীয়; যেহেতু তাঁর সেই 'গল্পগুচ্ছে'র

জগৎই মোটামুটি ভাবে কতকাংশে তাঁর ও বহুলাংশে শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক জগৎ। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন :

অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল
... ...
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার...

বলা বাহুল্য সংসারের দশদিক-জোড়া এই ক্ষণ-হাসি ক্ষণ-অশ্রুর মেলায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পদক্ষেপটি করেছিলেন—উপরোক্ত রোহিণীঘটিত মর্মস্পর্শ ছাড়াও তাঁর দৃষ্টিগুণেই আমরা 'অপরিস্ফুট কুন্দকুসুমে'র অকাল-বিশুষ্কতা দেখেছি এবং 'জগৎবাসিনী' জেবুন্নিসার 'অন্তরাত্মা'র আকস্মিক জাগরণও জেনেছি। কিন্তু এ-সমস্তই তাঁর অতন্দ্র অন্তরের বৃহত্তর সাধনায় যেতে যেতে প্রথম পথিক-পথিকৃতের মিতাস্বাদন। রবীন্দ্রনাথ সেই আস্বাদনক্ষমতাকে আরও ব্যক্ত, ব্যাপ্ত ও তীব্র ক'রে 'সংসারের ধূলিজালে' যে 'গীতরসধারা' সিঞ্চন ক'রে গেলেন তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র তরী থেকে তীর দেখায়, তাঁর 'নষ্টনীড়ে'র অন্তর্মোচনে, 'চোখের বালি'র চক্ষুষ্মানতায়—শরৎচন্দ্র তারই গভীর অবগাহনে নামলেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিস্তৃত 'অভিজ্ঞতা' ও 'সহানুভূতি'র (দীনবন্ধু-প্রসঙ্গে বঙ্গিমচন্দ্রই শব্দদুটির প্রথম সদ্ব্যবহার করেছিলেন) সমাজ-সাংসারিক সন্নিকটসম্পর্কে। এইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি স্বীকৃতি উদ্ধার করি : উক্ত সাংসারিক কথাকাহিনী-চলচ্চিত্রের গীতিকাব্যিক ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, তাঁর এই বিশ্বসংসার-পর্যবেক্ষণে 'নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘটঘটা, নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ'—বঙ্কিমের প্রতি সশ্রদ্ধ মৃদুশ্লেষই মনে হয়। পাশাপাশি-সম্পর্কিত করে দেখলে এই সূত্রে স্বতই মনে হবে, বঙ্কিমের কল্পনার প্রসার কালক্রমে রবীন্দ্রনাথে এসে কল্পনা ও সহানুভূতির গূঢ়ৈক্যে অন্বিত হয়েছে, পরবর্তী পুরুষ শরৎচন্দ্র গ্রাম্যজীবনের ও যৌথ-পারিবারিক জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ অধ্যয়নই সহানুভূতির গভীরতর তীক্ষ্ণ প্ররোচনায়, তীব্রগাঢ় স্বাঙ্গীকরণে আত্তীকরণে আত্মীয়তায় সুস্বাদ্য-সুপাচ্য ক'রে তুলেছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মনন-প্রবর্তনাকে, তদনুসারী বাঙালি-জীবনকেন্দ্রিক বিশ্ব-বিস্তৃত বিশাল উপলব্ধিকে প্রথম থেকেই তিনি বর্জন করেছেন, তাঁদের তর-তম ইনটেলেক্ট-প্রাবল্য তাঁর ইনস্টিংট-প্রাধান্যে পর্যবসিত, তাঁদের সূক্ষ্ম ভাবাদর্শপ্রাণিত মানবচরিত্রপাঠ

(রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন প্রায় সব উপন্যাস) তাঁর স্থূল-সূক্ষ্ম নরনারীচিত্তচিত্রনির্ভর স্বভাবানুসন্ধানেই নির্নিমেষ। এবং এজন্যেই তাঁর বঙ্কিমবিচারের ভ্রান্তি, এজন্যেই তাঁর উত্তররবীন্দ্র উপন্যাসে অনীহা, এমন-কি অবিচার, যেমন, তাঁর একটি চিঠিতে প্রকাশিত : 'যোগাযোগ বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্ধর্ষ প্রবল পরাক্রান্ত মধুস্থদনের সঙ্গে তার টাগ-অফ-ওয়ারের শেষ হবে কী ক'রে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে।' উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি বিশেষত লক্ষণীয়। কী অযৌক্তিক আবদ্ধমন স্থূল 'মীমাংসা'! এখানে মৃত্যুর বৎসরে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত একটি শরৎচন্দ্র-বিষয়ক রচনার ঘনিষ্ঠসাক্ষ্য বিশ্লেষণ (শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়-কৃত) খুবই প্রাসঙ্গিক মনে করি : "শরৎচন্দ্রের ইনটেলেকচুয়াল জীবনেও···যেন একটা গ্রাম্যতা ছিল। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করবার সময় মনে হত, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন উদার ও গভীর, দৃষ্টির প্রসার তেমন ছিল না।···আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক দেশে আগেকার দিনে এবং পল্লীতে পল্লীতে সত্যিকার প্রতিভাবান মানুষের অভাব নেই। আধুনিক যুগে বাংলায় যেসব মনীষী জীবনের নানা দিকে অমর হয়ে আছেন তাঁদের অনেকেই অবশ্য গ্রামের লোক ছিলেন। কিন্তু গড়পড়তা গ্রামের লোক বলতে যাদের বোঝা যায় তাদের একটি চারিত্রিকতা এই যে, তাদের দৃষ্টির বিস্তৃতি নেই—তাদের বিচার্য বস্তু এবং বিচারের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। জীবনের সঙ্গে নিতান্ত সোজাসুজি যোগ যার আছে এমন সব প্রশ্ন ছাড়া অন্যকিছুতে তাদের বিশেষ অনুরাগ থাকে না। তাছাড়া, যদিবা দূরের কোন প্রশ্নের মীমাংসা করতে চায়, তাকে একটা বিস্তৃত ভিত্তির উপর রেখে বিচার করতে পারে না। শরৎচন্দ্রের মধ্যে এই ধরনের একটা ভাব ছিল। শিল্পী হিসাবে তাঁর প্রতিভা ছিল অসামান্য, কিন্তু সেই অনুপাতে মানুষ শরৎচন্দ্রের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং অনুরাগের ক্ষেত্র খুব ব্যাপক ছিল না। মনে হয় যেন পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে ভাবতে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন না। আবার যা নিতান্ত আমাদের সমাজের বা দেশের সমস্যা তা তিনি খুব ভাবতেন বটে,- কিন্তু সেই সমস্যাকে যতদূর পারতেন সঙ্কীর্ণ পটভূমির উপর রেখে বিচার করতে চেষ্টা করতেন। অবশ্য এর জন্য তাঁর শিল্পীজীবনের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ, ঔপন্যাসিকের সাফল্য নির্ভর করে জীবনের সঙ্গে গভীর এবং নিবিড় পরিচয়ের উপর। বাঙালির সঙ্কীর্ণ জীবনের যেটুকু তিনি দেখেছিলেন, তা গভীর এবং নিবিড়ভাবে দেখেছিলেন। কিন্তু তাই মানব-জীবনের সবটুকু নয়। একথা সত্য, কোন মানুষের ভাগ্যেই পুরো মানব-জীবনের সঙ্গে পরিচয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক

প্রতিভাবান কথাশিল্পী সুদূরপ্রসারী কল্পনার সাহায্যে নিজের-দেখা জীবনের বাইরের ক্ষেত্রের সঙ্গেও পরিচয় করতে পেরেছেন, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিল্পী শরৎচন্দ্রের কল্পনার প্রখর দীপ্তি নিজের দেখা জগতের মধ্যেই অপরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।" তাঁর এই মৌলিক গ্রাম্যতার জন্যেই পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনে সাধ্যমত সুশিক্ষিত ও অবহিত হয়েও তিনি তাঁর একলক্ষ্যে বিচলিত হননি, বিমুখ হননি তাঁর গ্রাম ও গ্রাম্য স্মৃতি থেকে, বাল্যকৈশোরের পল্লীসীমিত ও পশ্চিমপ্রবাসের typical বাঙালি-জীবনকেন্দ্রিক তাঁর অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা থেকে—সেই 'শ্রীকান্ত'-ধৃত 'স্মৃত-বিস্মৃত' ঘটনার মালাই তাঁর জীবনযাত্রা, সেই পল্লীবাংলা, ভাগলপুর, পশ্চিম-ভারত (প্রায়শই জব্বলপুর, এলাহাবাদ ইত্যাদি উত্তরপ্রদেশ) এবং বর্মামুলুক। আর এই অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত সাধারণ মানুষের 'elemental' সুখদুঃখস্বাদ ও নবপিপাসা, পুনর্নিবৃত্তি, মূলগত দেহমনের সংস্কার, তার তাপ, তারল্য ও বাষ্প, রক্তশিরার অনুরাগ, স্নেহমায়ামমতার অশ্রু, সংসারজড়িত বৈরাগ্য—এই তাঁর মানসিক জীবন। অর্থাৎ পূর্বোদ্ধৃত 'গড়পড়তা' লোক'জীবনের সঙ্গে নিতান্ত সোজাসুজি যোগ'-অভ্যস্ত সীমিত মানবিকতা। আর মনে রাখা দরকার যে, 'শ্রীকান্ত'-রচনার প্রৌঢ়তায়ই শ্রীকান্তের মতো শরৎচন্দ্রেরও সাহিত্যিক সূচনা, তাঁর নিজের কথায়, 'হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবি শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে।' কিন্তু দেখবার পালা শুরু হয়েছে। এই প্রৌঢ়ি পর্যন্ত তাঁর বিশিষ্ট 'স্মৃতবিস্মৃত' ঘটনায় 'নীরবে নিভৃতে' বয়ঃবৃদ্ধিপ্রাপ্ত শান্ত মনের দৃষ্টিপাত, প্রাচীন ক্ষতাক্ততায় নব'রঞ্জন'রশ্মির বীক্ষণ—বস্তুত এ-দেখা ও জানায় সেই পুরাতন কৈশোরক দেখা ও জানার পুনর্জীবন, অথচ এ-দেখা ও জানা সীমাসঙ্কীর্ণ বলেই সুআলোকিত, একাগ্র হলেও তা পূর্বপ্রত্যক্ষেরই পরোক্ষপাঠ। সমস্ত মিলিয়ে এ-প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়ট ব্যবহার্য মনে হয় (কবির ক্ষেত্রে তাঁর মূল প্রয়োগ সত্ত্বেও) : It is a concentration, and a new thing resulting from the concentration, of a very great number of experiences which to the practical and active person would not seem to be experiences at all ; it is a concentration which does not happen consciously or of deliberation. These experiences are not "recollected", and they finally unite in an atmoshphere which is tranquil only in that it is a passive attending upon

the event.' তাই বুঝি শরৎচন্দ্র অক্লেশে বলতে পেরেছেন, 'আমাকে প্লটের জন্যে কখনও ভাবতে হয় না'। এবং তার কারণকার্যনির্ণয়ে : "আমার বক্তব্যটা আগে যে আমি ঠিক ক'রে নিই, তারপর কোন্ কোন্ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তা ফোটাব সেটা স্থির করি। তখন কাহিনী আপনিই এসে যায়। অনেকে নাকি আগাগোড়া কাহিনীটা না ভেবে লিখতে পারে না। কিন্তু চরিত্র তো কাহিনীর বশে যাবে না, কাহিনীকেই চরিত্রের বশে যেতে হবে।" (দ্র° অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল লিখিত 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা')। বিশেষত রক্তমাংসে জীবন্ত, মায়ামোহে জাগ্রত, অশ্রুরসে আর্ত-আর্দ্র সাধারণ মানুষের ছবিই যিনি আজন্ম দেখেছেন, পর ও আত্মজীবন উভয়ত, তাঁর পক্ষে এ-উক্তি খুবই সত্যসন্ধ মনে হয়। তাঁর আঁকা চরিত্র তাই কাহিনীর বশে যেমন যায় না, সমাজ ও শাস্ত্রধর্মের বশে যেতেও নারাজ হয়। শরৎচন্দ্র অবশ্য সময়-স্বভাববশেই কালাপাহাড়ী বা বিদ্রোহী ছিলেন না—এ-জন্যে 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও তৎপরবর্তীকালের 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'অরণি' প্রভৃতির অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাদের। তবে তিনি এটুকু বলেছিলেন, 'সমাজকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি নে'। অথচ তিনি দেবতা-ঈশ্বর-অন্তর্যামীকে খুবই মানেন; তবে মানুষকে নিতান্তই মানুষ বলে সবিশেষ মানেন, 'মৌলিক' মানুষ বলে; তাই তাঁর পক্ষে সেই মানুষের গভীরে ডুব দিয়ে তার আকাশপাতালসন্ধানে কোন কার্পণ্য বা কুণ্ঠা দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের হাতে অব্যর্থ উপকরণ দুটি, একনিষ্ঠ নিকটলক্ষ্যদৃষ্টি ও গভীরসন্ধানী শরক্ষেপ। মোহিতলাল এজন্যেই তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'তিনি জীবনকে খুব বিস্তৃত করিয়া দেখেন নাই, কিন্তু যেটুকু দেখিয়াছেন গভীর করিয়া দেখিয়াছেন—সে-গভীরতা ততটা কল্পনার নয়, যতটা অনুভূতির। এই সহানুভূতি যেখানে যতটুকু পৌছিতে পারিয়াছে ততটুকুই তাঁহার প্রসার। সমাজ যে পাপে জর্জরিত হইয়াও তাহাকে স্বীকার করে না—আত্মঘাতীর সেই ব্যথাকে শরৎচন্দ্র হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত করিয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছেন বিনা-সঙ্কোচে তাহার সবটুকুই প্রকাশ করিয়াছেন; সবটুকু প্রকাশ না করিলে যে সে-ব্যথার পরিমাপ করা যাইবে না। অসহায় শক্তিহীন সমাজের এই ব্যথাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদেরই মত অসহায়ভাবে তিনি নিজেও সেই ব্যথা ভোগ করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা অনেক ভাবনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও বিচার করিতে বসেন নাই। তিনি দুঃখের কোন দার্শনিক মীমাংসা করিতে চাহেন নাই, তার বাস্তব রূপটি ধ্যান করিয়াছেন; চোখে দেখা এবং গভীর করিয়া অনুভব করা—ইহাই হইল তাঁহার কল্পনার উৎস।'

এই উদ্ধৃতির অব্যবহিত পূর্বেকার আমাদেরই উক্তিসূত্রে তাই শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক কৃতিত্বে আমার তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের কীর্তিকথাই বারবার মনে পড়ে। তিনি লক্ষ্যভেদকালে পক্ষীর চক্ষুমাত্রই দেখেছিলেন এবং পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যায় পাতালের ভোগবতী থেকে পানীয় জল টেনে এনেছিলেন। শরৎচন্দ্রও তাঁর 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন' 'গৃহদাহ'র প্রোথিত মৃন্ময় জগৎ থেকে 'কপালকুণ্ডলা' 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষা'দি, ও 'আনন্দমঠ'-'রাজসিংহে'র উদাত্ত উধাও আকাশে রসাতলের জলতর্পণ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনের নাটক ও নাটকের জীবন যাদের নিয়ে তাদের তিনি দূরবীক্ষণে দেখেন নি, তাই আপন রুচি ও প্রয়োজনমত সন্নিহিত আলোকপাত ঘটিয়ে বিক্ষত স্থানটিকেই নির্ভুল লক্ষ্য করেছেন, আবার সেই সঙ্গে মুমূর্ষু সমাজের তৃষানিবৃত্তি করেছেন তিনি তাঁর গভীর হৃদয়-উৎস থেকেই—পঙ্গু পণ্ড সমাজকে আপন শরে জর্জরিত করেও নিগূঢ় সমবেদনায় তারই ওষ্ঠে অন্তস্তলের রসপান করিয়ে দিয়েছেন। একইসঙ্গে শল্যচিকিৎসা ও শুশ্রূষার মনোভাব তাঁর ছিল বলেই শরৎচন্দ্রের সেই বিরল জনপ্রিয়তা, আর সে-প্রসঙ্গে তাঁর শেষকথা হয়তো সেই 'পুরস্কৃত' কবির মানুষী-ভাগ্যভাবনা ও মর্ত্যমুক্তিকালীন বাসনা-বিকাশেই মিলে মিশে আছে :

কত সুখ ছিল হয়ে গেছে দুখ ;
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,
ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালোবাসা।
... ...
সংসারমাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা কার দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে, নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

নইলে 'পল্লীসমাজে'র অন্ধকার অবক্ষয়ে রমা-রমেশের অপচয়-বেদনার পাশে এবং পরিবর্তে রমেশের আত্মত্যাগই তাঁর অধিক বরণীয় মনে হবে কেন। সেই উপলক্ষে বিশ্বেশ্বরীর সেই আলো-জেলে-দেওয়ার সঞ্জীবনমন্ত্রই বা অতো সাড়ম্বরে নিবেদিত

হবে কেন—যে-বিশ্বেশ্বরী তাঁর নিজেরই কথায়, সব সত্ত্বেও, সেই অন্ধ-পল্লীচূড়ারূঢ় নির্মম বেণী ঘোষালের মা ? অথবা দেবদাসের সেই শোচনীয় অপমৃত্যু ! গোরুর গাড়িতে করে রোহিণীর শব-চালানে যাঁর আপত্তি, তিনি দেবদাসের জন্যে নতুন সৎকার যা করেছেন, সে তো কেবল তাঁর ব্যাকুল হাহাকার : "তোমরা যে কেহ এই কাহিনী পড়িবে, হয়তো আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু কখনও যদি দেবদাসের মত হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও আর যাহাই হউক যেন তাহার মতো এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে-সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ-জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া মরিতে পারে।" সেই পূর্বোক্ত "balance"-এর "sacrifice", "for the sake of intense effects" ; সেই তাঁর "repeating himself to excess"—ভাবালুতা নিশ্চিত, কিন্তু ততোধিক আপোষ। সামাজিক-নীতিরক্ষীর উচ্চারণে তিনি দেবদাসকে যেমন "অসংযমী" "পাপিষ্ঠ" রূপে ঘোষণা করেছেন, তেমনই তার জন্য ঘন ঘন ব্যবস্থা দিয়েছেন 'স্নেহকরস্পর্শ', 'করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ' ও 'এক ফোঁটা চোখের জলে'র। অবশ্য এই ব্যবস্থাকে তিনি দেবদাসের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্ভব করে তোলেননি, মাত্র প্রার্থনা করেছেন, যেন তা সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই পরজন্মে ; হয়তো পরকালের সাহিত্যিক আন্দোলনে ও অভিনিবেশে। কেবল তাঁর অপরিণত রচনা 'দেবদাসে' নয়, 'গৃহদাহে'র মত সুলিখিত সুপরিণত জীবন-ভাষ্যেও তিনি এই অপোষকে উত্তীর্ণ হতে পারেননি—এ তাঁর স্বভাবেই ছিল। নইলে যে-সুরেশ 'এক দুর্যোগের রাত্রির দুরতিক্রম্য অভিশাপে (অচলাকে) চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে', যে সহজেই জানত ('যেহেতু সে নাস্তিক, সে আত্মা মানে না'), "ওই সুন্দর দেহটাকে দখল করার মধ্যেই তাহার পাওয়াটা আপনা আপনিই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে", সে কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন গহীনাগ্রহী প্রায়-আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ করল।—"শিশিরবিন্দু মুঠার মধ্যে যে কি করিয়া এক ফোঁটা জলের মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠে অচলার পানে চাহিয়া চাহিয়া সে কেবল এই সত্যটাই দেখিতে লাগিল। হায় রে, পল্লবপ্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া ?" শরৎচন্দ্র বৈশিষ্ট্যবান এজন্যে যে, 'he takes up his stand with the prophets of sentiment (বুদ্ধদেব বসু sentimentalityও বলেছেন) against the harder advocates of rationalism. In other

respects, his temperament holds him aloof from their mystic exaltation." (ডিকেন্স সম্পর্কে কাজামিআঁ)। কিন্তু এখানে সমস্যাসঙ্কটের মুখে তাঁর এ কী রূপ! উদ্ধৃত অংশটির প্রথম বাক্যে সুরেশের সত্যদর্শনে তার স্বতঃস্ফূর্ত-রীতিমতো ভোগবাদী 'rationalism', দ্বিতীয় বাক্যে যেন চেষ্টারোপিত ত্যাগধর্মী 'mysticism'! অথচ শরৎচন্দ্র সচরাচর সমাজরক্ষীদের থেকে বাস্তবিকই স্বতন্ত্র। কিন্তু তিনি মহাস্ববিরোধে আচ্ছন্ন ছিলেন, এখানে সুরেশের অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তর্লীন বিরোধ তার নয়, তাঁরই বিরোধ, আপোষের স্পৃহাশীল, ব্যক্তিক বেদনা ও সামাজিক অনুশোচনা তাই একসঙ্গে এককণ্ঠেই এভাবে হঠাৎ-উচ্চারিত।—প্রস্তুতি-পারম্পর্যহীন! অথচ শরৎচন্দ্রে সমাজ-নীতির প্রশ্ন যেখানে খুব জটিল ও উত্তুঙ্গ নয়, সেখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিকতা ও বাস্তববর্ণনার প্রাণকম্পন অনন্য। বস্তুত তাঁর সূক্ষ্মসন্ধানী দৃষ্টি-দর্শনের চেয়েও তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনানুভব, তাঁর বাণীবিন্যাসনৈপুণ্য অনেক বেশি মায়ামাধুর্যপূর্ণ, সম্মোহনকারী—যেন ললিত লাবণ্যময় চিত্তোদ্বেল বাক্‌নির্মিতি, আন্তরিক স্বাভাবিক সংলাপের ব্যাকুল বিন্যাস এবং মোহন-প্রাণবন্ত চিত্রচরিত্ররচনার জাদুই তাঁর নিজস্বের সত্য পরিচয়। এখানে তাই ডিকেন্স প্রসঙ্গে কাজামিআঁ পুনরায় স্মরণীয় : "In his calmer and less feverish spells of work, this gift of infusing with life all that appeals to the senses has the happiest results. He calls up before our eyes scene after scene of a truth made striking, and which yet our feeling of normal life is willing to accept : so accurately is the individual character of things thrown into relief, and so much realistic flavour is mixed up with the eloquence, the moving poetry, or the fanciful drollery, which are the main object and indeed the soul of the picture". আর এজন্যেই, : "Into this world no one can penetrate unless he has bowed to the artist's will; but such is the power of his charm that our critical faculty is disarmed. Few are the readers wholly proof against the spell." এখানে এসে তাই পুনরায় স্মরণ করতে হয় লরেন্সকে, তাঁর Studies in Classic Literature-এর The spirit of place অধ্যায়ে তিনি স্বকীয় তির্যকভঙ্গিতে বলেছেন : "Art speech is the only truth. An artist is usually a damned liar, but his art will tell you the truth of his day. And that

is all that matters. Away with eternal truth. Truth lives from day to day..." আমাদের আলোচনার পরবর্তী অংশে এ-উক্তির সমধিক সম্প্রসারিত প্রয়োগ আরও অর্থপূর্ণ হবে বলে আশা করি।

৩

"প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী, / মাধুর্যসুধায় ; ..."

এ-সত্য স্পষ্ট যে, শরৎচন্দ্রের প্রবাসীজীবনের নিঃসঙ্গ স্মৃতিচারণায় তাঁর আগামী-সফলস্রষ্টা জীবনের বহুল উপকরণ লালিত হয়েছে। আর সেই উপকরণসমষ্টির কেন্দ্রীয় উপাদান নারীত্ব সম্পর্কে তাঁর স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতা—রক্তনাড়ির সংস্কার—শ্রীকান্তের জবানবন্দীতে সেই তাঁর আত্মকথার মণিহার আমাদের গভীর মনঃসংযোগ দাবি করে, ইন্দ্রনাথের নমস্য দিদিকে দেখার পর : "আজ মনে ভাবি, আমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই। সেই দিনটিকে উপলক্ষ করিয়া যে-জিনিসটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারা জীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম? জীবনে এমন সব শুভ মুহূর্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত পরবর্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই! নাই যদি, তবে পথে-ঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্রের দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এসকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ ; যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর আগের মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটা অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার।"

যুক্তিহীন সাবেগবিশ্বাসী রক্তসংস্কারের স্পষ্টতম প্রতিচ্ছবি। মুক্তমন বিচার বা যুক্তিযুক্ত দর্শনের স্পর্শলেশহীন এই ভাবাকুল বিবৃতির মধ্যে শরৎচন্দ্রের আরও ক'টি চরিত্রলক্ষণ প্রতিফলিত। যথা : তাঁর একগুঁয়ে গ্রাম্যতা, তথা একপেশে সীমাবদ্ধতা। তিনি তাঁর ভাবাতিশয্যে নিশ্চিত জানেন যে, 'সেই দিনটিকে উপলক্ষ করিয়া যে-জিনিসটি' তিনি দেখে নিয়েছিলেন, 'সারাজীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে'; সুতরাং ভবঘুরে-স্বভাবের

হয়েও সতর্কসচেতন পৃথিবী-পরিক্রমার বৈচিত্র্যপ্রবণ সার্বভৌম-আধুনিক-নাগরিকতায় কোন কাজ নেই, সেই একটি 'শুভ মুহূর্তে'র 'ছাঁচেই সমস্ত পরবর্তী জীবন' যখন গড়ে উঠতে পারে! তাঁর তাইই গড়ে উঠেছিল। আর সেই গঠনকালে তিনি শাণিত মার্জিত বুদ্ধি-যুক্তির কোন তোয়াক্কা-না ক'রে, কোন ক্ষুরধার তর্কবিতর্কে না ডুবে, সেই একটি স্নিগ্ধ সত্যে তাঁর দেহমনপ্রাণ ("whole man alive") সমর্পণ করেছিলেন, তা হলো: "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে অনেক বড়ো"—এই ঐকসত্য-পরিতৃপ্ত প্রবাসীজীবন তাই তাঁর বঙ্কিমী রোহিণী-বিভ্রম, রাবীন্দ্রিক বিনোদিনী-বিস্ময় একাকার করে তাঁকে স্বীয় সৃষ্টিসুখের উল্লাসে অনুপ্রেরিত করেছে—তাঁর আকৈশোর মুখ্য অভিজ্ঞতা নারীরাই সেখানে তাঁর মূল সহায় ও সান্নিধ্য—সবচেয়ে বড়ো সেই দুটি রমণী, যাঁদের একজনের জন্যে দেশত্যাগ ও অন্যজনের জন্যে পলাতক ভবঘুরে জীবন তিনি আবশ্যক মনে করেছিলেন—একজন ছিলেন মাধবী প্রভৃতি বাল্যবিধবা-দুঃখিনীদের আত্মপ্রতারণা-মূর্তির বাস্তব আদল, অন্যজন কিরণময়ীর প্রাথমিক ছাঁচ, উভয়ের সঙ্গেই শরৎচন্দ্র যথাক্রমে ভাগলপুরে ও দেবানন্দপুরে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে প্রথমজন নিরুপমা দেবী, যাঁর কথা সবিস্তারে রাধারানী দেবী তাঁর 'শরৎচন্দ্র: মানুষ এবং শিল্পে' বিবৃত করেছেন। তাই রাধারানীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি. 'তোমাদের মত কবিকল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটা ফোঁটা গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে-অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি…'। এবং অন্যজনের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'দিবাকরের মধ্যে দেবানন্দপুরের বয়ঃসন্ধির শরৎচন্দ্রকে দেখি যে তার সম্পর্কিত বৌদি কিরণশশীর রূপে মুগ্ধ হয়ে পুরী পলায়ন করেছিল; দেখি, প্রথম সর্বহারা যুবক শরৎচন্দ্রের মনের বেদনাকে- যে তার স্বদেশ সমাজ পরিজন সবকিছু থেকে নির্মমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূর প্রবাসে চলেছিল।' (দ্র° চরিত্রহীন ও আধুনিকতা, দীপ্তি ত্রিপাঠী, শরৎতর্পণ)। তবুও শরৎচন্দ্রের প্রবাসযাত্রা ও বর্মায় দীর্ঘস্থায়িত্ব কিরণশশী-ঘটিত বাসনা-আসক্তির থেকে যত না মুক্তি, ততোধিক তাঁর প্রতি নিরুপমার কঠোর নিষেধাজ্ঞার তর্জনী: শরৎচন্দ্র যেন দূরে চলে যান, দূরেদূরেই থাকেন। তিনি তাই ছিলেন বহুবছর, দীর্ঘকাল, বন্ধনমুক্তির দীর্ণতায়—নিঃসঙ্গতার নিঃস্বতায় নয়, সেই নারীসঙ্গ-স্মৃতিপ্রবাহের সৃজনোচ্ছ্বাসে।

তাঁর নিঃসঙ্গ দরিদ্র প্রবাস-জীবনযাপনের মহৎ সুখ ছিল সেই নারীত্বের 'সঙ্গসুধারস' বা 'ইক্ষুর চর্বণ'। তারই প্রতিদানে না হোক, প্রতিবিধানে লিখলেন তিনি: 'নারীর মূল্য'। বঙ্কিম-রবীন্দ্র ছাড়া একদিকে হারবার্ট স্পেনসারের ভক্ত ছিলেন যেমন—অন্যদিকে টলস্টয়ের 'রেসারেকসনে'র মুগ্ধ পাঠক। আদ্যন্ত ওই প্রবন্ধসমষ্টিতে

তাই তথ্যসমৃদ্ধ তাঁর sociology-Ethics-Sex-Psychologyপাঠের যে বিচিত্র-বিশিষ্ট নমুনা ফুটে উঠেছে, তারও চেয়ে মূল্যবান সেখানে তাঁর ইতস্ততবিধৃত সহৃদয় সাহিত্যিকচিত্তের ভাবোদ্বেল অনুসিদ্ধান্ত, যেমন : '…সমাজ নারীর ভুলভ্রান্তি এক পাইও ক্ষমা করিবে না, পুরুষের ষোল আনাই ক্ষমা করিবে। হেতু ? হেতু শুধু গায়ের জোর। হেতু শুধু সমাজ অর্থে "পুরুষ", "নারী" নয় বলিয়া। পুরুষ (পদস্খলিত) নারীকে ঘৃণা করে। তাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নারীকে সে-অধিকার দেওয়া হয় নাই। (পদস্খলিত) পুরুষ যতই ঘৃণ্য হউক, সে স্বামী ! স্বামীকে ঘৃণা করিবে স্ত্রী কি করিয়া ? শাস্ত্র যে বলিতেছেন, তিনি যেমনই হউন না, সতী স্ত্রীর তিনি দেবতা। এবং এই দেবতাটির মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পদপঙ্কজ ক্রোড়ে করিয়া অনুগমন করা আবশ্যক। অন্ততঃ এ যুগে তাঁহারই পদপঙ্কজ স্মরণ করিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকাতেই যথার্থ নারীত্ব।' অথবা '…সংসারে ছোটখাটো সুখ-শান্তির মধ্যে থাকিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কি করিয়া সে মনে করিবে, এই স্বামী তাহার আন্তরিক মঙ্গল কামনা করে না ! পিতার কাছে দাঁড়াইয়া কি করিয়া সে ভাবিবে, এই পিতা তাহার মিত্র নহে ! বাস্তবিক পৃথকভাবে একটি একটি করিয়া দেখিলে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য, কিন্তু সমগ্রভাবে সমস্ত নারীজাতির সুখ-দুঃখের মঙ্গল-অমঙ্গলের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর সমস্ত হীনতার ফাঁকি এক মুহূর্তেই সূর্যের আলোর মত ফুটিয়া উঠে।" নারীর নবমূল্যায়নে এই যে তাঁর শ্লেষাত্মক হার্দ্য বিচারণা—সমগ্র-গ্রন্থভুক্ত নারীমেধযজ্ঞের এই যে সুলিখিত ইতিহাস, মনে হয়, এই যজ্ঞাগ্নিরই আহুতিরূপে একদিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, মৃণাল, কমললতা, অচলা, অন্নদাদিদিরা ; আরেকদিকে এই অগ্নি থেকেই যেন যাজ্ঞসেনীর বিভূতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে কিরণময়ী, অভয়া, কমল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধানত নারীত্বের এই আহুতি ও বিভূতিরূপই হরণ করেছে তাঁর হৃদয়-মেধার প্রায় সমস্ত সশ্রদ্ধ অনুভূতি, প্রাণের সমস্ত তাপ, দ্রবীভূত চিত্তের সমস্ত করুণা।

অবশ্য বলা বাহুল্য, নারীর আহুতিরূপই তাঁর সমগ্র সাহিত্যে প্রাচুর্য, মাধুর্য ও স্নিগ্ধতার লাবণ্য এনেছে। এবং অবসাদ। সে জননীরূপে জায়ারূপে কন্যারূপে প্রিয়ারূপে ভ্রষ্ট-নষ্ট সমাজ-সংসারের পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে, শেষে, প্রায়ই, ফলে উঠতে গিয়ে ঝরে গিয়েছে। যেহেতু শরৎচন্দ্রের জীবনে ও নাটকে জিজ্ঞাসাই প্রধান, সমাধানের চেয়ে সমস্যাই প্রখর, ব্যবহারিক সাফল্যের চেয়ে আন্তরিক বিফলতাবোধই প্রবল, তাই ঘুরে ঘুরে নারীত্বের কষ্টকর অবমাননার দিক, পুঞ্জীভূত দুঃখ ও গ্লানির দিক বার বার তাঁর বেদনার ধ্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে তাঁর চরম উক্তি বোধ হয় : 'সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবল প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না।' এবং অন্যত্র : 'একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক এক বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এসত্য বেঁচে থাকবে কোথায় ?' তাই এ-আলোকে : 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই', তাদের জন্য তাঁর হৃদয় ও লেখনী তিনি উদার-উন্মুক্ত করলেন। তাঁর প্রবাস-জীবনের নিভৃত আত্মপরিক্রমা তাঁকে এ-বিষয়ে সহযোগিতা করেছে সেই অনিবার্যতায়—বাংলাদেশের গ্রামকেন্দ্রিক নিরালোক সমাজসংসার প্রতিমূহূর্তে তাঁকে স্মৃতিরসসিক্ত সু-দুঃসহ সঙ্গ দিয়েছে—আর তার মূলীভূত শক্তিরূপিণীরা স্বতই তাঁদের স্থানীয় বাস্তবরূপে ও অন্তর্নিহিত সত্যরূপে দেখা দিয়েছেন বারবার, শোপেনহাওয়ার বুঝি এঁদের স্বরূপটিকেই আশ্চর্য আরতি করেছিলেন, তাঁর সচরাচর নারীবিদ্বেষীর বিপরীত দৃষ্টিতে : "She pays the debt of life not by what she does, but by what she suffers."। শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে নারীর এই sufferingই সমধিক মূল্য পেয়েছে। আর আমরা দেখতে পাই যে, তার এই suffering তার doing-এর সাথে সহজযোগ্য। এর মূল কারণ বুঝি বাঙালীর সামাজিক-পারিবারিক কাঠামো ও আচরণেই নিহিত। পুরুষ এখানে প্রায়ই নিষ্ক্রিয়, এমন কি হীনবল ; নারীই এখানে যা-কিছু করে ও করায়, অথচ নিয়তই তির্যক প্রতিধ্বনি ওঠে, 'অবলা কেন মা এত বলে'! বাঙালীর জীবনে ও ভাবাদর্শে নায়কচরিত্র দুটি : শ্মশানচারী ভস্মভূষণ শিব ও ধীরসমীরে যমুনাতীরে মৃদুবিহারী বনমালী। পার্বতী তাই যতই অন্নপূর্ণা, তাঁর সংসারে দারিদ্র্য কিছুতেই ঘোচে না, রাধারও সরোদন আরাধনার শেষ নেই। নিরক্ষর গাঁজাখোর নীলাম্বর তাই যেমন শরৎচন্দ্রের সমগ্র ঔপন্যাসিক অভিজ্ঞতায় একটি গৌণ ও প্রক্ষিপ্ত চরিত্রমাত্র নয়—তেমনি বিরাজবৌয়েরা তাদের সহস্র সুকৃতি দিয়েও তার ও অন্যের জীবনের দৈন্য-দুঃখ-অপচয় ঘুচিয়ে দিতে যে সঙ্গতকারণেই অক্ষম, তাও দেখা গেছে ঘন ঘন। তেমনি সাবিত্রীর ত্যাগ-তিতিক্ষা-সহিষ্ণুতা যতো বড়ো করেই আমরা দেখি, বাঙালী বনমালীবৎ স্নেহপ্রেমদাক্ষিণ্যে উদার ভাবালু সতীশের নির্দায় বাউণ্ডুলে মধুর মনোভাব আমাদের শেষ পর্যন্ত নিরুপায় বেদনায়-বিস্ময়ে মূক করে রাখে। অথচ তাদের স্বভাব মূলত পীড়নকারীর। স্বয়ং শরৎচন্দ্রের প্রাবন্ধিক বিশ্লেষণে : '...এদেশের পুরুষ, যে নিজে কাপুরুষ ও ভীরু, অন্যান্য দেশের পুরুষের তুলনায় যে নারীর মতই নিরুপায়, যে নারীর কাছে পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যথার্থ ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, সে কাপুরুষের মত তাহার অপেক্ষা দুর্বল ও নিরুপায়কেই পীড়ন করিয়া কর্তৃত্ব করার আনন্দ উপলব্ধি করিতে চাহিবে, তাহা

স্বভাববিরুদ্ধ নহে।' (নারীর মূল্য)। আর এইসব প্রায়শ দুর্বল পুরুষপুত্তলের চোখে যখন অশ্রু গড়ায়, তখন অকপট অনুকম্পায় ও স্নিগ্ধতায় প্রপীড়িত সে-নারীই এসে তা সগৌরবে মুছিয়ে দেয়। এই ধিকৃত জীবনের সত্যছবি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র একাগ্র অভিনিবেশে লক্ষ্য করে তা তাঁর মায়ামোহমদির রসার্দ্র তুলিকার সুকোমল লালিত্যে অতীব লক্ষণীয় করে তুলেছেন—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেটাই: তিনি 'বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন'।—সেই পুরুষের নিঃসহায় বয়স্কবালকসুলভ পীড়নের ছবি, আর নারীর রসরহস্যোদ্বেল প্রপীড়িত দুঃখমূর্তি।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে দু'চারটি দুর্লভ কিশোরের চরিত্র ফুটিয়েছিলেন, যেমন, রামলাল ও ইন্দ্রনাথ—তাদের শরীর যেমন ক্ষিপ্র ও বলিষ্ঠ, মনও দুঃসাহসী। প্রত্যক্ষত তাদের পরবর্তী পরিণতরূপ আর আমরা পাই না; কিন্তু বয়োপরিণত তাঁর অন্য নায়কেরা শারীরিক বলিষ্ঠতা রক্ষা ক'রে, দুঃসাহসে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়েও, অত্যাবশ্যক মানসিক-আত্মিক শক্তিতে কখনো সেই বেগ বা বলের লক্ষণ দেখায় না, যা নইলে 'পুরুষ' পুরুষ নয়, আর যেজন্যে সেই-পুরুষপ্রধান সংসার-সমাজে নিষ্ফল নৈরাজ্যের বেদনা অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। তাঁর উপন্যাসে এই নরনারী-নির্বিশেষ অপচয়ের ছবি তাই এতই প্রাণবন্ত। এর সবচেয়ে শিল্প-গুণান্বিত রূপ বোধহয় গৃহদাহের সুরেশ। অনেক উজ্জ্বল উদারতা ও বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও সে তার অবসন্ন অপমৃত্যু ডেকে আনল তার অত্যধিক অসংযমে, দেহাত্মিক দুর্বলতায়, বিশেষত দ্বিধাদীর্ণ নারীর জন্যে প্রায়-নারীসুলভ ভাবাবেগে। দিবাকর ও সতীশ তো অন্যের ক্রীড়নক, বিপ্রদাস অর্থহীন, এমন-কি সেই দুর্মর দুশ্চরিত্র জীবানন্দও শেষাবধি তার স্বহস্তনিপীড়িত নারীর খেয়াতেই পরপারের ছবি দেখে। আর যে-চারটি তথাপি-বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম তাঁর সৃষ্ট পুরুষ-শোভাযাত্রায় চোখে পড়ে, যেমন রমেশ, উপেন্দ্র, রাজেন ও সব্যসাচী—তাঁরা সবাই কোন-না-কোন কঠোর আদর্শবাদের ছাঁচেঢালা আলোকোজ্জ্বল, সেজন্যেই বুঝি একপেশে এবং স্থানে স্থানে জড়যন্ত্রবৎ অত্যাশাবাদী, মাত্রাতিক্রমী, মারাত্মক-ব্যর্থ বা আত্মঘাতপ্রবণ। এখানেও শরৎচন্দ্র তাঁর বাস্তবজ্ঞানের সঠিক পরিচয়ই দিলেন। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ঔপন্যাসিক ইতিহাসে বৃহৎ ও মহৎ কোন আদর্শনিষ্ঠা ছাড়া পুরুষচরিত্রের সত্যকার ঋজুরূপ, আভ্যন্তরীণ শক্তিমূর্তি প্রায়-অদৃশ্য। নিছক সামাজিক-পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে বাঙালীর পুরুষ-চরিত্রে তবে কি গৌরব করার কিছুই ছিল না কোনদিন? বঙ্কিমচন্দ্রেও দেখি, আদর্শনিষ্ঠ পুরুষেরাই যা-কিছু সক্রিয় কীর্তি ও কৃতিত্বের পরিচায়ক—প্রতাপ, সীতারাম (যতদিন তাঁর চারিত্রিক ত্রুটি অপ্রকাশ)—পারিবারিক

প্রতিচিত্রে ব্রজেশ্বর অতিদুর্বল, নবকুমার বৃথাভিমানী, নগেন্দ্রনাথ চিন্তাপ্রৌঢ় কিন্তু হ্যুব্জ, গোবিন্দলাল পাপিষ্ঠ 'বালক'মাত্র। রবীন্দ্রনাথের গোরা নিখিলেশ প্রভৃতি ব্যতিক্রমগুলিও আদর্শনিষ্ঠ পৌরুষেরই বর্ণময় বর্ণনা। একমাত্র বাস্তবোচিত ব্যতিক্রম তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন 'চোখের বালি'র বিহারী ও 'গোরা'র বিনয় চরিত্রে। তবে তাঁর সেকালীন বুদ্ধির অনিশ্চয়তায় প্রথমক্ষেত্রে উপসংহারের অতি-নাটকে ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গোরার প্রতি গৌরব-মনোযোগে তারা খণ্ডিত-অসম্পূর্ণ রইল। তাছাড়া অতিদুর্বল মহেন্দ্রের পাশে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবেই যেন বিহারীকে খুব বেশী উন্নত ও ঋজু দেখানোয় সমাপনী অসামঞ্জস্যের অপঘাত আরো বাজে; যেমন সার্থক ভাববাদী সূক্ষ্ম নিখিলেশের পাশে দেখি বিকল-বস্তুবাদী অতিস্থূল সন্দীপকে অসহ্যপ্রায়, অসঙ্গত 'কনট্রাস্ট'। কিন্তু সে তো আরোপিত প্রদর্শন, স্বতঃপ্রস্ফুটন নয়। অন্যদিকে মধুসূদনের মেরুদণ্ড আত্মিক বলের উদাহরণ নয়, অমিত রায়ের শক্তিও তার চকিত চমৎকার বাকবৈদগ্ধ্য মাত্র। এ-অবস্থায় বাংলা উপন্যাসের তৃতীয় পুরুষ শরৎচন্দ্র, বিশেষত তিনি স্বয়ং ভবঘুরে-স্বভাবের, গ্রাম্যগুণান্বিত, সমাজসংসারের দায়ভারহীন, ভাবপ্রবণ—তাঁর পুরুষদের বেলায় সার্থক সমন্বয়িত কোন স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি ঋজুতার সন্ধান তিনি করেননি। করলেও কী জানি, আমাদের জাতীয় চরিত্রে কী আছে, তিনি বুঝি ব্যর্থই হতেন।

পাশাপাশি অন্নদাদিকে দেখামাত্রই শ্রীকান্তর মনে হয়েছিল, 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি'। যদিও এই বহ্নিরূপিণী নারীসত্তার পরিণতি অস্পষ্ট, ধূমাচ্ছন্ন ও অতিবাষ্পীয়। অথর্ব-অবুঝ পুরুষ-অনুশাসিত সংসারসমাজের বহ্নিতে সে অসহায় আহুতি, অনেকটা বাধ্যতনিরুপায় সতীদাহের যেন বলি; কিন্তু যে তা নয়, হতে চায়নি, প্রতিবাদ করেছে, বিদ্রোহ করেছে, সেই বিভূতিস্বরূপিণী কিরণময়ীও যে শেষপর্যন্ত তা-ই, এবং কেন, এ-বিষয়টা বারবার ভেবে দেখা দরকার। শরৎচন্দ্রের প্রায় যাবতীয় নারীচরিত্রের ব্যর্থ প্রেম ও জীবনযাত্রার মৌল দায়িত্ব যে তাদের অন্তর্নিহিত জন্মসংস্কারের, প্রাপ্ত সতীত্বধারণার, শরৎচন্দ্র এ-ব্যাপারটা সুন্দর করে মিশিয়েছেন। যেমন, সাবিত্রীর আত্মত্যাগে আদৌ তার দেহকুসংস্কারই সক্রিয়, এমনকি ষোড়শী-অলকার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, অপরাহ্নের অবসাদগ্রস্ত সেই প্রতিষ্ঠা, একই অভিজ্ঞতা হয় আমাদের। কিন্তু কিরণময়ী দেখি একেবারেই অকপট, সর্ব-সংস্কারমুক্ত; অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে তার কামাভিনয় অথবা দিবাকরের সঙ্গে তার স্থানচ্যুত সহবাস যে একান্ত তারই অবদমিত-অবমানিত কামনাবাসনা ও তির্যকপথগামী উপবাসী বয়সের রূপরস-সচেতন পুরুষ-সঙ্গলিপ্সার বাধ্য বিপর্যয় নিঃসন্দেহ। এবং সেখানে তার প্রথমদিকে কোন দ্বিধা-বাধা নেই, তাই কোন প্রচ্ছন্ন সংগ্রামও নেই,—সে-দ্বন্দ্বসংঘাত, সে-সংগ্রাম তার পরবর্তী,

অন্যত্র; উপেন্দ্র যে তার সত্য প্রেমকে প্রত্যাখ্যান ও অশ্রদ্ধা করেছে, সেই ব্যর্থপ্রেমপাত্র-ঘটিত অন্তর্দাহের চরম লাঞ্ছনায় তা প্রোথিত। একদিকে তাব প্রচণ্ড প্রেমার্তি, অন্যদিকে নারী-রূপযৌবনের মৌল মূল্যবোধ—এই দুই প্রদেশের মধ্যে কোন শক্ত সেতুবন্ধ তার ভাগ্যে ঘটেনি, তাই প্রতিহিংসার বিপর্যয়। এ যেমন সত্য, তেমনি যে সে তার অনন্যস্বভাববশত কোন সচরাচর সমাজতোষক আপোষে তুষ্ট হতে চায়নি, হয়নি, সেজন্যেও তাকে ভীষণ মূল্য দিতে হয়েছে কঠোর কপট সমাজেরই পায়ে—তথা তার সংরক্ষণশীলতার পাষাণ-প্রতিনিধি সেই উপেন্দ্রেরই উদ্দেশ্যে, তার মহার্ঘ জীবনযৌবন-বুদ্ধি-বিচক্ষণতা-সম্মান সব—মহাজুয়ার বাজি রেখে, গুনে-গুনে। অভয়াও নীরব আপোষ চায়নি, কিন্তু তার মধ্যে শর্তাধীন আপোষের স্পৃহা ছিল, বর্মায় গিয়ে রোহিণীকে ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণে তারই ছবি। কমল যে বিদেশী খৃস্টানের ঔরসজাত, সেজন্যে তার মধ্যে সেই বিশেষ রক্তবাহিত ক্ষণআনন্দবাদের বিশ্বাস সে সর্বদা লালন করেছে, আপোষের প্রশ্ন নেই, তাই তার সম্পূর্ণতা আছে, এবং তার পরিণাম অন্য শরৎ-নায়িকাদের মত অবসন্ন, খণ্ডিত বা দুঃখ-সমাপ্ত নয়। একমাত্র 'শেষপ্রশ্নে'ই শরৎচন্দ্র বাঙালিস্বভাবের স্থিতিবাদ ও সেই সমাজের যৌথ-পারিবারিক শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত আপোষের প্রভাব এড়াতে পেরেছিলেন—তাই তর্কে স্নিগ্ধতায় পরিহাসে কমল যেমন চিরতৎপর গতিশীল, শেষপ্রশ্নের পরিণামও সেই চলার ভাষাতেই চঞ্চল—রাজেনের হঠকারী মৃত্যুতে তা সাময়িক ভারাক্রান্ত, কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ নয়, স্তব্ধ নয়। কমলের মুক্তপক্ষ স্বভাবই তার ও অন্যের বন্ধনমোচনের মূল। কিন্তু কিরণময়ীর মধ্যে এ-মুক্তিতন্ত্র আশাতীত, তাই তার যে-দাহ ছিল, দাহিকাপ্রবৃত্তি ছিল, তাতেই সে তার বিভূতিসত্ত্বেও ভস্মসাৎ হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোহিণীই যেন বিংশ শতাব্দীতে এসে কিরণময়ী। এবং তাদের অপমৃত্যু চরম অপচয় ও সর্বনাশে স্বয়ং তাদের ভূমিকা যতখানি, তার চেয়ে তাদের পুরুষদের দায়িত্বই সমধিক। একদিকে বালকোচিত গোবিন্দলাল, অন্যদিকে অতি-প্রৌঢ় যুবক উপেন্দ্র যথাক্রমে সেই ক্রূর অবিবেচনা ও রূঢ়তম বিবেকবত্তা, যা কিনা রোহিণী-কিরণময়ীর দুর্লভ নারীমূল্য বিপথচালিত ও বিনষ্ট হতে দিয়েছে।—একজন স্পষ্ট-প্রত্যক্ষত, অন্যজন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষত। শরৎচন্দ্রের কথায়, 'নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ, সহানুভূতি ও ন্যায়ধর্মের উপরে'—এরা কেউই তার পরিচয় দিতে পারেনি। তাই নারীত্বের নবমূল্যায়নে শুধু নয়, বাঙালিপৌরুষের যথার্থ অনটন-চিত্রণেও, তার হঠকারিতা, নিপীড়ন ও অসহযোগিতাসমেত, বাঙালির গৃহাঙ্গন সত্যচরিত্রে গভীররেখায়িত হয়ে ফুটে উঠেছে শরৎচন্দ্রে; দৈন্য-দারিদ্র্য-দুর্বিপাক, সামাজিক দ্বিধা-বিরোধ-বিপর্যয় আর ব্যক্তিক অসার জল্পনা,

আত্মঘাত ও অশ্রুজলের সেই পিচ্ছিল মর্মছবিই এই ভাবপ্রবণ স্বপ্নালু পরিহাসপ্রিয় উদাস জাতির সত্যচিত্র—আর সেই চরিত্রচিত্রশালাই শরৎচন্দ্রের প্রধান সম্মোহন, আসল আবেদন।

উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাযোগ্য এই যে, অন্ধকারের রূপ আছে, উচ্চকণ্ঠ এ-উচ্চারণ তাঁর, সে-কল্পনার বাস্তববিশ্লেষণও তাঁর। কিরণময়ী সেই অন্ধকার, নারীর অবদমিত উৎসাদিত প্রবৃত্তিরাজ্যে; সুরেশ সেই অন্ধকার, পুরুষের প্রবল প্রচণ্ড মোহান্ধতায়। আর এই অন্ধকারের অনুসন্ধিৎসা যৌনতার, যৌনচেতনার আবর্তরূপে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কারও কারও রচনায় বীজাকারে, কিন্তু সবিশেষ সম্যকভাবে পরবর্তী 'কল্লোল'যুগে, 'কালিকলমে', জগদীশ গুপ্তে ও তদবধি তরুণ শক্তিমানদের প্রায় সবার রচনায় ফেনোচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আর কতকটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও স্থূল রক্তমাংসের স্পষ্ট অনুভূতি সাহিত্যরূপ নিলে যে তা প্রচারনীতিব দ্বারা স্বতই আচ্ছন্ন হয় ও তাতে যে তার অগৌরব নেই, সে-ঘোষণাও শরৎচন্দ্রের : "জগতের যা চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তাতেও কোন-না-কোনরূপে এ-বস্তু (প্রোপাগাণ্ডা) আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণীতে আছে, ইবসেন-মেটারলিঙ্ক-টলষ্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েল্‌স্‌-এ আছে।" শরৎচন্দ্র আরও বলেছিলেন, "...এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও *সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে* পারবে..." ইত্যাদি। তাই তাঁর পরবর্তী পুরুষের গল্পে-উপন্যাসে সরীসৃপ অন্ধকার, প্রাগৈতিহাসিক যৌন-জৈব তাড়না, কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের বোহেমিয়ানিজ্‌ম্‌, রাশিয়ান সাহিত্যের 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্লড' অগাধ অবাধে মিলেমিশে গিয়ে সাহিত্য হয়ে দাঁড়াল জৈবমানুষের দেহমনস্তত্ত্বজ্ঞান ও প্রচারনীতির সম্প্রসারিত প্রয়োগক্ষেত্র—দুর্বিষহ দারিদ্র্য ও দুরতিক্রম্য যৌনবুভুক্ষার বিসর্পিল পাঁকের জগতে হংসপদ্মাসীনা বাঁধা পড়লেন। সেকালের আতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ যদিও দেখেছিলেন 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' ও 'লালসার অসংযম', স্পর্ধাধর্মী নবীন সাহিত্য-কর্মের বহুলাংশতেই অবক্ষয়িত সমাজের মস্ত অন্ধকার সেই 'কল্লোলে-কোলাহলে' তবু কম্পিতস্পন্দিত হয়ে উঠল। সে-ভূমিকম্পের পরোক্ষ প্রবর্তনা শরৎচন্দ্রের। এরই ধারাবাহিক সমর্থনে 'কল্লোল'-পূর্ব 'ভারতী'-সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৩৩৪ ভাদ্র সংখ্যায় 'কালি-কলমে' লেখা সাক্ষ্য (মণিবজ্র ভারতী ছদ্মনামে) প্রথমেই পেশ করা যায় : 'আধুনিক সাহিত্যের কল্যাণে আজ আমাদের অনেক

জিনিস জানা সম্ভবপর হয়েছে। নারী আজ তার সতীত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। এখন আমাদের মনের মধ্যে এই কথা জাগ্রত হয়েছে যে, নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড়? শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে এর নির্ভীক উত্তর পেয়ে পাঠকের মন সভয় বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।' বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উত্থাপিত প্রশ্নেরই পুনরুত্থাপিত 'নির্ভীক উত্তর' শরৎচন্দ্র দিয়েছিলেন, যেমন পূর্বের বঙ্কিমী প্রশ্নের নির্ভীক উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাবীন্দ্রিক-উত্তরদাত্রী মুখপাত্রী চারু-বিনোদিনী-দামিনী-বিমলারা নিশ্চয়ই কিরণময়ী-অচলা-অভয়া-কমলদের তুলনায় অনেক মৃদুভাষী ও অনুগ্র। আর তারই ফলে ওই বছরের 'কল্লোলে' ভবানী ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়া এরকম: 'তাঁহার সুচিন্তিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা; এমন কি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই।'—'সুচিত্রিত' নিঃসন্দেহ, কিন্তু 'শুচিতায় ভরা'—'পঙ্কিলতা নাই' অর্থাৎ আপত্তি সেখানেই! স্বাভাবিক। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, 'পুরুষ' থেকে 'পুরুষে' এভাবেই অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন বা প্রগতি ঘটে—'আরও অনেক জিনিস জানা সম্ভবপর' হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি 'কল্লোল'-'কালিকলম'-সমকালীন ও পরবর্তীদের প্রধান বিরোধ ও বিরুদ্ধতা সেখানেই বটে; পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রে যে নরনারীর স্বাভাবিক 'পাঙ্কিলতা'র প্রকাশ তুলনায় সমধিক স্পষ্ট! এবং সে-'পঙ্কিলতা'র যোগ্য পরিপ্রেক্ষিত দুঃসহ দারিদ্র্য, যৌন উপবাস ও কামনাবাসনার তির্যক গতি-পরিণতি: কিরণময়ী যার সবচেয়ে বড় ও বিড়ম্বিত নির্ভরযোগ্য প্রতিকৃতি। পাথুরেঘাটায় তার, তাদের অন্ধকার সেই ভাঙাবাড়ি ও 'অতিসঙ্কীর্ণ গলি'র কথা সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। যথা: 'কোঠাবাড়ি। পূর্বে উপরতলায় চার-পাঁচটি ঘর ছিল, তাহার গোটা দুই একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং একটা আগামী বর্ষায় পড়িবার জন্য ঠিক হইয়া আছে। বাকী তিনটার মধ্যে সুমুখের ঘরটায় তিনজনেই (কিরণময়ী, উপেন্দ্র ও সতীশ) প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই বোঝা গেল, অত্যন্ত অনধিকার প্রবেশ হইয়াছে। মূষিকের দল তখন জীর্ণ ও পুরাতন অব্যবহার্য শয্যা ও উপাধান হইতে তুলা বাহির করিয়া ঘরময় ছড়াইয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, অসময়ে আলোক ও জনসমাগমে ছুটাছুটি চেঁচামেচি করিয়া উঠিল। সমস্ত ঘরময় ভাঙা টেবিল চেয়ার, ভাঙা কাঠের তোরঙ্গ, ভাঙা টিন, খালি শিশি-বোতল এবং আরও কত কি প্রাচীন দিনের গৃহসজ্জার ভগ্নাংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহারই একধারে একটা তক্তপোশ পাতা। ছেঁড়া গদি ছেঁড়া তোষক ছেঁড়া বালিশ প্রভৃতি গাদা করিয়া জোর করিয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া তাহারই একাংশে একটা মাদুর পাতা রহিয়াছে।'—এই বহুভগ্ন ছিন্নভিন্ন চরম দৈন্য ও মালিন্যের মধ্যে কিরণময়ী অর্থাৎ উপেন্দ্র-সতীশের

প্রথম-পরিচয়ের 'স্ত্রীলোকটি কেরোসিনের ডিবা হাতে করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপরে অল্প একটুখানি আঁচলের ফাঁক দিয়া সযত্নরচিত কবরীর এক অংশ দেখা যাইতেছে। দেখা গেল, তাহার একটিমাত্র কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচপোকার টিপ চিকচিক করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে-বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা পাইয়া বারংবার ফিরিয়া যাইতেছে ;…' এই কুৎসিত ঘনঘোর অন্ধকার ও নিখুঁত নারী-সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ, এই ধূমায়িত কালির মালিন্য ও বাধাপ্রাপ্ত 'ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা' পাশাপাশি সহজ-বিরাজমান দেখে, ক্ষণকালের জন্য কেন, চিরকালের জন্য বিভ্রান্ত হওয়াও আশ্চর্য নয়। কিন্তু আরো ভয়ানক বাস্তব আশ্চর্য আছে।—'মলিন ও শতচ্ছিন্ন শয্যার শিয়রে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, ঘরে অন্য আলো নাই, এইটুকু আলো রক্তশূন্য বিবর্ণ শীতল মুখের পরে লইয়া হারানোর জীবন্ত মৃতদেহটা পড়িয়া আছে। সূর্যের উত্তাপ ও আকাশের বায়ু হইতে চিরদিন বিচ্ছিন্ন এই গৃহের অস্থিমজ্জায় যে জীর্ণতা ও অন্ধকার লালিত ও পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, এই কনকনে শীতের রাতে অত্যল্প আলোকে, কুষ্ঠরোগের মত তাহা সমস্ত দেয়ালের গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দিবানিশি অবরুদ্ধ গৃহের রুদ্ধ দুষ্ট বায়ু আত্মঘাতীর মুখোদ্গত বিষাক্ত ফেনের মত ফাঁপিয়া ফুলিয়া গৃহবাসীর কণ্ঠনালী যেন প্রতিমুহূর্তে রুদ্ধ করিয়া আনিতেছে। দ্বারে মৃত্যুদূতের প্রহরা পড়িয়াছে।' অথচ এত শ্বাসরুদ্ধতা মৃত্যুময়তার মধ্যেও জীবন-উদ্ভাসিত কিরণ! হায়, জীবনমুক্তির আবদ্ধ সৌন্দর্যপ্রতিমা! বধ্যভূমির বলি! তাকে তো তখন 'মরবিডিটি'র মূর্ত প্রতীক, সাবয়ব বিকিরণ নয়, বিকার বলেই মনে হবে : হলোও তাই। 'সমস্ত দিকে চাহিয়া সতীশ বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া একেবারে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে, এখানে মানুষের জীবন থাকে কি করিয়া? অনতিদূরে বধূটি দাঁড়াইয়া ছিল, সেদিকে একবার চাহিয়াই সে আরো যেন ভয় পাইয়া গেল। কোথায় গেল ঐ অতুল রূপ! কোথায় গেল ঐ হাসি! তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যেন কোন্ এক প্রেতলোকের পিশাচ উঠিয়া আসিল। সে ভাবিতে লাগিল, স্বামী যার এই, সে আবার হাসে, পরিহাসে যোগ দেয়, খোঁপা বাঁধে, টিপ পরে! এক মুহূর্তের জন্য তাহার সমস্ত নারীজাতির উপরেই ঘৃণা জন্মিয়া গেল।'— অবশ্য এই তার তীব্র ঘৃণা পরে পরমশ্রদ্ধায় পরিপ্লুত হবে। সতীশদের যা হয়!

অবশেষে সে-ই আরাকান থেকে এই রমণীকে নিশ্চিতপ্রায় গণিকাবৃত্তি থেকে উদ্ধার করে আনবে। এসব পড়ে তখনকার মতো 'পাঠকের মন সভয় বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে' উঠেছিল কেন, মণিলালের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির মর্মবোধ আজ সহজ—কেননা এই রূঢ় নির্মম বাস্তবধারার 'আজও নাই শেষ'। এম্নি একটি-দুটি নয়, অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েই দেখানো যায়, শরৎচন্দ্রই রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্যে স্যাতস্যেতে পঙ্কিল গলিঘুঁজির মধ্যে মাথা-গুঁজে-পড়ে-থাকা, কোনরকমে টিকে-থাকা কিছু আশ্চর্য পদ্মের মতো নারীর সন্ধান প্রথম এনেছিলেন; যার ফলে শরৎচন্দ্রের থেকে দৃষ্টিভঙ্গিতে মেরুবিপরীত, নির্মম নিয়তিবাদী ও মানুষের তথাকথিত মহিমাবিষয়ে নিদারুণ সন্দিহান, বহু-মোহমুক্ত জগদীশ গুপ্তও উক্ত 'কালি-কলমে'ই লিখেছিলেন: 'এমন করিয়া আগে তো অপ্রকাশকে কেহ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় নাই।—কথা ছিল, শিল্প ছিল, ছিল না দরদ। অপরের মনের কথাটি বুনিয়া বুনিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া বাছিয়া বাছিয়া হয়তো বলা হইয়াছিল, কিন্তু সে শুধু অনুভূতির বহিরঙ্গ স্পর্শ করিত।...জীবানন্দ, ষোড়শী, অভয়া, অচলা, বামুনের মেয়েটি আর কিরণময়ী—ইহারা আছে বলিয়াই জানিতাম।' অর্থাৎ এখানে 'অপরের···স্পর্শ করিত' বলতে যেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রত্যক্ষ-রবীন্দ্রবলয়ের কথাশিল্পীদেরই কটাক্ষ করা হয়েছে এবং 'দরদ' কথাটার পরে রবীন্দ্রানুগ সহানুভূতি-সংবেদনের চেয়েও অন্তরঙ্গস্পর্শী প্রগাঢ় বেদনাবোধের ব্যঞ্জনা লেপন করা হয়েছে। বিশেষত স্বামী-শাশুড়ির বঞ্চনা-প্রতারণায়, এমনকি স্পষ্ট প্ররোচনায় যুগপৎ ঘোর দারিদ্র্য ও যৌনবিকারে বাধ্যজর্জর কিরণময়ীর তথাকথিত 'পাপ'-মূর্তিটি তখন অনেক নবীনেরই প্রাণে-মনে মুগ্ধতা ও 'বিচলিত' চিন্তা জাগিয়েছিল। তাই 'কল্লোলে'র একজন মুখ্য মুখপাত্র অচিন্ত্যকুমার শরৎচন্দ্রের ওপর লেখা তাঁর একটি বিশেষ ভাবে রচিত কবিতায় (দ্র° 'নীল আকাশ') তাঁর অনেক সাধারণ-অসাধারণ চরিত্রমিছিলের যথোচিত সটীক উল্লেখের মধ্যে সর্বাধিক গণ্যমান্য ক'রে তুলেছিলেন সেই কিরণময়ীকেই এবং এভাবে: 'আমি শুধু দেখিতেছি পাপীয়সী কিরণময়ীরে'। আর এঁদের মধ্যে বয়োপ্রবীণ কিন্তু কিছুদিনের জন্য সমভাবাপন্ন 'স্বপন পসারী'-'বিস্মরণী'র মোহিতলাল তাঁর প্রথম-দিককার একটি প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতায়, দেখা যায়, হুবহু কিরণময়ীর একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ চিন্তানুভূতি ও আন্তরিক বাক্যের প্রতিধ্বনি করেছিলেন। যথা: উপেন্দ্রর উপস্থিতিতে দিবাকরকে সে বলছে, 'এমন দম্ভ আমার মনে নেই যে, সমস্তই নাশ হবে, শুধু আমার এই মহামূল্য আমিটির কোনদিন ধ্বংস হবে না। এমন কামনাও করিনি যে, আমার মৃত্যুর পরেও আমার আমিটি বেঁচে থাকুক।'—পাশাপাশি মোহিতলালের প্রতিধ্বনিত

কবিতাপংক্তি : 'আমার আমিটি এইখানে শেষ হোক, / মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো সুন্দর পরলোক!' বিকিরণী প্রেরণাপ্রভাব বই কি! ঠিক 'কল্লোলে'র না হয়েও 'কল্লোলে'র কিছু-কিছু কুললক্ষণযুক্ত, নাকি 'কুলবর্ধন', পরবর্তীকালে অন্য-পরিণত, একালের সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "স্কুলজীবনেই কয়েকবার 'শ্রীকান্ত' পড়েছিলাম। 'চরিত্রহীন' আমাকে অভিভূত, বিচলিত করেছিল। বোধ হয়, আট-দশবার বইখানা পড়েছিলাম তন্ন তন্ন ক'রে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে।... শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা ও অসতীরা চরিত্র হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব, অনুচিত প্রেম'ও হয়েছে প্রেম। তখনকার অন্য কোনো লেখক এটা পারেননি।"— এখানকার দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বাক্য-তিনটির বাচ্য-ব্যঞ্জনার্থ আমাদের এ-পর্যন্ত উপর্যুক্ত ভাবনা-চিন্তা-বিচারের সারাৎসারকেই সঙ্কেতিত করে। বস্তুতপক্ষে চরিত্রহীনের 'এনিগমাটিক' পথভ্রষ্ট-পদচ্যুত-উৎকেন্দ্রিক কিরণময়ী, গৃহদাহের দোলাচলচিত্ত ও অবস্থা-বিপর্যস্ত-দ্বিচারিণী অচলা, শেষপ্রশ্নের ক্ষণ-আনন্দ-বাদিনী তার্কিক-বিতর্কিত কমল (এঁর সম্পর্কেও মানিকবাবু শেষপর্যন্ত খুবই সপ্রশংস ছিলেন—মানবেন্দ্রনাথ রায় তো একসময় 'শেষপ্রশ্ন'কে 'গীতাঞ্জলি'র উপরে ঠাঁই দিয়ে এতদূর লিখেছিলেন : ...'Sesh Prasna' is really a landmark in Indian Renaissance'—Fragments of a Prisoner's Diary vol. III)—মুখ্যত এই তিনজনকে দিয়েই শরৎচন্দ্র, তাঁর স্বকীয় উপায়-উপাদানে, অনৈতিক, শৈল্পিক স্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে, নানা সন্দেহ-প্রশ্নোদ্রেককারী সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, 'বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি যে চুরমার' করে দিয়েছিলেন, তাই হলো তাঁর সর্বাধিক গুরুত্ব এবং এই অঙ্গাঙ্গী সত্য : 'পতিতা ও অসতীরা চরিত্র হয়েছে, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম।' সমকালীন ও প্রায় সবস্তরের পাঠকদের জন্যই তাঁর আবেদন তাই এত ত্বরিত তীব্র হয়েছিল।

উত্তরকালীন বাংলা কথাসাহিত্য প্রধানত তাঁরই ধরনেধারণে, ভাবনায়-বেদনায়, স্বাভাবিক সংলাপে, সাবলীল ভাষাভঙ্গি ও সহজ বাক্রীতির দিকে, হৃদয়-আলোড়নে, সুলভ ইচ্ছাপূরণেও, এহেন অগ্রসর : অবশ্যই আরো আয়ত, জটিল ও পরিণত। জগদীশ গুপ্ত তাঁর পূর্বোদ্ধৃত শরৎ-স্বীকৃতির সঙ্গে এ-মন্তব্যটিও সঙ্গতরূপে রেখেছিলেন : 'এছাড়া (অর্থাৎ 'জীবানন্দ, ষোড়শী, অভয়া, অচলা, বামুনের মেয়েটি আর কিরণময়ী') আরো আছে। এবং সাহিত্যে তাঁরা দেখা দিবেনও।' (দ্র° অশ্রুকুমার সিকদার, শরৎচন্দ্র : 'কল্লোল'-এর

উত্তরাধিকার। শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা—সঙ্কলনগ্রন্থ, পৃ ৬৮)। সেই সেদিনের স্বভাবশক্তিশালী, অতিমৌলিক, অবশ্য সিনিক্যাল ও আয়রনিষ্ট কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত থেকে আজকের আপাতত শেষতম কাহিনীকার পর্যন্ত সেই 'আরো আছে' ও তাদের 'দেখা'-দেওয়ার 'দেখা'-পাওয়ার ব্যাপারটাই তো চলেছে, 'কথায়', 'শিল্পে' এবং 'দরদে'। বলা বাহুল্য, জীবনের জটিলতা এখন বহুগুণ, জীবনের জ্বরজ্বালাও মাত্রাহীন। আর তদনুযায়ী অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি-উপলব্ধির —সামগ্রিক মূল্যবোধের পালাবদল ও স্তরান্তর ঘটে গেছে অসম্ভব দ্রুত বেগে, নিয়তই ঘটছে। তারই বিবিধ দলিলীকরণে, বিচিত্র মূল্যায়নে এখন তাই দীর্ঘ ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে 'তৃতীয় পুরুষ' শরৎচন্দ্র ও 'চতুর্থ পুরুষে'র প্রতিনিধিদের মধ্যে—বৃহৎ-প্রতিভাসমৃদ্ধ স্বল্প লেখকদের দিন গিয়ে, এখন তো স্বল্প-প্রতিভাসম্পন্ন বৃহৎসংখ্যক লেখকদেরই ঠেলাঠেলি ভীড়—প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য ব্যর্থ হয়নি। তবু বর্তমান কালের লেখকদের মোটামুটি একটা অংশের সঙ্গে শরৎ-উত্তরাধিকার অত্যন্ত না হোক, প্রত্যন্ত-ঘনিষ্ঠ। ব্যতিক্রমস্থানীয় বেশ ক'জন শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে বা মৃত্যুর অল্প পর থেকেই রবীন্দ্র-প্রমথ চৌধুরী ও বিদেশি দৃষ্টান্তে সমধিক প্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের চিনে নেওয়া এতই সহজ ও স্পষ্ট যে, এখানে আর সেসব নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অধুনা ব্যবধান আরো বেড়েছে, স্বভাবতই, সঙ্গত স্বতন্ত্র স্থানকালপাত্রকারণেই—কিন্তু একেবারে বিচ্ছেদ? তা কি সত্যিই ঘটেছে? সম্ভব?

যাই হোক, সেই 'কল্লোল-কোলাহল' থেকে এ-পর্যন্ত বিচিত্রমুখী বহুচারণায় শরৎচন্দ্রের যেটুকু ঐকযোগ ভাবে-ভাষায় আজও অনুসৃত, তা কেবল পুরুষানুক্রমিক রীতিরক্ষা নয়, নীতিরক্ষাও বটে, সেই তাঁর জীবন-জাগতিক অন্তরঙ্গ দৃষ্টি; বস্তুসত্যে আনুবীক্ষণিক অভিনিবেশ, মাটির-পা নরনারীর দেহমনঃসমীক্ষা, পাপতাপবিকলন, পাতালসন্ধান। তাই যখন পরবর্তী ও সাম্প্রতিকদের যথাসাধ্য মৌলিক মনন ও শিল্পশক্তির মধ্যবর্তিতায় "the novel assumed the role which makes it so useful today : it thrives on change and social turbulence"—তখন এঁদের অগ্রনায়ক শরৎচন্দ্রের 'elemental' সুখদুঃখ-চেতনার সঙ্গী শরীরে-কাঁটা-হয়ে জীবনের ব্যাধিবৈকল্যের ঘনিষ্ঠ অনুভব, সেই সময়-সমাজবিবর্তের প্রথম ঘূর্ণিপাক ও অলাতচক্র, তাঁর সঙ্কীর্ণ-গভীর খাতবাহিত, সীমাবদ্ধ, তবু উদ্বেল-উচ্ছ্বসিত 'Sombre' উপন্যাসক'টির গভীর সংবেদন যা মেলায়, লরেন্সীয় অর্থে তাই যেন "help you not to be a dead man in life"।

সরোজকুমারের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প

'মাটির কাছাকাছি' যে-কোনো সৎ-লেখককেই থাকতে হয়! সেই মাটির আর্দ্রতা অথবা ঊষরতা লেখকের মনকে গঠন করে। নদীমাতৃক বাঙলা দেশ তার জীবনীকারদের মনকে চিরকাল যেমন করুণরসে স্নিগ্ধ করেছে, তেমনি বাঙলার আদিগন্তবিস্তৃত পথপ্রান্তর, সূর্যকরোজ্জ্বল উদার নীলিমা সেই মনে শান্ত বৈরাগ্য ও স্মিত কৌতুকের সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে। সংসারে আসক্ত করেছে যেমন, সংসার থেকে মোহমুক্তিও ঘটিয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে সার্থক বাঙালি লেখকমাত্রেই এই উভয়-লক্ষণে চিহ্নিত। মঙ্গলকাব্য ও গীতিকা-সাহিত্যে এর পরিচয় আছে। দুঃখভারাক্রান্ত ফুল্লরার বারমাস্যা যিনি রচনা করেছেন, তিনিই আবার ভাঁড়ু দত্তকে নিয়ে কৌতুকে সরস হয়েছেন। দেবদেবীদের জীবন-ভঙ্গিও এঁরা অনায়াসে নিজেদের হাসিঅশ্রুবিমিশ্র অভিজ্ঞতার ছাঁচে ফেলে আয়ত্ত করেছেন। চণ্ডী অথবা মনসাভক্তরাই হোন, শৈবসিদ্ধারাই হোন; এমন কি বৈষ্ণব-গীতি-কাব্যের সহৃদয় ভাবাবেগ-প্রাধান্য বৈষ্ণব-জীবনী-সাহিত্যের যুক্তিনির্ভর বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বলতায় সামঞ্জস্য পেয়েছে। ডাক ও খনা-বচনের অতি-পার্থিবতা রূপকথার নভোচারিতার সঙ্গে তুলনায় ম্লানতর মনে হয় নি, যখন বুঝি বাঙলা দেশের বর্ষিয়সী মহিলাদের মনে ও মুখে উভয়েরই আসন ছিল সমমর্যাদাপন্ন। বাঙালি গৃহিণীদের ব্রতকথায় সংসারে অনুরক্তি ও অনাসক্তি দুইই বিধৃত আছে।

আধুনিক কালেও সেই সুপ্রাচীন বাঙলার মাটি ও মন সঞ্চারিত হয়েছে সাহিত্যে। তাই রূপ-কৌশল ও বিন্যাসগত নতুন-নতুন পরীক্ষার দিনেও অর্বাচীন সাহিত্য চিরন্তন বাঙলাকেই প্রকাশ করেছে। রূপগত বৈচিত্র্যের সুযোগে সেই বাঙলাকে অবশ্য আর মধ্যযুগের মতো আধুনিক কালেও একমাত্র পদ্যবন্ধে বিকশিত হতে হয়নি। গদ্য এসেছে—সেই সঙ্গে উপন্যাস-নাটক, সর্বোপরি, যদিও সর্বশেষ ছোটগল্প।

ছোটগল্পের সবশেষে না-এসে উপায় ছিল না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনোভাব যেদিন দৃঢ়তর হোল, সংসার ছোট হয়ে গেল, পৃথিবী ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো, ব্যক্তির মন গোষ্ঠী ছাড়াও বাঁচতে চাইলো, প্রকাশিত হতে চাইলো, সেদিন ছোটগল্প এলো। তাই বিশেষত বাঙলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত আত্মনিষ্ঠ গীতি-কবিতার

শ্রেষ্ঠ লেখকের হাতেই যে ছোটগল্পের শুভ স্থচনা হোল, এ ঘটনা যতটা অবিস্মরণীয়, ততটাই অতিসঙ্গত-অর্থপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের বেদনাবিধুর ছোট-গল্পগুলির প্রেরণা যে গ্রামজীবন এবং সেই গল্পগুলিতে যে যুগপৎ করুণ-কৌতুকের মেঘরৌদ্রলীলা চলেছে, সেটাও লক্ষণীয়। গ্রামের মধ্যেই চিরকালের বাঙলাদেশ কথা বলেছে। এবং সেই গ্রামের স্থত্রে সাহিত্যে, বিশেষত গল্পে-উপন্যাসে নদীর স্নিগ্ধ কলোচ্ছ্বাস, —রুদ্র-ভৈরব-রবও, মাটির নরম আর্দ্রতা, ঊষরতাও, আকাশের সহাস্য উদারতা, মাঠের নিঃসীম প্রসার অর্থাৎ সংসারযাত্রাকে কাছ থেকে অভিভূত হয়ে দেখা ও দূর থেকে নির্লিপ্তমনে উদাসীনতায় ভাবা তুইই সমান বেগে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি বিশেষত তারই উজ্জ্বল নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের পরে ও কল্লোলযুগের পূর্বে তুজন প্রধান বাঙালী গল্প-লেখকদের মধ্যে এই লক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে। প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র তুজনেই ব্যথার কাহিনী ও কৌতুকের গল্প লিখতে পারদর্শী ছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মত উক্ত তুই প্রসঙ্গকে একটি মৌলিক প্রস্তাবে সম্মিলিত সংগ্রথিত করে দিতেই তাঁরা সবিশেষ জানতেন।

এর কারণ আর-কিছু নয়, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা: উন্মুক্ত আকাশ আর বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে চেয়ে তাদের পটভূমিতে মানুষের ছোট ছোট সংসারকে যখন বড়ো তুচ্ছ মনে হয়, মানুষের স্বপ্নকামনা চেষ্টা সাফল্য ও ব্যর্থতা বৃহৎ পৃথিবী ও প্রকৃতির মাঝখানে যেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়, তখন তুঃখ হয়, বেদনা জমে; সঙ্গে সঙ্গে উদার ঔদাস্যে মন ভরে যায়। নিকটজনের অশ্রুপাতের পাশে দূরজনের কৌতুকবোধ সমান মূল্যবান মনে হয়। একত্র প্রবাহে তুই-ই বয়ে চলে জীবনকে নানা রঙে রঙিয়েরসিয়ে। তুইই স্থায়ী হয়ে রইল বাঙালির গৃহাঙ্গনে, বাঙলা সাহিত্যেও।

এই স্থায়ী ও শাশ্বত জীবনবোধের মূলধন নিয়ে যাঁরা এগোন, তাঁদের শিল্পকর্মে স্বভাবতই সাময়িকতা খুব বেশি ছায়াপাত করে না। তাঁদের মনে কোনো বিশেষ সাহিত্যভাবের ও ভঙ্গির আন্দোলন তেমন-কিছু অত্যুৎসাহ বয়ে আনে না। সরোজকুমার গোড়া থেকেই এই মূলধনের কারবারী। তাই 'কল্লোল', 'কালিকলমে'র সঙ্গে এককালে যুক্ত হয়েও তিনি ঠিক তাদের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে কোনদিন অংশ নেন নি। সেদিন বিদ্রোহের নামে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা চলেছিল, তার পেছনকার সৎসাহস অথবা তুঃসাহসকে মূল্য দিতেই হয়; কিন্তু সেদিনকার মুখ্য আন্দোলনকারীদের অনেকেই যে শেষপর্যন্ত কক্ষচ্যুত ও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন, তার মূল হেতু হয়তো এই যে, সেদিন তাঁরা বাইরের দিকে যতো চেয়েছিলেন, ততোটা

ঠিক নিজেদের মাটি ও মনের দিকে চাননি। আবার কখনো নিজেদের মনের সেই অংশেই এতো আলো ফেলেছেন, যার মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গীণ মানুষের স্পষ্ট স্বতঃস্ফূর্তি বারবার বাধা পেতে থাকে। সেক্ষেত্রে ততটুকু অত্যাবশ্যক আত্মবিস্মৃতি তাঁরা আয়ত্ত করেননি, যার প্রভাবে স্থানকালে সীমিত সাধনা চিরকালীন সিদ্ধিতে পৌঁছতে পারে। নতুনত্ব ও অভিনবত্ব সৃষ্টি ও আমদানির দিকে যে উৎসাহী ছিলেন তাঁরা, তাতে পরবর্তীদের পথ অবশ্যই সুগম হয়েছে। কিন্তু তাঁরা যে অনেকক্ষেত্রেই সেই অভিনবত্ব-সৃষ্টির অতিমোহে চিরন্তনকে মূল্য দিতে পারেননি ও ফলে নিজেদের পরিণতিকে খণ্ডিত, সম্ভাবনাকে অসমাপ্ত করেছেন, তা আজ আর অস্বীকার্য নয়। বরং 'কল্লোলে'র সঙ্গে অতিঘনিষ্ঠ না হয়েও যাঁরা আন্তরিকভাবে সেই পত্রিকা-পরিচালকদের মতো সাহিত্যে সন্ধিৎসু ও অধিকন্তু দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয়ে নিবিড় ছিলেন—সেই অল্প কয়েকজন গল্পে-উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত চির-অক্লান্ত শক্তিপরীক্ষা করে গিয়েছেন। মাটির সঙ্গে মনের দৃঢ় যোগ থাকলে মনকে শুষ্ক শ্রান্ত হয়ে পড়তে হয় না। সরোজকুমারের সাহিত্যিক মানস তাই নদীর মতো চিরপ্রবহমান ছিল, প্রাপ্ত পরিণতির চেয়ে স্থিরতর পরিণতি তাঁর নিয়ত-অন্বিষ্ট।

যদিও তাঁর প্রধান পরিচয় একজন অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক হিসাবে, কিন্তু তিনি ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট রচনাকার। বাঙলাদেশকে তিনি জানেন। বাঙালির মনপ্রাণের প্রকাশভঙ্গি তিনি বোঝেন। তার আবেগ-অনুদ্বেগ-মোহ-মোহমুক্তি—তার দ্বৈতাদ্বৈত স্বভাবের তিনি মূল সন্ধান করেছেন। এবং বাঙলাদেশকে জানতে ও জানাতে গিয়ে তিনি লাভ করেছেন নিজেকে। এবং সারাজীবন তাকে রক্ষা করেছেন। এই বিশুদ্ধ-চিত্ততা তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে প্রকীর্ণ আছে।

সেই ছোটগল্পের সংখ্যা ও ব্যঞ্জনা-বৈচিত্র্য অনেক হলেও আপাতত লেখকের একটা মোটামুটি সামগ্রিক পরিচয় দিতেই তাঁর প্রধান গল্পগুলির এ-আলোচনা।

সরোজকুমারের 'দেহযমুনা' গল্পে অকালবিধবা তরুণীর মর্মজ্বালা যে শান্ত আবেগে বলা হয়েছে, 'নীড়ের মায়া'র সমস্যা অনেকটা এক হলেও লেখকের পরিণত লেখনী তাকে বুদ্ধির বিদ্যুৎ-স্পর্শে চিরে চিরে দেখাতে চেয়েছে। কারুণ্যের বদলে সেখানে তাই যে কাঠিন্য এসেছে তা সুনিয়ন্ত্রিত ও অনিবার্য। প্রথম গল্পে সতীর মহত্ত্ব আত্মক্ষয়ী বিবর্ণ জীবনের নিদারুণ বিনিময়ে পাওয়া, দ্বিতীয় গল্প যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে অন্তত দেখি, সুরবালা সতীর সে-'সতীলোক'ও হারালো, ইহজীবনের দুঃখলজ্জা-অবসাদ থেকেও রেহাই পেলো না—নির্বিচারী সংসারযাত্রার বিরুদ্ধে এই তার দুঃসাহসী-গর্বিত সংগ্রামের পরিণাম! পরিহাসের

সুর দুই গল্পেই বর্তমান; কিন্তু দ্বিতীয় গল্পে যেহেতু বিশ্লেষক মনের প্রাধান্য ও সক্রিয়তা প্রবলতর, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মূল চরিত্রের অতর্কিত অথচ অর্থপূর্ণ পরিবর্তন দেখিয়ে তাই যতখানি পরিণামী তীব্রতা এসেছে, প্রথমটিতে ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হলেও (করুণা ও অলকার অত্যন্ত ব্যক্তিগত চিঠিদুটি সেই প্রাণযোগের উপযুক্ত স্মারক ও বাহক) যেন সেই ঋজুঘনত্ব আসেনি। লেখকের বয়োমনোগত স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব ছাড়াও গল্পদুটির সমস্যাগত গুরুত্বের বিভিন্নতাও এর জন্যে কিছুটা দায়ী। প্রথমে দেহযমুনায় জোয়ার-ভাঁটার আনুষঙ্গিক হয়ে এসেছে অতৃপ্ত প্রাণের ক্ষুধা, দ্বিতীয়ে সমগ্র সত্তা তার আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী করতে গিয়ে দেহকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যবহৃত হতে দিয়েছে। তাছাড়া সতীর শূন্যতাবোধ তার মৃত্যুর সঙ্গে অচেতনলোক আশ্রয় করল, আর সুরবালাকে সম্পূর্ণতালাভের ভান ক'রে শূন্যতার বোঝাকে সচেতনভাবে বয়ে বেড়াতে হবে বহুদিন, হয়তো সারাজীবন—পরিহাসের প্রদাহ তাই দ্বিতীয়েই যে তীব্রতর, তা বলা বাহুল্য।

সরোজকুমারের মনঃশক্তি যে অভ্যস্ত পথে তার নিজস্বের প্রকাশ খোঁজেনি, তার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তাঁর সাধারণ ও দাম্পত্য-প্রেমের গল্পগুলি। এদের মধ্যে 'মুক্তি' অপেক্ষাকৃত তারুণ্যসূচক হলেও আলোচ্য লেখকের চরিত্রের ভগ্নাংশ তাকেও রূপবান করেছে। সেই সুস্থ কৌতুকপ্রিয়তা ও সুমিত সংলাপে সামঞ্জস্য। গল্পের শেষভাগে প্রশ্নগুলি একটু বেশি উদ্যতভাবের। খুশি-র জন্যে এমনিতেই পাঠকের ঔৎসুক্য সামান্য হতে পারে না। যে-মেয়ে বিবাহ-পূর্ব-জীবনের প্রেমকে স্বামী-সৌভাগ্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করে অনিশ্চিতের মধ্যে বেরিয়ে আসে ও স্পষ্টত বলে যে, এই জীবনে তার 'গ্লানি বোধ হয়'—তাকে বিরলশ্রেণীর সাহসিকা মনে ক'রে সপ্রশংস হলেই সমস্ত শেষ হয় না।' তার পরেও অনেকক্ষণ উদ্বেগে মন ভারী হয়ে থাকে। অবশ্য সকলেই জানেন, সংসারের সাধারণ নীতি হচ্ছে মানিয়ে নেওয়া, মানিয়ে চলা। যেমন, 'মন-পবন' গল্পে কিশোরকালের সমস্ত উদ্দামতা ও চাঞ্চল্যকে মুহূর্তে সমাপ্ত ক'রে দিয়ে নীলাকে অপরিণতির স্তর থেকে পরিণতিতে এগিয়ে যেতে হোলো, লেখকের কথায় 'তার যে অপরিণত মন এতদিন দুটি দুর্বল বাহু দিয়ে যত জঞ্জাল খেলাচ্ছলে কুড়িয়ে বেরিয়েছে, একটি দিনে তা যেন দশটি বছর এগিয়ে গেল'—স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ 'লেখাপড়ার পক্ষপাতী' বলে সে ফার্স্ট বুক পড়তে বসল—'একটি মেয়ে জন্মের মতো হারিয়ে গেল' ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে যে-মেয়েটি জন্ম নিল, সে-ই প্রাত্যহিক জীবনের পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সুসঙ্গত করে তুলে চিরকাল এগোতে থাকে। বটুক-পটলারা পেছিয়ে

পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ দেখেছিলেন তাকে হয়তো এখানে আশঙ্কা করা ভুল। কিন্তু আপাতত গল্পটি যেখানে শেষ হয় সেখানে নীলার স্বতঃস্ফূর্তি ব্যাহত হোলো বলে আমরা যতটা ভাবি, তার চেয়ে নিশ্চয়ই কম ভাবায় না বটুকের সেই ভীরু বাসনার ক্ষণ-উদ্ভাসন—বিবাহিত নীলার মধ্যে তার 'আগেকার মানস-বধূকে' না-পাওয়ার জন্যে দুঃখবোধ। আবার খেলার সাথীকে ডেকে পটলা যে চিরকালের জন্যে হতাশ মনে ফিরে গেল, তাকেও কি ভুলে যাই? অথচ এই পরিচিত পৃথিবীতে লক্ষ্মীনারায়ণদের 'পক্ষপাতী' হয়ে উঠতে হয় নীলাদের অতিদ্রুতবেগে। আপত্তি করা চলে না। লেখকও গল্পটি তাই নির্মম অনায়াসে শেষ করেছেন—একটি পঙক্তির ঋজুকঠিন অব্যর্থ নিশানায়। বৈধ স্বামী-সংসারে স্বেচ্ছাবিরাগী খুশি-র কাহিনী পাশাপাশি তাই আরো চমকপ্রদ লাগে—সাংসারিক মানুষরা যাকে বলবেন, 'চাঞ্চল্যকর'; গল্পটির আরম্ভে খবরের কাগজের রিপোর্টকে ওই ভাষাসুদ্ধ কাজে লাগিয়ে সুচতুরভাবে লেখক বুঝি তাই বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য গল্পের অন্য উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতেও এর প্রয়োজন ছিল।

প্রেমের ছলাকলা অথবা 'অনেক মরণে'-মরা মন-দেওয়া-নেওয়ার সবিস্তার বর্ণবিন্যাসে সরোজকুমার খুব বেশি মনোযোগ কোনদিন দেননি। তাঁর অধিকাংশ গল্পেই প্রেম জীবনের অন্য অনেক প্রবণতা ও সম্ভাবনার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা; যেজন্যে প্রেমকে অনেক সময় সরে দাঁড়াতে হয় অন্যতরকে পথ করে দিতে। যেমন 'ক্ষণিকা' গল্পে সাংসারিক দায়িত্ব, স্বামী-পুত্রের প্রতি কর্তব্য ও দুশ্চিন্তা পুরনো প্রেমের সমাধি রচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই প্রেমের সঙ্গে জড়িত স্মৃতি বা স্মারককেও অবহেলা করে বাঁধাধরা জীবনের বাইরে প্রেমের জন্যে কোনো স্বতন্ত্র মর্যাদা পর্যন্ত রাখেনি—এবং এই পথেই তো প্রেম ফুরিয়ে যায়। সচরাচর অভিজ্ঞ লোকেরা এই তো পান জীবন থেকে! জীবনের হেমন্ত-ঋতুর দার্শনিক সরোজকুমার প্রেমের গল্পে তাই আহরণ করেছেন। 'বসন্ত-রাত্রির স্মৃতি' এদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে-সুচরিতা-কমলেশ প্রথম যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে একদা একটি তরল বসন্ত-রাত্রিকে ঘনীভূত করে তুলেছিল—বহু বৎসরের ব্যবধানে আরেক মিলন-রাত্রির অবকাশে শান্তসুখী কমলেশকে আত্মঘাতী বলে অনুকম্পা করছে সুচরিতা; আর সুচরিতার প্রসাধিত গুণ্ঠিত সৌন্দর্যে শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব আবিষ্কার করছে কমলেশ। বিস্ময়ে সংশয়ে ক্ষোভে সুচরিতা তার শীতে পীত শরীরকে যতই গোপন করতে চাক—বসন্ত যে তার জীবনে আজ স্মৃতিমাত্র একথা সে বেশ জানে; কমলেশের মধ্যে শীতের শৈথিল্য বেশ জাঁকিয়ে এসেছে—পুরুষোচিত বিনয়ে তাকে সে অস্বীকারও করেনি,

যদিও সুচরিতার পক্ষে তা মেনে নেওয়া অন্তত আপাতত অসম্ভব। আদর্শবাদী কবি-প্রাণের ভাবোন্মাদনায় শীত ঋতুকে বসন্তের দূত মনে করায় হয়তো সোল্লাস সার্থকতা আছে, কিন্তু বাস্তববাদী গল্পলেখক জীবনের অবশ্যম্ভাবী শীতঋতুকে মেনে নিয়ে বসন্তরাত্রির স্মৃতিগন্ধী ক'টি কোমলার্দ্র বেদনার ফুল বিকশিত করতে চান, করেন—পরে দেখা যায়: 'ফুলগুলি সব ঝরা'। সরোজকুমার এখানে তাই দেখিয়েছেন। বাঙলা দেশের আকাশ-মাটির গুণে উদার ঔদাস্যে সেই গন্ধেও শেষ পর্যন্ত অনাবিষ্ট থেকেছেন লেখক। তাই অভিজ্ঞান-বসন্ত এসরাজ অবশেষে কোলের কাছে অনাদৃত পড়ে থাকে—আর নায়কটি বড়জোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়। এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত নারীও যখন অবস্থার পাকে পড়ে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন প্রেমিক মানুষটি অজ্ঞাতসারে হাসে ও 'তারপরে উঠে চা তৈরি করতে' যায় অর্থাৎ যথারীতি সংসারের পাঁচটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বাঁকা ও সোজা পথে জীবন অবিরাম চলছে। 'সিগারেটের টুকরো' গল্পে সেই বহমান জীবনের কয়েকটুকরো সময় রণধীর-শর্বরীর সম্বন্ধকে জড়িয়ে বিচিত্র বিপরীতের সংস্থানে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। যে-শর্বরী অন্ধকার পাড়াগায়ে কারাবাসী রণধীরের জন্যে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগস্বীকারের দুঃসহ ব্রত দীর্ঘকাল উদ্‌যাপন করেছে—নিঃসঙ্গ নীরব একাকী, রণধীর ফিরলে যে একদিন 'পিঁড়ি পেতে শাড়ির আঁচলে ঝেড়ে' দিয়েছে তাকে বসতে, শহরে এসে রণধীরের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় নার্সের পেশায় যুক্ত হয়ে সে-ই হয়ে গেল অন্যরকম—শান্ত লাবণ্য গিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিমা এলো যেমন—তেমনি তার পায়ে-চলার-পথ রণধীরের পথ থেকে অনেক দূরে বেঁকে গেল—তার ফুলে রণধীরের জন্যে মালা গাঁথা আজ আর তেমন সহজ নয়; বহু মানুষের ভীড়ে বহু আলোর মেলায় কারো বন্ধনমোচন হলে সে এমনি হয়েই যায়। শর্বরীর উপায় কী। রণধীর বুঝি তাই শক্ত হয়ে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজেকে নতুন কাজে জড়িয়ে ফেলে। বিচিত্র ব্যবহার! কিন্তু এই ব্যবহারে বিবিক্ত গল্পলেখকের হয়তো সমর্থন আছে। কেননা শান্ত নম্র একব্রতা জীবন আদর্শচ্যুত লক্ষ্যভ্রষ্ট ধাবমানতায় রূপান্তরিত হলে সেই সঙ্গে অনেক মোহ ও মুগ্ধতা রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরেই, প্রেমকে অনেক তিক্ত রক্তাক্ত অবধারিতকে পথ করে দিয়ে তার আপন জায়গা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। একে ঠেকাতে যাওয়া ভুল। মেনে না নেওয়া বোকামি। আর শুধু কি অবস্থার বিপর্যয়েই সব ঘটে? প্রাকৃতিক নিয়মেও তো অনেক মধুর সম্পর্ক ও সম্বোধন ধীরে ধীরে ধূসর ও অর্ধমৃত হয়ে যায়। 'একটি সত্যকার প্রেমের গল্পে' কোন সান্ধ্য মেঘ-

সমারোহকে উপলক্ষ করে আপাত-মাধুর্যহীন যে-প্রেমোপাখ্যান ঘনিয়ে ওঠে, তা-ই সত্যকার প্রেম—নামেই প্রমাণ, লেখক ঈষৎ জোরের সঙ্গেই একে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন ; কেননা তিনি জানেন, এই গল্পে প্রেমের জনপ্রিয় উত্তাপ উদ্বেগ ও উদ্বেলতার ছড়াছড়ি নেই বলেই সাধারণত একে প্রেমের গল্প বলে মনে করা হবে না, অথচ মজা, হয়তো পরিহাসও এই যে, আলোচ্য গল্পের উদরসর্বস্ব দামোদর-শ্রেণীর প্রেমিকই তো জগতে সংখ্যায় বেশি ও বর্ষার রাতে প্রণয়িনী স্ত্রীর কাছে কেয়াফুলের গন্ধজড়িত রসের প্রসঙ্গ না তুলে ঐ দামোদরবাবুর নিয়মেই ইলিশরসিক রসনার দাবী মেটাতে বলা ও তার আয়োজন করাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সত্যকার প্রেম। এবং এই প্রেমের ঘোরে দামোদরবাবু যে স্ত্রীকে হঠাৎ নাম ধরেই সম্বোধন করেন, 'অনেক দিনের পর'—সে কেবল ঘরের খিচুড়ি-ইলিশ-উৎসবের সম্পাদিকার প্রতি বিগলিত কৃতজ্ঞতায়। ঠাণ্ডার আমেজে ভাবতেও আরাম পান, 'সুরমা (তাঁর স্ত্রী) তোয়াজটা জানেন। তাঁকে যেন ঠিক আঙুরের মতো তুলোয় শুইয়ে রেখেছেন।' তাঁর শারীরিক সুখ ও স্বস্তির জন্যে সুরমার অপরিহার্যতাই এই 'সত্যকার প্রেমে'র মূল। অবশ্য উক্ত প্রতিপাদ্যের গুরুত্ব যতই হোক, সরোজকুমারের স্মিতহাস্য লেখনী প্রধান প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কৌতুকপ্রদ অবস্থাকে চিত্রিত করতেও যথারীতি এ-গল্পে অকুণ্ঠ। তোয়াজপ্রিয় দামোদরবাবুর তন্দ্রাকর্ষণকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্রের 'মহম্মদ তোগলককে নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি'র প্রতিধ্বনি—এবং সব সত্ত্বেও ছেলেটি যে 'কিছুতেই সেই পরলোকগত পাঠান সম্রাটকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছে না'—এই বিড়ম্বিত অসহায় অবস্থার চিত্রণে লেখকের কৌতুকরসবোধ যে সুমিত অথচ সুস্পষ্ট প্রকাশের সুযোগ করে নিল, তাও বেশ লক্ষণীয়। তাছাড়া মুখ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও সূক্ষ্মতা ভাবলে গৌণের এই লঘুস্পর্শ ক্ষতের ওপর প্রলেপের কাজ করে নিশ্চয়ই। ভাবটা এই : ছেলে বড় হচ্ছে। আর কী—আর কেন—ঢের হয়েছে !

লেখকের এই সুনিহিত কৌতুকপ্রিয়তা অন্যত্র ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতেও প্রতিফলিত। 'শনি রবি সোমে' গ্রাম-গৃহ-উন্মুখ ব্যর্থ-নাগরিক জনৈক কেরানীর জীবনে যে অস্ফুট কারুণ্য সঞ্চিত আছে তার বিশ্লেষণে যেমন তা স্নিগ্ধতা আনে, তেমনি 'ব্যাঘ্র-দেবতা'য় গ্রামের বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ বাঘের মুখে পড়ে ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলতায়, স্পর্ধা ও সাহসের হঠকারিতায় যে বিচিত্র শোভাযাত্রার সৃষ্টি করে তার রূপায়ণেও তীক্ষ্ণতা টানে। তাছাড়া প্রথম গল্পটিতে যেমন পল্লীর বর্ষা-প্লাবিত মাঠ-বাট-ঘাটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই, দ্বিতীয়ে তেমনি গ্রাম্য মানুষের পরস্পর-বিরোধী আচার আচরণের ও অসংলগ্ন কথাবার্তার নির্ভুল

নিরূপণ লক্ষ্যে পড়ে অর্থাৎ পল্লীর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়তই লেখকের অবাধ অধিকার যে অস্খলিত, তা এরা অকাট্যরূপে প্রমাণ করে দেয়। এমন-কি, ভাবতে অবাকই লাগে, যখন দেখি ব্যাঘ্রভীত মানুষের জনতা, বিশেষত নারীসমাজ, মৃত ব্যাঘ্রকে মুহূর্তে দেবতা বানিয়ে ফেলল, যেমন মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবতাগুলি সেই কবে যেন এভাবেই মানুষের সীমাবদ্ধতা ও শক্তিহীনতার সুযোগে সিন্দুর-চন্দন-চর্চিত হবার সৌভাগ্যলাভ করতেন। মানুষের দুর্বলতা দেবতার জন্যে স্থায়ী পূজার আসন পেতে দিয়েছে বলেই দেবতারা বহুকাল ধ'রে জাগতিক সংশয়বুদ্ধি ও সামাজিক কুসংস্কারের পরিধিকে বাড়িয়ে ও জড়িয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করছেন—গবেষকদের উপজীব্য এই আলোকসম্পাতী বিষয়টির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবশ্য গল্পলেখকের কোন কৌতূহল নেই—থাকবার কথাও নয়। যা আছে তা হলো, একটি বিশেষ কঠিন অবস্থায় পড়লে লোকব্যবহারের যে অসম্বৃত বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে তার সম্বন্ধে কিছু অমোঘ হাস্যরস-সৃষ্টি—অপরূপ ভাষাভঙ্গিতে সময়োচিত ভাব-ভাবনার অবিকল অনুবাদে, যা ঐ লোক-জীবনের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের নির্ভুল প্রমাণ।

অত্যন্ত সহজ সাবলীল সংলাপ ও দু-একটি সরস সতেজ মন্তব্য—যেন তুলির রেখায় এক-একটা মূর্তি ফুটিয়ে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা স্কেচে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না : অন্তর্নিহিত প্রেরণায় একটি সমগ্র ছবির দুর্লভ পরিণাম লাভ করে। সরোজকুমারের লক্ষ্য চিরদিনই এই সম্পূর্ণতা, ঐক্য-সংহত গভীরতার অভিমুখী। তবে দু-একটি গল্পে তিনি কেবল বিস্তারের দিকে ঝোঁক দিয়েও সে-পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। যেমন 'একটি ময়ূর'। কেন্দ্রগত বিষয়টি বিন্দুপরিমাণ। কিন্তু তাকে ঘিরে যে পরিধিটি রেখায়িত হয়ে উঠেছে, তার গুরুত্ব ন্যূন নয়। শহরের কোন বাড়ির ছাদে অচেনা অজানা একটি ময়ূরের আকস্মিক আবির্ভাবে আশপাশে যে বহু-বিচিত্র মানুষের ভীড় ঘনিয়ে উঠল—তাদের খণ্ড খণ্ড কথাবার্তা ভাবভঙ্গি ধ্যানধারণার নানারঙ রসরহস্য মেঘোদয়ে ময়ূরের পক্ষবিস্তারের মতই রমণীয়। বিভিন্ন মনের বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশগুলির স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতেই এই গল্পটি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি 'মৃত্যুর রূপ'-এ যে স্তব্ধ মুহূর্তরাশি ও আত্মীয়প্রিয়জনদের বিষণ্ণমুখগুলি লক্ষ করি—তাদের সংক্ষিপ্ত করে আনা হয়েছে একটি মৃত্যু-আশঙ্কিতের চেতনা-দর্পণে। তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির তীব্রতায় নিকটজনেরা আচ্ছন্ন হয়েই ছিলেন—গল্পের শেষে তাঁদের রূপ যে স্পষ্ট টানে আঁকা হয়েছে তার কারণ কালিমাঘন মৃত্যুর স্বরূপ দেখাতে তাঁদের পাণ্ডুর আলোকন প্রয়োজনীয় ছিল। প্রথমটিতে কেন্দ্র ময়ূরকে দেখিয়ে পরিধির

মানুষগুলিকে নিরলস স্মিতদৃষ্টিতে লক্ষ করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে পরিধির স্পন্দন-ক্রন্দনকে অনুভব করিয়ে কেন্দ্রীয় মৃত্যু-দর্শনের দুঃসহতাকে নিবিড় নিরুপায় করে তোলা হলো।

'কল্লোলযুগে'র লেখক সরোজকুমার-প্রসঙ্গে বলেছেন: 'জীবনের যে-খুঁটিনাটিগুলি উপেক্ষিত, অন্তর্দৃষ্টি (তাঁর) তার প্রতিই বেশি উৎসুক।' ইতিমধ্যেই এর সমর্থন আমরা পেয়েছি। আরও আছে। দাম্পত্যজীবনের অনেক ছবিই এ-পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে দেখেছি। কিন্তু 'ওপিঠ' এবং 'ক্ষত' গল্পদুটিতে আলোচ্য লেখক সেই জীবনের এতকাল-উপেক্ষিত অংশেই যেন সমীচীন আলো ফেলেছেন। স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী পুরুষকে 'ওপিঠ' গল্পের শোভনা যে শান্ত শ্লেষে উপযুক্ত কঠিন উত্তর দিয়েছে, সেজন্যে তার নির্মাতা ধন্যবাদযোগ্য—শুধু তাঁর সাহসবাবদ নয়, সেই প্রকাশ্যতার পরিবেশ ও অবস্থাকে ঘনীভূত করে তোলার নৈপুণ্যের জন্যেও বটে। কথার পিঠে কথায় ও কাজের পিঠে কাজে কত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতই মাঝে মাঝে শাণিত চোখে ঝিকিয়ে উঠে আমাদের চমকিত ও বিহ্বল করে দিতে পারে, এ-গল্প তারই একটি চমৎকার নমুনা। 'ক্ষত' গল্পে অপুত্রক পত্নীর পতিবাৎসল্যের অতিরেক সেই স্বামীর জীবনে কখন কীভাবে গভীর স্থায়ী বেদনা বয়ে আনলো, তাকেই যথাযথ অভাসিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব খুঁটিনাটি সচরাচর চোখে পড়ে না; পড়লেও এদের গতিবিধির প্রতি সাধারণত সবাই মনোযোগী হন না। সরোজকুমার কিন্তু এই সব সামান্যের মধ্যেই জীবনধর্মপালনের আগ্রহ ও আবেগ এবং নানা অসুখকর অসঙ্গতির পরিণামী অনিবার্যতাকে আবিষ্কার করেছেন।

গুপ্ত বা সুপ্ত মনের সঙ্কট বা সমস্যাই শুধু তাঁর পাঠ্য নয় অবশ্য। সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনের বৈকল্যবশত মানুষের শারীরিক ক্ষুধার বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝে প্রবল প্রচণ্ড বীভৎস হয়ে ওঠে। এমন দুর্দিন বাঙলাদেশে অনেকবার এসেছে—বিশেষত পঞ্চাশের মন্বন্তরে। সেই কালের ক্ষুধিত বঞ্চিত জীবনের ক্ষুধা-ক্ষুব্ধ মানুষ পাশবিকতার কোন্ স্তরে নামতে পারে—ধীর বিশ্লেষণে তা 'আগুনে'র মধ্যে উন্মোচিত হয়েছে। অবশ্য এখানে যে ভীষণতম পাশবিকতার পরিচয় আছে, তার সঙ্গে পশু-আচরণকারীর 'অমানুষিক' পূর্ব-ইতিহাস যুক্ত দেখিয়ে লেখক বোধহয় জীবন সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসী মনোভাবেরই প্রমাণ দিয়েছেন। অবশ্য সমস্যাগত মহাগুরুত্বের মোক্ষমতা হয়ত এর জন্যে খানিকটা হ্রাস পেয়ে গেছে। ক্ষুধা-তাড়িত ডাকাতের পাশব-বৃত্তির পরিচয় সাধারণ মনে কতখানি ঔৎসুক্যের উদ্রেক করবে সন্দেহ, কিন্তু কোনো স্বাভাবিক মানুষকে দিয়ে 'আগুনে'র

ভয়ঙ্কর পরিণাম যে ঘটানো হয়নি, তা নিশ্চয়ই লেখকের সেকালোচিত মূল্যবোধের পরিচায়ক। চল্লিশের দশকীয় আরেকটি স্থূল সঙ্কটের গল্প 'ছন্নছাড়া'—নামেই তার প্রমাণ। এতেও ঐ একই মানবমূল্যচেতনা সঙ্কটচিত্রকে অতিধূলির মালিন্য থেকে দূরে—যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে চেয়েছে। তাই এখানে ক্ষুধার যাতনায় নিজের জীবন বিকিয়ে একহাতে পয়সা এনে মা আপন মেয়েকে গ্লানির জীবন থেকে অন্য হাতে ঠেকিয়ে রেখেছে। ক্লেদ ও মর্যাদার এমন সহৃদয় অথচ মর্মান্তিক রচনা সেই সাময়িক ঘটনা নিয়েও যে সম্ভব হেলো, তা লেখকের ঐ মৌল মূল্যবোধের যাথযাথ্যে।

মানুষের জীবনে সমস্যা অসংখ্য। অসুখী সংসারের দুঃখবৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করে স্বয়ং টলস্টয় তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের সূচনা করেছেন। এবং আধুনিক যুগের সঙ্কট-বহুলতা মনে রেখেই সম্ভবত লরেন্স তাঁর একটি বিতর্কিত উপন্যাসের আরম্ভ করেছিলেন সাম্প্রতিক কালকে 'tragic age' বলে বিশেষিত ক'রে, কিন্তু আমরা যে এই দুর্বিষহ কালকে 'tragically' নিচ্ছি না, তাও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ঘোষণা করেছিলেন। আর এই ভাবেই তো সময় বয়ে চলেছে। মানব-সভ্যতার জন্ম-জন্মান্তর ঘটছে যুগ-যুগান্তরে। এবং এই সময়স্রোতের টানে সংসারে যে-বিপর্যয় আসছে—বিভিন্ন কালপাত্রের বোধে ও ভাবনায় যে সংঘর্ষ, চিন্তাশীল লেখকরা তাকেও গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করছেন। সরোজ-কুমারের এ-জাতীয় একটি অবিস্মরণীয় গল্প: 'বনস্পতির দুঃখ'। পিতার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মানদণ্ডে পুত্রদের জীবনাচরণ বিশৃঙ্খল ঠেকে, তার জন্যে তিনি দুঃখবোধ করেন—কিন্তু নিরুপায়ভাবে সব তাঁকে সহ্য করতে হয়; আপন আদর্শে নিরুপদ্রব ঘরবাঁধার স্বপ্ন তাঁর ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল ভাবেন—'আশ্চর্য এই যুগ। মানুষ যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। পুত্রপৌত্র নিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধবার উপায় নেই।' পুত্রদের কিছু করবার নেই। স্ব স্ব ভাবে তারা পরিণতি খুঁজছে, পাচ্ছেও হয়তো। পিতার জন্যে বড়জোর দুঃখবোধ করে। কিন্তু 'পৃথিবী যে ছোট হয়ে আসছে', দিকে দিকে 'দ্রুত পরিবর্তন'; তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদেরও যে চলতে হবে—তাই তারা চলছে—স্থবির পিতার স্বপ্ন-রচনায় অংশ নিতে পারছে না। পারবেও না। অগত্যা সন্ধ্যার পৃথিবীতে প্রাচীন চাঁদ দেখা দেবে, লেখক এই বৃদ্ধ মানুষটির দরদী হিসেবে একমাত্র তাকেই আশা করেছেন। লেখকের গভীর সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্পর্শে গল্পের শেষ দিকটা তাই যেমন আবেগে মন্থর, তেমনি আন্তরিকতায় ভরাট। এখানে কবিধর্মের সমীপবর্তী হয়েছেন লেখক। তাই এই বিষণ্ণ বর্ণনা:

'আতাগাছের দিকে অন্ধকার যেন আলকাতরার মতো জমাট বাঁধবে। কে জানে আজ কী তিথি। চাটুয্যেদের নারকেল গাছের আড়ালে এক ফালি বাঁকা চাঁদ উঠবে কিনা। ওঠে যদি, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে।' অথবা একেবারে শেষে একই বাক্যাংশের এই অর্থপূর্ণ পুনরাবৃত্তি : 'ওঠে যদি আজ বাঁকা চাঁদ, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে·· সে হয়তো বুঝবে।' বাঙালী চরিত্রের সাংসারিক আসক্তি যদি এই গুণান্বিত আর্দ্রতার জন্যে দায়ী হয়, সেই একই স্বভাবের উদার বৈরাগ্যপ্রবণ দিকের ভূমিকাও তবে অন্য কোনো গল্পের নির্মম পরিসমাপ্তির জন্যে নিশ্চয়ই স্বীকার্য। আর সেই গল্প হলো 'নিবারণের মৃত্যু'—দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেদনের প্রসারে এবং গভীরতায় এর স্থান শুধু বাঙলা গল্পসাহিত্যে নয়, বিশ্বগল্পসাহিত্যেও স্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠের মধ্যে অবিসম্বাদিতরূপে নিশ্চিত হতে পারে। বৃহৎ পৃথিবীতে কোনো এক সাধারণ নিবারণনামা ব্যক্তির মৃত্যু যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, তার স্ত্রী-সন্তানের ছোট সংসারে কোনমতেই তার অভাব যে সামান্য নয়, এ যেমন সরল সত্য, তেমনি স্ত্রী-সন্তানের নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কে জনৈক নিবারণ যতই অবিচ্ছেদ্য হোক, শত শতাব্দী-প্রাচীন অসংখ্য মানুষের কলরবে মুখর উন্মুক্ত আকাশ-আলিঙ্গিত আদিগন্ত জগতে তার বাঁচা ও মরার ইতিহাস যে কিছুমাত্র নয়, তাও তেমনি এক কঠিন সত্য। এই দুই অত্যাজ্য সত্যের মুখোমুখি হতে গিয়ে আলোচ্য লেখকের জীবনদর্শন ও রচনা-কৌশলগত প্রতিভা এক চরম অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। 'বনস্পতির দুঃখে' গতি আর স্থিতির সংঘাত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 'নিবারণের মৃত্যু'তে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের গতি বৃহত্তর জাগতিক জীবনের গতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং প্রথম দ্বিতীয়ের সাথে তুলনায় পদে পদে পরাজিত হচ্ছে। 'নিবারণের মৃত্যু' সেই পরাজয়ের ইতিবৃত্ত। ট্রেনের হুকার ছিল নিবারণ। সেই নিবারণের জীবন্ত পরিচয় এ-গল্পে যখন অবসিত হোলো মৃত্যুতে এবং মৃত্যুর প্রসঙ্গটি যখন চলমান ট্রেনের গতির দ্রুততালে বাজতে লাগলো, তখনই বুঝলাম বিষয়ে আর বিন্যাসে কী অমোঘ সামঞ্জস্যই না অনায়াসে রচিত হয়েছে,—কত আপাতসহজেই না প্রকরণে ও প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্গতি তৈরি হয়ে গেল! তাছাড়া নিবারণের শিয়রে মৃত্যুর নিশ্চিত পদক্ষেপ শুনতে পেয়েও কেন তার স্ত্রী নির্জন ডোবার জলে. বুকসমান দাঁড়িয়ে তার দুঃস্থ অবরুদ্ধ সাংসারিক জীবনের সমস্ত বর্তমান ক্লেশ ও ভবিষ্যৎ দুঃখ সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়ে যায় ও আবার কেমন ক'রে সে যে চেতনার জগতে ফিরে এসে তার ভাগ্যের সাথে যুদ্ধে তৈরি হতে থাকে, তা লেখকের গভীর-অবগাহী জীবনবোধের স্মারকরূপেই পাঠকের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।

পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ডোবার জলে আকণ্ঠ ডুবে থেকে নিবারণের স্ত্রী তরুবালা যেমন সংসারের সুখদুঃখ থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, তারপর ঘোষাল-গিন্নির কণ্ঠস্বরে জেগে উঠে আবার রূঢ় পৃথিবীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, লেখকের ভাষায় তার চোখে যেভাবে তখন 'স্মৃতির তিমির বিদীর্ণ ক'রে ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাস্তব পৃথিবীর রূপ'—ঠিক তেমনি অথচ তার চেয়েও সচেতন, স্থায়ী ও বিশুদ্ধ আত্মবিস্মৃতি এবং অনেকটা তার মতই সংসার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যপূর্ণ অনুরক্ত দৃষ্টি যে-কোনো সৎ শিল্পীর সহজাত হওয়া কাম্য। সরোজকুমার সেই বিরল সৎ শিল্পীদের একজন। এবং তাঁরই যাদুকর-লেখনীর প্রভাবে তরুবালা, এমনিতে সে যত সামান্যই হোক, অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্য বিবিক্ত নির্বিকার শিল্পী-মানসিকতার বিশুদ্ধ স্বপ্নলোক লাভ করেছিল। কিন্তু সেই অদ্ভুত স্বপ্নবাস তার স্থায়ী হয়নি। কেননা সে মর্ত্যজীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই একান্ত আসক্ত ও প্রত্যাগত। তার সেই আত্মবিস্মৃতি কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্তের জন্য মাত্র।

এমনি আরো বহু প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতবিশিষ্ট ও গভীর মাত্রাযুক্ত সফল গল্প-উপন্যাসকারের পক্ষে অক্ষয় স্মরণ-স্বর্গবাস তাই তর্কাতীত। কেননা সূক্ষ্মকৌতুক ও স্নিগ্ধ করুণের চিত্রণে তথা গভীর ব্যাকুল আত্মবিনিয়োগ ও সহজ কঠিন আত্মবিস্মৃতি উভয়তই সরোজকুমার তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথমাবধি প্রায় সমান সার্থক। এবং তাঁর বিশিষ্ট প্রাণমনঃশক্তির মূলে আবহমান বাঙলার আকাশ ও মাটি অবিরাম রসসঞ্চার করে সাফল্য থেকে সমধিক সাফল্যে তাঁকে ক্রমাগত পৌঁছে দিয়েছে।

সরোজকুমারের শ্রেষ্ঠগল্প : ভূমিকা। বিহার সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত ১৯৫৬

লোকায়ত বা 'সাধারণ্য'-জীবনের অসাধারণ ট্রিলজি : 'নূতন ফসল'

ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী-সোমলতা

'লেখনীটি সূক্ষ্ম ও শান্ত, একটু বা কোমলার্দ্র। জীবনের যে খুঁটিনাটিগুলি উপেক্ষিত, অন্তর্দৃষ্টি তার প্রতিই বেশি উৎসুক। ···পবীক্ষা বা পরীষ্টির···সন্ধানী···সংগ্রামী।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোলযুগ'

নদীর দেশ বাংলা—তার কথাসাহিত্যে নদী তাই চিরকাল লীলাময়ীর বিশেষ একটি শক্তিবেগে প্রবহমান। উনিশ শতকের একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে শিলাইদহী পদ্মার ভূমিকা ঐতিহাসিক। পরবর্তী কালে পদ্মার মাছ-ধরা কুবের মাঝিরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রধান উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে। তাছাড়া আঞ্চলিকতার নিরীক্ষা বা লোকায়তিক সমীক্ষা হিসেবে তারাশঙ্করের কালিন্দী, কোপাই থেকে বিভূতিভূষণের ইছামতী, এমন কি তাঁদের তুলনায় তরুণতরদের হাতে তেঁতুলিয়া, তিতাস, গঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন নদী বিচিত্রধর্মী বাঙালী জীবনের ঔপন্যাসিক মুকুরের কাজ করে এসেছে। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ট্রিলজি 'নূতন ফসল' উপন্যাসের 'ময়ূরাক্ষী' তেমনি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। কারণ এ-নামাঙ্কিত উপন্যাসটি তাঁর অবিস্মরণীয় 'ট্রিলজি' বা ত্রয়ী-উপন্যাসের প্রথম খণ্ড।

বিশ্রুত পত্রিকা পূর্বাশার ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যার সম্পাদকীয়ে 'কথা-সাহিত্যের ফসল' নামে কবি, ঔপন্যাসিক ও সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য উক্ত 'ময়ূরাক্ষী'-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : "গ্রীক আমলে পরস্পর-সম্পর্কিত নাটক-ত্রয়ীর নাম ছিল ট্রিলজি। তরুলতার নিয়মে মানবজীবন বা ঘটনা বিসর্পিত হতে পারে ডালপালা মেলে দিয়ে। তার প্রত্যেকটি ডাল বা শাখা একটি তরু বা তরুলতা বলে মালুম হবে একটু নজর দিলেই। এই একটু নজরেরই কারবার করতেন প্রাচীন পাশ্চাত্যের নাট্যশিল্পীরা। ইদানীং এই শিল্পরীতি সাহিত্যের উপন্যাস-শাখায় ছড়িয়ে পড়েছে দেখা যায়। বাঙালী শিল্পীরা পাশ্চাত্যের পশ্চাতে থাকতে চান না, সুতরাং বাংলা উপন্যাসেও আমরা একাধিক ট্রিলজি দেখতে পাই। ··'নূতন ফসল' একটি ট্রিলজি। 'ময়ূরাক্ষী' একটি বৃহৎ নদীর শাখানদী।"

এই শাখানদী বেয়ে সরোজকুমার সংবেদনশীল মর্মজ্ঞের মত নির্লিপ্ত-সানুরাগ প্রকৃতিস্থ পদক্ষেপে বাঙালী চাষীর গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করেছেন এবং বাঙালী সহজিয়া

বৈষ্ণবের পথে, পথের আখড়ায়। 'ময়ূরাক্ষী'র পর 'নূতন ফসলে'র দ্বিতীয়খণ্ড 'গৃহকপোতী' উক্ত চাষী-বৈষ্ণবদের জীবনসমস্যার জটিলতর বিষণ্ণতম বিস্তার। আর তৃতীয়ে অর্থাৎ 'সোমলতা'য় আমরা সেই জীবনসঙ্কটের আতল গভীরতাকে স্পর্শ করি, সমস্যা-সমীকরণের প্রসন্ন বেদনায় উত্তীর্ণ হই। চাষী ও সহজিয়াদের সরল সাধারণ জীবনে যেন গ্রীক নাটকের ধ্রুপদী যবনিকা নেমে আসে।

'নূতন ফসল' প্রকৃতপক্ষে 'মেজো গল্পে'-'সেজো উপন্যাসে'-অধ্যুষিত বাংলা কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রের উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলায় মাত্র কতিপয় 'কান্ত-দান্ত' অভিনব-অভিজ্ঞতার একটি। চাষী-জীবনের ও সহজিয়া সমাজের বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ বিষয়গুলির এমন সাবলীল ও অকৃত্রিম গভীরগামী কাহিনীবিন্যাস সুদুর্লভ। এই ঘটনার গুরুত্ববোধে সোচ্চার সঞ্জয়বাবুর বিশ্লেষণী মন্তব্য তাই অবশ্যলক্ষণীয়: " 'ময়ূরাক্ষী'তে সরোজকুমার যতটুকু বেশি নতুন ফসল তুলতে পেরেছেন, ততটুকু তাঁর নাগরিক চিত্তবৃত্তির দরুন। চাষী সংস্কৃতিতে অনুরক্ত মনই চাষী-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ছবি পরিবেশন করতে পারেন বলে যে একটি ভ্রান্ত মতবাদ কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছে, তা যে একান্ত মিথ্যা, তা সরোজকুমারের মত বাঙালী ঔপন্যাসিকরা চাষী-জীবনের অন্তরঙ্গ আলেখ্য তৈরি করে দেখাতে পারছেন।

কাজটি কঠিন সন্দেহ নেই। কঠিন—এই জন্যে যে, নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে গ্রামীন জীবনের প্রতি তাকাতে গেলে অনেক সময় জবরদস্তিতে গ্রামীন চরিত্রে নাগরিকতার ছায়াপাত করা হয়ে থাকে।"—এই জবরদস্তির ভাব ছিল না বলেই বোধহয় 'পদ্মানদীর মাঝি'তে মানিকের সার্থকতা এবং 'নূতন ফসলে' সরোজকুমারের সাফল্য তুল্যমূল্য বিচারে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা। অবশ্য মানিকের মধ্যে সামাজিক-চেতনা গ্রামীন মহাজনদের শোষণে-বঞ্চনায় যেরূপ চিহ্নিত, সে-তুলনায় সরোজকুমারে গ্রামের ব্যক্তি-সামাজিক অবস্থান-অধিষ্ঠান, যৌথ প্রবণতা ও পরিণাম সমধিক লক্ষণীয়—বিষয়-নির্বাচনেও উভয়ের বৈপরীত্য তাই সহেতুক; মাঝির জীবন ও চাষী-সহজিয়ার জীবন এক স্তরের নয়, প্রথমে যদি অর্থনৈতিক নৈরাশ্য প্রবল, দ্বিতীয়ে তবে সামাজিক ও ভাবাত্মিক ভরসা গভীর। অন্তত সেকালের আচারিত জীবনযাত্রায় চেয়ে একথাই সত্য মনে হতো অনেকের। এবং পদ্মার সঙ্গে মাঝির জীবন ও ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে চাষীর জগৎ এতই ঘন-বিজড়িত যে, তাদেব স্বতন্ত্র চলাচলক্ষেত্র উভয় নদীর নামচরিত্রমাহাত্ম্যেও যথেষ্ট সাংকেতিক, তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয়ের সাঙ্কেতিকতা এতদূরবিস্তৃত যে, 'ময়ূরাক্ষী'র প্রারম্ভে তার এক নাতি-দীর্ঘ বর্ণনাশেষে সরোজকুমার যখন এই মন্তব্যে পৌছন: 'আবার দহের কাছে

(ময়ূরাক্ষী নদী) যেন স্থিরযৌবনা বিলাসিনীর মত, তার নিস্তরঙ্গ নীলাভ কালো জল লোভার্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।' তখন সঞ্জয়বাবুর মত মননশীলের সংগত সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এরকম : 'ধ'ার মেয়ে সীতাকে যেমন ধরিত্রী ডেকেছিল, তেমনি প্রত্যেক চাষীজীবনকে মৃত্যু হাতছানি পাঠিয়ে দেয় এবং তারা অবলীলায় মরে যায়। কিন্তু ময়ূরাক্ষীর বিনোদিনী সীতা না হয়ে বেঁচে গেল।' এজন্য বিনোদিনীর দুই প্রস্থের উত্তরাধিকারই হয়ত দায়ী—সে যেমন চাষীগৃহস্থের বধূ, তেমনি সহজিয়া বৈষ্ণবদের অন্তরঙ্গ নায়িকা, আদ্যন্ত তার জীবনকথা তাই সর্বোপরি এই সত্যেরই ধারকবাহক : 'তোরা না হইবি সতী, না হবি অসতী, রহিবি জগৎমাঝে।'—আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী সত্যসত্যই সদসৎ দুই পথ পেরিয়ে পরে সহজের পথ এসে ধরেছিল। তাকে ধরতেই হয়েছে, কেননা, তাকে বাঁচতে হয়েছে। আর তার বাঁচা, বেঁচে ওঠার ইতিহাসই মুখ্যত লিপিবদ্ধ এই ত্রিবেণী-উপন্যাসে। 'সোমলতা' তথা সমগ্র উপন্যাসটির তৃতীয় খণ্ডের শেষ ছত্রে (প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, 'সোমলতা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়ে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল) এক ঝলক সূর্যরশ্মির মত লেখকপক্ষে ধ্বনিত একটি অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল মন্তব্যে বিনোদিনীর যথার্থস্বরূপ স্বর্ণবর্ণে কিরিত হয়েছে, যাকে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় শ্রীকুমারবাবু এইভাবে লক্ষ্য করেছেন : '...এই প্রত্যাবর্তন-মুহূর্তে লেখক তাহার প্রতি সাঙ্কেতিক গৌরব আরোপ করিয়াছেন—সে যেন কলঙ্কে ও মহিমায় মাখামাখি, ধূলি ও চন্দনে অনুলিপ্ত বসুন্ধরার প্রতীক।' 'নূতন ফসল' এই বিচিত্র-বসুন্ধরার বিশুদ্ধ কাহিনী। —বলা উচিত : বিশোধক কাহিনী। "The book clears the air. An open mind coming to it cannot fail to be refreshed and strengthened by the voyage down the river of a woman's life, and if the book is followed to its end, the voyager will discover—that there is joy beneath sorrow, joy through sorrow." (জঁা ক্রিস্তফ উপন্যাসের ভূমিকাংশ : প্রসঙ্গ-প্রয়োজনে এখানে সামান্য পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত)।

যে-প্রত্যাবর্তন-মুহূর্তের কথা উপরে বলা হয়েছে তার তাৎপর্য কী, কোথায় বিনোদিনী ফিরছে, কোথা থেকে, কীভাবে—গিয়েছিলই-বা কোথায়, কেন, কেমন করে ; গিয়েছিল যদি, আবার ফিরছেই বা কেন, আর ফিরছে-যে এবং গিয়েছিল যে, সে-দুজনই কি এক, না এক-ই দুজন ? এত প্রশ্নের অন্তর্গত অনেক ঔৎসুক্য কৌতূহল আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার জনয়িতা হতে পারে একটি সাধারণ চাষী-বধূ ? সে নারী সাধারণ বটে, কিন্তু সামান্য নয় ; তাহলে অসামান্যও কি ? কেন ? লেখকের

গভীরসন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি, সত্যপ্রিয় রসবাদিতা এবং মানবজীবন সম্পর্কে স্থিরলক্ষ্য সহজ মূল্যবোধ এই বিশিষ্ট চরিত্র সম্ভব করে তুলেছে। সে যুগপৎ চাষী-বধূ ও বৈষ্ণব-প্রণয়িনী। লেখকের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাধন্য বাস্তবতাপুষ্ট আন্তরিকতাই এ-সৃষ্টিপ্রয়োগের মূলধন। শ্রীকুমারবাবু এর সমধিক সমর্থনে যে-পটভূমিকা বিশ্লেষণ করেছিলেন তা এখানে বিশেষ মূল্যবান মনে হয়। তিনি লিখেছিলেন : 'বাঙালী সমাজে বৈষ্ণবের জীবনযাত্রা যেন রোমান্সের শেষ আশ্রয়স্থল। ইহার অসামাজিক স্বাধীনতার ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ দিয়া হিন্দুসমাজের রুদ্ধঘরে দক্ষিণবায়ুর স্পর্শ কতকটা স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হইতে পারে। ‥এই বৈশিষ্ট্যটুকু বাস্তবানুগ ঔপন্যাসিকের উপজীব্য হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ঠিক মাত্রা রাখিতে পারেন না—সুর চড়াইয়া ও অতিরঞ্জিত বর্ণ-বিন্যাসের দ্বারা বিষয়কে বিকৃত ও অবিশ্বাস্যরূপে আদর্শায়িত (idealise) করিয়া ফেলেন। শরৎচন্দ্রের কমললতা (শ্রীকান্ত) ও তাহার আবাসকুঞ্জ এই অসংযত আদর্শবাদের উদাহরণ। তারাশঙ্কর এখানে ('রাইকমল') শরৎচন্দ্রের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার প্রধান ত্রুটি ভাবাবেগমত্ততা, বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া উচ্ছ্বাসের অপব্যয়, জীবনের সত্যকে অতিক্রম করিয়া ইহার কাল্পনিক কাব্যসৌন্দর্যের প্রতি অসংযত প্রবণতা।' পক্ষান্তরে : 'বৈষ্ণবজীবনের সত্যচিত্র হিসাবে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী ও সোমলতা—এই তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বৈরাগী-বৈরাগিণীরা বাস্তবসমাজজীবনের সহিত বেশ সুসংবদ্ধ—অতিরিক্ত আদর্শবাদের দ্বারা স্ফীত ও বাষ্পায়িত হয় নাই।' কারণ : 'লেখকের একটি বিশেষ গুণ এই যে, চরিত্র-পরিকল্পনায় ও মন্তব্য-প্রকাশে তিনি কোথাও সংযম ও পরিমিতিবোধ হারান নাই।' এবং সবচেয়ে যা বড়ো কথা : লেখক চাষীকে করেছেন বৈরাগীর দোসর, বৈরাগীকে চাষীর সোদর—বস্তুতপক্ষে এই পারস্পরিক সত্য-সম্বন্ধটি নিরূপিত হওয়াই এ-প্রসঙ্গে এতদিন অত্যাবশ্যক ছিল। সরোজকুমার 'নূতন ফসলে' সেই আকাঙ্ক্ষিত-বাঞ্ছিততম ফসলই ঘরে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে একটি বৃহৎ শূন্যতা-দুর্বলতার অবসান ঘটল, আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের গর্ববোধ তাই সহেতুক, সঙ্গততম। বাংলার পল্লীতে চাষী বাউলকে ধান যোগায়, বাউল চাষীকে গান শোনায়—এই বহিরঙ্গ-সম্পর্কের অন্তঃকরণে আছে আরেক নিবিড়ত্বের সম্বন্ধ-বন্ধন, সেই সহৃদয়হৃদ্য সংযোগসম্ভাষণ-ভাষ্যই এ-উপন্যাসের সমন্বয়-সমীকরণে উন্মোচিত—যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ঘাতপ্রতিঘাত জয়ে-পরাজয়ে সেই এক অঙ্গাঙ্গী অন্তঃস্রোত প্রবহমান, সেই এক-অন্তরাত্মার অন্তরালবর্তী ধ্যান,

এক অখণ্ড 'মানব-জমিনে'র সোনা-ফলানো আবাদ-আয়োজন। উভয়ের আপাত-বিভিন্ন ভূমিকার নীচে এক ও অনন্য বসুন্ধরা-ভূমির সহযোগ-সংযোগ—সরোজকুমার বক্ষ্যমান গ্রন্থে তাকেই নিরীক্ষা ও আবিষ্কার করেছেন শিক্ষিত সহৃদয়তায়, সমতুল্য-মূল্যায়ক দরদে।

কৃষকপ্রধান পল্লীজীবনের বহুবিধ আচার-আচরণ, ব্রত-পার্বণের মধ্যে ব্যাঙ পুজো, পুষ্করমেঘের প্রাসঙ্গিকতা, ডাইনী-ওঝার নানাবিষয় নির্বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতায়, পুঙ্খানুপুঙ্খে লেখক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন, যথাস্থানে যথামাত্রায়। আর এ-সমস্তের মধ্যে দিয়ে বিনোদিনী বুঝি নারী হয়েও নদীর মতো ময়ূরাক্ষীর স্বভাবে বয়ে চলেছে, উৎস থেকে ঠিক নয়—উচ্ছ্বাস থেকে ঘূর্ণীতে, তারপর নতুন উচ্ছ্বাসে ও পরিণামে—সেই সচল প্রবল প্রবাহের কয়েকটি সুনির্বাচিত বাঁকের ভাবভঙ্গি, দৃশ্য ও দর্শনের চালচিত্রসমেত প্রতিমা এ-গ্রন্থের নিপুণশিল্পে সাবলীল ছন্দে ও স্বাচ্ছন্দ্যে উৎকীর্ণ। যেন বসুমতীর পুষ্পিত ফসলের একটি নৈসর্গিক শক্তিলীলা পালায় পালায় স্পন্দিত হচ্ছে। একদিকে তার বৈষ্ণবদের পথের-ধারের আখড়া, আরেকদিকে গৃহস্থের আঙ্গিনা। তার অতীতে গৌরহরি, বর্তমানে হারান। ভবিষ্যতে ছেলেমেয়ে? না— এরা কেউ নয়, কিন্তু এরা সবাই, তাদের অঙ্গীকৃত সম্মিলিত সে-নিজেই—অভঙ্গুর অটুট সে-একা, অথচ যেন সবাই তার একান্তে ঐকাত্মলীন। সে অর্থাৎ সেই সহজ সনাতন আনন্দবিনোদিনী, শক্তিপ্লাবিনী প্রজাপ্রসূতি; সমন্বয়-বিধায়িনী আদি-অকৃত্রিম 'প্রকৃতি'। অথচ মাটির-শরীর-সংযুক্ত সেই চাষীবধূর ইহজীবনে আবর্তমান এড়িয়ে ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কা আদৌ বৃহৎ নয়। তবু স্বরূপে যেহেতু নারী, তাই অবিস্মৃতির স্বপ্নলোকে মাঝে মাঝে ব্যাকুল তার আবেশপ্রয়াণ অবাস্তব নয়। সেখানকার দোসর হিসেবে গৌরহরি বিনোদিনীর জীবনযাত্রায় তাই একটি নাতিপ্রখর সঙ্কট, কিন্তু একজন অনপ্রধান পাত্র। তুলনায় তারাপদ তার সাময়িক কটুকঠিন এক সমস্যার উপলক্ষ-কারণ, একটি আকস্মিক গ্রন্থি—আবেদনে অস্থায়ী, কিন্তু উপযোগে গুরুত্বপূর্ণ। আর হারান তাকে আড়াল ক'রে চিরবর্তমান। তারাপদকে ঘিরে তাই একটি পল্লীসামাজিক কটুকষায় সমস্যা বধূ বিনোদিনীর পারিবারিক জীবনে অতি অতর্কিতে এক স্তরীভূত মেঘোদয় ঘনালো, সেই তার অনন্য অগ্নিপরীক্ষা-মুহূর্তে বিনোদিনী যে অনির্বচনীয় মূর্তি পরিগ্রহ করল, নবীন-সীতার সে-বর্ণনায় লেখক অতুলনীয় সার্থকতার চূড়ায় পৌছেছেন: 'ওর জ্বলন্ত চোখের ক্রুদ্ধ শূন্য দৃষ্টি, তারাপদর মনে হল যেন দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গেল। মনে হল ও যেন একা। এ-সংসারের সমস্তকিছু যেন ওর

সান্নিধ্য থেকে ঝরে ঝরে পড়ে গেল।' প্রকৃতি-স্বভাবা নদী-স্বরূপিণী বিনোদিনীর সঙ্গততম বর্ণনাই বটে। কঠিন বর্তমানের শরীর থেকে এভাবেই ভবিষ্যতে বিনোদিনী মুহূর্তমধ্যে অপসৃত হয়। এবং অন্যপূর্বা অতীতের আশ্রয়-সংযোগ কাটাতেও এই তরুণীলতা বর্তমানের কিছু কালক্ষেপ হয়, কিছু ক্ষতবিক্ষত টানাছেঁড়াও ঘটে, ক্রমে ক্রমে একটা সহজ প্রাকৃতিক নিজস্ব পরিণামকে সে-জীবন তবু লাভ করে, করতেই হয়। স্বতঃস্ফূর্ত বিনোদিনীর তা-ই হয়েছিল। গৌরহরিকে কাটিয়ে হারানকে জড়িয়ে এবং ছাড়িয়ে সেই তার সাধারণ-অসাধারণ জীবনযাত্রাই এ-উপন্যাসের উপজীব্য। কিছুকে-কাউকে এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে।

'সোমলতা'র সেই পরিণামে পৌঁছতে যে-পথপরিক্রমা বিনোদিনীকে করতে হয়েছে, সে-প্রসঙ্গে এবং তার শিল্পমহিমা সম্বন্ধে সঞ্জয়বাবু লিখেছিলেন: 'সচল জীবনের গতি বাস্তবিক তিনটি—সৎ, অসৎ ও সহজ। তার উপর শিল্পীর বিচারবুদ্ধির যাচাই-বাছাই চলে, পক্ষপাতিত্ব চলে। সরোজকুমার নায়িকা বিনোদিনীকে তিনটি পথ ঘুরিয়েছেন এবং লেখক হিসেবে তিনি নিজে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন 'সহজ' পথের প্রতি। এখানে ষোলো-আনা বাঙালিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কথাশিল্পী। ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এ-যুগের বাঙলা কথা-সাহিত্যকে।' বিনোদিনীর জীবননাট্যে ত্রিস্রোতের কোন্‌টি সহজ তার বিচার শুরু হয়েছে 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসটিতে।—'চাষী-বৌ বিনোদিনী ময়ূরাক্ষীতে সৎপথে বিচরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তদঞ্চলের সমাজ তাকে সৎ থাকতে দিল না।' সুতরাং অন্য পথ, অন্য পদক্ষেপ অপরিহার্য হলো।

তারপর ঘটনা-পরম্পরায় কাহিনী ও মূলচরিত্র বিনোদিনীকে সহজিয়া বৈষ্ণব রসময়-ললিতাদের যে-আখড়ায় এসে কিছুক্ষণের জন্যে থামতে হয়েছে, স্বগৃহসমস্যা-সমীকরণেই নিমগ্ন অবস্থায় তার সেখান থেকে আরও নতুনতর অবস্থানে, সমস্যায় সেই বিষণ্ণ জীবনকে পুনঃপ্রসারিত হ'তে দেখা গেছে, সেই সতী-অসতী 'গৃহকপোতী'র নষ্টনীড় কিনার দিয়েও আদি অকৃত্রিম 'সহজ' ময়ূরাক্ষীই প্রবহমান। 'গৃহকপোতী' তথা উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে আশ্রিত মৌল জীবন-ভঙ্গিতে ময়ূরাক্ষীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ঠিক নেই, যেহেতু এখানকার প্রধান পাত্র-পাত্রী গৃহস্থ চাষী নয়, বৈষ্ণব বাউল; কিন্তু তাদেরই সাধন-সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নদীবিধৌত মুর্শিদাবাদের আর্দ্রমাটি মানুষের আর্ত জীবন-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ময়ূরাক্ষীর পরোক্ষ প্রেরণা। এখন প্রশ্ন এই যে, বিনোদিনীর কাহিনী তার স্বামী হারানচাষীর ঘর ছেড়ে রসময়-ললিতার আখড়ায় এসে কিছুক্ষণের জন্যেই বা থামলো কেন? ঠিক থামেনি, বহতা নদীর মতো বাঁক নিচ্ছে। অর্থাৎ

কিছুই তো থামে না, শুধু বদলায়, গতি পাল্টায়। আগেই দেখেছি ময়ূরাক্ষীর বিনোদিনী সৎ থাকতে চেয়েছিল, তথা তার স্বকীয় সত্যে, নিজস্ব সত্তায় নিত্য-বিকাশমান ; কিন্তু তারাপদর মুহূর্তভ্রমকে উপলক্ষ ক'রে সেখানকার পল্লীসমাজ তাকে 'সৎ' থাকতে দিল না। 'গৃহকপোতী'-অংশে বিনোদিনীর 'অসৎ' ভূমিকাই রূপায়িত, যেখানে সে কিছুতেই স্বধর্মে সত্য হয়ে বিকাশমান প্রকাশশীল নয়, স্বামী-সন্তান-সংসার-ছাড়া নিয়তই সে সেখানে বাধ্যবাধাগ্রস্ত, অবরুদ্ধ, নিরুপায়। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত সে এবার মুক্তি-বন্ধনের দোলায়, বেদনাবর্তে তার স্বাভাবিক 'সহজে'র পথে, আপন চরিতার্থতার খোঁজে বেরুবে। পাথুরে পথ কেটে যেমন জলস্রোত। তট ছেড়ে নয়, ছাপিয়ে—নদী। সত্যই বিনোদিনী সাংসারিক পথক্রমের একটি প্রাপ্য প্রয়োজনীয় বাঁক নিতে এই বৈষ্ণবদের আখড়ায় এসে উঠেছিল। ঠিক নদীর মতো ময়ূরাক্ষীর মতোই আবার সে তরঙ্গিত হলো—এই বাঁক তার প্রাণমনঃস্পন্দনের নববেগে সহায়ক হ'ল—সামান্যকালের স্থিতাবস্থা ভেঙে দিয়ে যখন সে আবার বেরুলো নতুন পরিবেশে নতুনতর অভিজ্ঞতায়—তখন সে 'গৃহকপোতী'র ভঙ্গি বদলে সহজ 'সোমলতা'র ছন্দে তৎক্ষণাৎ দুলে উঠতে চাইল। উদ্দেশ্য : স্বায়ত্তের পরিপূর্ণতা, জায়া ও জননীর চরিতার্থতা, কর্ষিতভূমি নারীত্বের নিজস্ব পরিণাম। এখানেই রসময় তথা বৈষ্ণবের 'সহজ' ও গৃহস্থের 'সহজে' পার্থক্য। রসময় সবকিছু এমন-কি নিজেকেও রাধামাধবের পায়ে অনায়াসে সমর্পণ করেছে। নিজের ব'লে সে কিছু জানে না, কিছু চায় না ; কিন্তু বিনোদিনী নিজস্বকে জানে, তার স্বত্বস্বামিত্বস্ত্রীত্বকে পুষ্পে-বীজে চায়, ফলাতে পারে। তাই 'গৃহকপোতী'র শেষাংশে যখন তারাপদ বিনোদিনীদের কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন সে তার কাছে যে-ভালোবাসা-স্নেহপরিচর্যা পেল, তা তার কোন্ পরিচয়ে ? —তার ময়ূরাক্ষী-মাখা দেশের মানুষ, প্রতিবেশী, ঘরের-কাছের-লোক ব'লে। ভিটেমাটির টানে সে যে ক্ষণে ক্ষণে সে-ক'দিন কী উন্মনা হয়ে কাটিয়েছে, মনোযোগী পাঠকের তা স্মরণে থাকার কথা। রসময়দের সঙ্গে তা নিয়ে লঘুসুরের কলহ বিবাদ পর্যন্ত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে কারটা কত ভালো প্রমাণ করতে গিয়ে রসময় মেতেছে রসিকতায়, আর বিনোদিনী মনে-মনে চলে গেছে হারানের গৃহে, শস্যসফল মাঠে, সবুজসমারোহ বাগানে, নিজ অঞ্চলের মাটির জল-হাওয়ায়—এমনকি সেখানে উৎপন্ন শস্যসব্জির মাছের এবং প্রাসঙ্গিক রান্নাবান্নার প্রশংসায় আবেগ-ঘন গলায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে সেখানকার সর্বত্র সে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিফলিত করেছে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে কতকটা যেন মাথুর-বিরহিনীর ভাব-সম্মিলনে। তবে সুগৃহিণীর এই মাথুর-পর্বে স্বতই হাবল-মেনী এসেছে

তাদের মাটিমাখা মাতৃমুখচাওয়া ব্যথাতুর চোখ মেলে হাত বাড়িয়ে, হারান এসেছে তার 'কষ্টিপাথরে'র শরীরে বলিষ্ঠ পেশীর প্রত্যয়ে—সান্নিধ্য দিতে, স্বস্তি দিতে, সুনির্ভরতায়। বিনোদিনীর ব্যাকুলতায় এখনও যে পক্ষিণী-স্বভাব অনস্তমিত, তা তবু গৃহবলিভুক কপোতীর। আত্মসম্মানবোধের অহঙ্কারে অনেক ভাবপ্রবণ মুহূর্তকেই সে ভাবে-ভাষায়-চিন্তায়-ব্যবহারে ছড়িয়ে উড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ক্ষয়ে গেছে অনেকদূর, চলে এসেছে অনেক পথ—তার হাবলমেনী-শস্যসম্পন্ন গৃহের দিকে—হারানের দিকে—তার স্বকীয় **'virgin soil upturned'** অস্তিত্বের দিকে। তুলনায় স্মরণীয় যে, এ-জমি দুরন্ত ডন নদীর নয়, শান্ত নম্র ময়ূরাক্ষীর। এবং তাই এটাই তার 'সহজ'পথের সীমান্ত। 'সোমলতা'য় যে-পর্যন্ত পাচ্ছি।

'সহজ' পথ। কিন্তু পথ সহজ নয়। তাই পূর্বপ্রণয়ী গৌরহরিকে রসময়-ললিতার আশ্রমে দেখে সে ভয় পেয়েছে। গৌরহরিকে ততটা নয়, যতটা নিজেকে। কেননা, আগেই জেনেছি, গৌরহরি-সম্পর্কিত স্মৃতি-বিস্মৃতি-জড়ানো তার প্রাচীন দুর্বলতা স্বল্প সামান্য নয়। শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নকম্পিত দিনরাতের 'স্টিল' ছবিগুলি তার বর্তমান আশ্রয়-অবলম্বনহীন আশ্রমিক অসহায়তার পাকে পাকে জড়িয়ে যে সজীব, সতেজ ও কল্লোলিত হয়ে উঠতে পারত, যে অনিবার্য আত্ম-অসংবরণের ভীষণ মুহূর্ত সে স্পষ্টই নিজের মধ্যে ঘনিয়ে উঠতে দেখছিল, সে-সমস্তকেই সে তার আহত 'গৃহকপোতী'-ডানার ঝাপটায় মুহুর্মুহু সরিয়ে দিয়েছে। সচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার আদল নেওয়ার আগেই সেসব অবদমনের রাজ্যে আবার ফিরে গিয়েছে। 'গৃহকপোতী' বাঁচলো। মানুষীর ক্ষয়-ক্ষতি হলো হয়তো। কিন্তু সামাজিক সত্তায় মানুষ নিয়ত নিজেকে খানিকটা আহত করেই তো এভাবে পারিবারিক-সমষ্টি-সম্পর্কের শৃঙ্খলাকে অব্যাহত রাখছে। এভাবেই ঘটনাচক্রের আকর্ষণে আবৃত্ত হয়ে তরল নদীর স্ফূর্তসরস বিনোদিনী কঠিন মাটির চরিত্রে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। একেবারে শুকিয়ে পাথর হয়ে যে যায়নি, তা অবশ্য ঐ নদী-বিধৌতেরই গুণে ও নৈপুণ্যে। তাই গৌরহরিকে বিদায় দিয়ে সে তার সেই আপন-সৃষ্ট কঠোরতার ভয়ানক পরিবেশে আর সহজে শ্বাস নিতে পারলো না। দাদাকে নিরুপদ্রব আশ্রয় ব'লে না-মানলেও সে আপাতত সেখানে গিয়েই উঠল। কতকটা যেন পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু নিজের থেকে নিজেকে নিয়ে কতদূরে পালানো যায়?

তারই পরীক্ষা 'সোমলতা'য়—উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে। একবার মনে হয়েছিল, বিনোদিনীকে তিনকালে প্রসারিত ক'রে তারাপদকে তার জীবনের

ভবিষ্যপর্যায়ে জড়িত ক'রে দেখা যাবে কিনা। গৌরহরি যদি তার অতীত, হারান বর্তমান, তারাপদ কি তার ভবিষ্যৎ? অসম্ভব। তারাপদকে অতখানি গুরুত্ব ও গৌরব দেওয়া যায় না, তার সে-সামর্থ্য নেই, অধিকারও না। তবু সে তো একবার বিনোদিনীর কাছে হেরে গিয়েও তার কলঙ্ক-অপবাদের 'হেতু' হয়েছিল! সে-ই দেখি উত্তরকালে বিনোদিনীর নির্বাসিত জীবনের দুঃখক্লিষ্ট বর্তমান থেকে পূর্ণতার ভবিষ্যতে যাওয়ার সেতু হ'য়ে উঠল। প্রত্যক্ষে নয়, পরোক্ষে; লক্ষ্যে নয়, উপলক্ষে; আবার। 'গৃহকপোতী'র শেষার্ধে তার সে-পরিচয় সপ্রমাণ বিশ্লেষিত। বিনোদিনীর মা-দাদা তার মুখেই সব তথ্য সত্য জেনে-শুনে, আংশিক বুঝে ও অনেকটা না-বুঝে এবং ভুল বুঝে বিনোদিনীকে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল—এভাবে অনিশ্চিত-নিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে, হারানের দিকে সাংসারিক আরেক ধাপ এগোবার প্রতিষ্ঠাভূমি বিনোদিনী আয়ত্ত করল। এ-পর্যন্ত। তারাপদকে দিয়ে ও নিয়ে বিনোদিনীর আর-কিছু করার নেই, হওয়ার নেই। অথচ তারাপদর দিক থেকে তার রূপতৃষ্ণা 'ময়ূরাক্ষী'তে বিনোদিনীর সাথে তার প্রথম সাক্ষাতেই যা অভিব্যক্ত, বুঝি প্রেমে পরিণতি পেতে পারত। আর ললিতা-তারাপদর সম্পর্ক দেখে বিনোদিনীর যে পরবর্তী বিতৃষ্ণা ও ক্ষোভ ('গৃহকপোতী'-অংশে) এবং 'ময়ূরাক্ষী'র ১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তার মনে অস্পষ্ট ভয়সঞ্চারের তির্যক প্রতিফলনে যা একত্র দাঁড়ায়, তা ধীরে ধীরে বিনোদিনীর পক্ষে গড়াতে পারত কিছু ভালোবাসায়। কিন্তু গভীরতাবাদী এই লেখক সে-পথে কোন নতুন গ্রন্থিসন্ধানে গেলেন না—উভয়ের রুচি-বৈপরীত্যের যাথাযথ্য এবং ঔচিত্য রক্ষা ক'রেই। বরং তিনি দেখালেন, তারাপদ একটি অস্থিরস্বভাব লঘুচিত্ত যুবক। সে না-গ্রাম্য, না-নাগরিক। বিনোদিনীদের কাছে সে বাহবা কুড়োতে নাগরিক জীবনের গল্প বলে, অথচ সে স্বয়ং নাগরিক জীবনের সবরকম সূক্ষ্মতা-সাপেক্ষতা ও ধূসর-জটিলতার বাইরে। এবং প্রকৃত গ্রামের 'মধ্যে' তো সে নয়ই। ধীরশান্ত গহন বিনোদিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনীভূত হওয়া দূরের কথা, সে ললিতার চাপল্য ও প্রগল্‌ভতায় তৎক্ষণে মুগ্ধ। ললিতার স্বভাব প্রজাপতির, আর তার অবাধ প্রশ্রয় তারাপদে; সুতরাং সে অগভীর নারীসঙ্গের সাময়িক আমোদসম্ভোগেই খুশী। নাগরিক জীবনের শিক্ষাদীক্ষা থেকে সে এই ক্ষণআনন্দবাদটুকুই বুঝি লাভ করেছে। আর-কিছু নয়, তার আর-কিছু নেই। পাশাপাশি গ্রাম্য গৌরহরি কেমন? সে ভীরু, কিন্তু দুর্বল নয়। তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই, স্বোপলব্ধির জোর আছে। কিন্তু তারাপদ যতটা ভীরু, ততোধিক দুর্বল। আত্মসাক্ষাতেরও সময় নেই তার—এতই তাৎক্ষণিক মোহ-আকৃষ্ট আবিষ্টতায় সে সত্বর উত্তেজনায় যত্রযত্র ব'য়ে গেছে।

তবে 'ময়ূরাক্ষী'র সঙ্কটকালে পলাতক ছেলেমানুষের ভূমিকা থেকে 'গৃহকপোতী'র পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে অনেক উৎকর্ষ ও উন্নতি দেখিয়েছে। যেন সাবালক হয়েছে তুলনায়। কিন্তু বিনোদিনীর দৃষ্টিতে সেই যে সে ভ্রষ্ট হয়েছে, তারপর আর তার কিছু হওয়ার নেই। বিশেষত হারানের থেকে দূরে গিয়ে বিনোদিনী তার বহুধাবিস্তৃত সম্বন্ধই আঁকড়ে ধরেছে বেশি করে, তা-ই সঙ্গত ও স্বাভাবিক ; হারানের সূত্রে প্রাপ্ত ও সাধিত তার এযাবৎ সমস্ত সুকৃতিই বুঝি ভেঙে যায়, ভেসে যায়, এ-আশঙ্কায় বারবার সে তখন ভিতরে ভিতরে গুমরে মরছে। 'গৃহকপোতী'র শেষার্ধে পৌঁছে বৈষ্ণবদের আখড়ায় মোটামুটি অভ্যস্ত-হ'য়ে-ওঠা বিনোদিনী সম্পর্কে তাই লেখক যখন বলেন : 'যে সুকঠোর নীতির লৌহদুর্গে গৃহস্থ ঘরের কুলবধূ হয়ে এতকাল সে বিচরণ করেছিল, এই ক'দিনে ধীরে ধীরে তা থেকে অনেকখানি দূরে সরে এসেছে', তখনও তার স্মৃতির আকাশে বিলম্বিত ছায়া ফেলে মধ্যাহ্নপ্রতিম হারান এসে দাঁড়িয়েছে, বিনোদিনীর মনে হচ্ছে : 'তার (হারানের) দীর্ঘছন্দ বলিষ্ঠ দেহের কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালে বুকে ভরসা জাগে কত। অমন পুরুষ তো তার চোখে আজও পড়ল না। অথচ কী কোমল, সুস্নিগ্ধ মন!' (এই 'স্বকীয়া'র পাশাপাশি আমাদের মনে হ'তে থাকে, 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে 'পরকীয়া' কপিলার কাছে কুবেরও ছিল অমন 'পুরুষ'।) অথচ হারানের পৌরুষ সে এর আগেও বহুবার জেনেছে ও মেনেছে, সহজেই অনুমেয় ; কিন্তু তার 'সুস্নিগ্ধ মন'কে নিয়ে ভাবনার অবকাশ বুঝি এর আগে সে পায়নি—বিপাকে প'ড়ে বিচ্ছেদের দুর্গম দূরত্বে এখন পাচ্ছে। এতেই সে 'গৃহকপোতী'র নিষ্ঠায় বেঁচে রইল। জেগে উঠল পরবর্তী 'সোমলতা'র সঞ্জীবনী ছন্দে, যে-পরিণামকে সঞ্জয়বাবু এভাবে দেখেছিলেন : 'ময়ূরাক্ষীর বিনোদিনী সীতা না হ'য়ে বেঁচে গেল। বিনোদিনীর এই বেঁচে-যাওয়া, বেঁচে-ওঠার অত্যন্ত গভীর গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসে তারাপদ হ'য়ে রইল একটি সামান্য অধ্যায় মাত্র।

গৌরহরি কিন্তু বিনোদিনীর সব সংস্কার সব সংযম সব আদর্শ ও বাধাছাঁদা-ভাব তথা তার অন্তঃপ্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি দমন-অবদমনের মধ্যেই বয়ে চলেছে তবু। জীবনের প্রথম ও প্রকৃত প্রেমকে নারীত্বের কোন্ কানুনে সে ঠেকিয়ে রাখবে? বিশেষত মানুষটি যেখানে কেবল স্মৃতির সামগ্রী নয়, প্রায়ই শারীরিক উপস্থিতি। তাই হারানের চিন্তায় তারাপদ অচিরেই শূন্যে মিলায়, কিন্তু গৌরহরির নিঃসঙ্গ জীবনযাপন ও নিরালা-একার স্বপ্নসাধনা, বেদনাবৈভব বিনোদিনীর চিন্তায় হারানকেও অপসৃত, বিস্মৃত হতে দেয় মাঝেমাঝে। হারানের সঙ্গে এত বাঁধায় বিজড়িত থাকা সত্ত্বেও। এখানেই বিনোদিনীর সদসৎ নারীজীবনের কঠিনতম সঙ্কট। সে কীভাবে তা পার

হয়ে যাবে তার ওপর নির্ভর করছে তার সিদ্ধি, পরিণতি, চরিতার্থতাই। তার নাট্যস্পন্দিত অকপট ইতিহাস 'সোমলতা'র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অথচ স্বাভাবিক মিতভাষণে ও সুচিন্তিত সাঙ্কেতিকতায় বিধৃত করেছেন এই কথাশিল্পী। সেখানে দেখি মা-দাদার কাছে থেকে, নতুন পরিস্থিতিতে, বিনোদিনীর ভিতরের পীড়ন বেড়ে গেছে। গৌরহরি আবার এসেছে তার জীবনে, একরাত্রির তপঃকঠিন দুর্বল দুঃসময়ে, মহাসঙ্কটে। অত্যন্ত অবল-অসহায় এক অসতর্ক 'নগ্ন'-মুহূর্তে গৌরহরি তাকে সস্নেহ সম্ভ্রমে-সাহচর্যে নিজের শরিক ক'রে তুলেছে, নিজের উত্তরীয় জড়িয়ে দিয়ে সে নিজের গভীর স্পর্শ ই দিয়েছে তাকে, তার দুর্লভ নগ্নতায়, ভীষণ একাকিত্বে সহযোগী দরদের, উপযুক্ত সমবেদনার। গৌরহরিও সকৃতজ্ঞ বিনোদিনীর বিষণ্ণ-কোমল প্রসন্নতা লাভ করেছে। পরস্পর পরম-লাভ, একে অন্যে চরম ও অনন্য অংশগ্রহণ, নিঃসন্দেহ। সমগ্র উপন্যাসে তথা বাংলা কথাসাহিত্যে এমন সঘন-সংহত কঠিন মুহূর্ত, এত আশ্চর্যসংযত রসরহস্যলিপিনৈপুণ্যের গহন-গভীরতা স্বল্পই শিল্পিত হয়েছে। এক মহার্ঘ ধ্রুপদী নাটকের যবনিকা সেই নিশাবসানের মাহেন্দ্র-লগ্নে চাষীবধূ-বৈষ্ণব-বাউল-সন্নিহিত আবাদ-বাংলার গ্রামপ্রান্তে ক্ষণকালের জন্য যেন 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবে' কেঁপে উঠেছে। আদি-অকৃত্রিম ক্ষণ-শাশ্বতে।

অবশেষে নির্ণীত ভবিষ্যতের অন্তঃস্থ ডাকে বিনোদিনী বর্তমান অশ্রুনদীপারের ধূলিশয্যা ছেড়ে 'একবেণী' শির ও হৃদয় চেপে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং সে হারানের সঙ্গে তার নিজের সংসার-গৃহপথে নিঃশব্দ নিশ্চিত যাত্রায় মেতেছে। সামনে হারান স্বয়ং এবং হাবলমেনী—সে ফিরছে। তথা স্বামী-সন্তান-সম্পত্তির দিকেই চাষীবধূ বিনোদিনী তার নতুন ও শেষ বাঁক নিচ্ছে দেখতে পাই। এই গৃহ-প্রত্যাবর্তনের লগ্নে অনন্ত শস্যপ্রান্তরের বুকে অবগুণ্ঠিত বিনোদিনীর লালপাড় শাড়ির 'অমল-ধবল' পালে যে 'মন্দমধুর হাওয়া' লেগেছে, তার সমীচীন স্বরূপসন্ধানে যথাযথ সেই ভাবপ্রতিমাটির অমোঘ নিরীক্ষা করেছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সে যেন কলঙ্কে ও মহিমায় মাখামাখি, ধূলি ও চন্দনে অনুলিপ্ত বসুন্ধরার প্রতীক'। বিনোদিনীকে এহেন স্বরূপগত-সমীক্ষায় 'Une Force De La Nature' বা 'প্রাকৃতিক শক্তি' বলেই অব্যর্থ মনে হয় সত্য। তাই তার আরম্ভে 'ময়ূরাক্ষী', অন্তে 'সোমলতা'—এ-দুটিও প্রতীক, নদীর উচ্ছল তরঙ্গ তার বহিরঙ্গে, মাটির উর্বর উজ্জীবনী মাদক সৃষ্টিশক্তি তার অন্তরঙ্গে ; সুনিবিড়-নিহিত।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পর আরেক নবীন ধারা সংযুক্ত হল এই বিশিষ্ট বিনোদিনীর নির্মাণে, তার চাষী-বাউল-মিলিত বিচিত্র উপযুক্ত-চলমান চালচিত্র-সংরচনে এই 'ময়ূরাক্ষী'-'গৃহকপোতী'-'সোমলতা'র সাধারণ্য-ব্যাপ্ত লোকায়ত

কথাকাব্যপ্রবাহে। সেই 'Eternal Pain' ও 'Eternal Passion' এই প্রথম প্রকৃষ্ট সার্থকতার 'সত্য'-সঙ্গমে একটি চাষীবধূর প্রকৃত ও প্রাকৃত জীবনে এসে যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বর্ণ সুযোগ পেল। যদিও সে-নারী প্রায়শ সেই শোপেন-হাওয়ার-কথিত-মতোই 'pays the debt of her life not by what she does, but by what she suffers', তথাপি সে ঢের কর্মিষ্ঠ; আমাদের সেই শরৎচন্দ্রের অতিকল্পিত পুত্তলী কমললতা-জাতীয় কেউ নয়, হতে পারে না; তারাশঙ্করের 'রাইকমলিনী'দেরও সে দূরে রেখেছে, বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে; তার ধাত সত্যবাস্তবের খাঁটি অভিজ্ঞতায় আসল ধাতুতে গঠিত, তার জাত আলাদা। 'Elemental' বাঙালির সমাজ, স্বভাব এবং মানবপ্রকৃতি-পরিব্যাপ্ত গ্রাম-বাংলাকে চরমাশ্রয় ক'রে সে কেমন অনবদ্য অভিনবীনতায় ফুটে উঠেছে এখানে—তাকে ঘিরে চাষী ও বৈষ্ণবসমাজের ঘনিষ্ঠতর সত্যতম পরিচয় প্রমাণেও তা সম্যক অভিব্যক্ত। শ্রীকুমারবাবু ঠিকই বলেছেন, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর পর্যন্ত যে-বৈষ্ণবসমাজ ছিল 'রোমান্সের শেষ আশ্রয়স্থল', সরোজকুমার তাকেই অবিস্মরণীয় 'সত্যচিত্রে' রূপায়িত করেছেন। এবং চাষীজীবনের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ উভয় পরিচায়কেই যে তিনি সুসম্বন্ধ-সিদ্ধহস্ত, তা সঞ্জয়বাবু স্পষ্ট লক্ষ্য করে স্পষ্টত লিখেছিলেন: 'চাষী-সংলাপে তিনি উক্ত দুজন কৃতী পুরুষের (শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর) চাইতে অধিকতর দক্ষ এবং সে-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতর বলেই মনে হয়। তাছাড়া চাষীদের জীবনদর্শন সম্পর্কেও সরোজকুমার পূর্বসূরীর চাইতে বেশি ওয়াকিবহাল।' এবং এ-সমস্ত মিলেই প্রস্তুত হয়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ ও সার্থক সত্যসন্ধ এই অভিনবীন 'সাধারণ্য'-উপন্যাস, যাতে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত নাগরিক-সম্ভব গ্রাম্যলোকায়ন-ক্ষমতা-দক্ষতার একটি সাধ্যসীমানাও যেন স্বাক্ষরিত;—এই অতিদুর্লভ সাক্ষ্যটি লক্ষ ক'রে হুবহু বলা যায়: "In these works clarity of thought and characterization, striking emotionality, profoundly popular essence are in complete harmony with the external simplicity of form, which makes the content intelligible to the widest possible reading public. The writer addresses an audience of many, telling them of the things, all with captivating sincerity, adding to the effect of his words by the powerful imagery inherent in (his) style."

(শলোকভ-প্রসঙ্গে য়ুরি ল্যুকিন)

"সৃষ্টি"-মুহূর্ত ও 'স্বনির্বাচিত' কবিতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য

" · আমার কবিতা আমার এক বিশেষ ধরনের কথা—যা আমি মনে-মনে বলেছি, আর যা আমি গদ্যরচনায় কোথাও বলতে পারতাম না—গল্পে না, উপন্যাসে না, প্রবন্ধে না।"

'স্বনির্বাচিত কবিতা'র সংহত-সুলিখিত ভূমিকায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য ওপরের কথাক'টি সবিশেষ বলেছেন। বাস্তবিক, কবিতায় যা যেমন ক'রে বলা যায়, অন্য কোনো সাহিত্যমাধ্যমে তা তেমন ক'রে যায় না। অথচ যে-লেখক একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও কবি, যেমন বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ-চৌধুরী, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি, তাঁদের আত্মপ্রকাশ-ব্যাকুলতার ছবি অনেক সময়ই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা বিভিন্ন সাহিত্য-মাধ্যমে, পাশাপাশি পেয়ে, সাজিয়ে, সমগ্র ফলশ্রুতিটা দেখতে চান এবং আবিষ্কার করেন বিশেষ বিশেষ লেখককে তাঁর সমগ্র স্বরূপে ; যেখানে তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা বিরোধে-মিলনে আলোয়-ছায়ায় পারস্পরিক জয়-অজয়ের দ্বন্দ্বে এসে 'সৃষ্টি'-মুহূর্তে সম্মিলিত, লীলায়িত, সমৃদ্ধ : 'ভালোয় মন্দ আলোয় আঁধার গিয়েছে মিশি'।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত, তাঁর অন্যতম মহৎ উপন্যাস 'সৃষ্টি' এদিক থেকে আমাদের খুবই সহায়ক হতে পারে। উক্ত রচনার নায়ক দীপায়ন চৌধুরী যেহেতু স্বয়ং কবি এবং অনেকাংশে তাঁর চরিত্রচিত্রকর সঞ্জয়বাবুর আত্ম-জৈবনিক উপাদানে প্রস্তুত ; তাই পড়ি সেই দীপায়নের কথায় :

> তোমার চেতনা যখন নিটোল হয়ে গড়ে উঠল, তার মানে, যখন তুমি নিজসত্তার মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারছ—নামহীন হয়ে মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যেতে চাও না আর—আয়ত্ত ক'রে নিতে পারো নিজেকে—বুঝতে পারো আলাদা ক'রে যে নিতে পারছ—তখন, সে-অবস্থায়, কী নিঃসঙ্গ তুমি। নিঃসঙ্গ অথচ তোমার একটা জগৎ আছে, যা এ-জগতের মতো নয়। আর তখনই তুমি কবি হ'তে পারো।

এই স্বোপলব্ধ ভাষণের পাশে যদি দীপায়নের সঙ্গে তোতা-র সম্ভাষণ-বিনিময়কে এনে দাঁড় করাই, দেখব কবির আলাদা জগৎ তৈরি হওয়ার খবর ব্যক্তিসত্তা তার

প্রেমিক-পরিচয়ে কত সহজ সাবলীলতায় জানে, রাষ্ট্র ক'রে দেয়, দিয়ে চরিতার্থ বোধ করে একধরনের তৃপ্তিতে :

'লেভেলক্রসিং ছাড়িয়ে দশ-বিশ গজ মাত্র আর শহর—শেষ ইলেকট্রিক পোস্ট, ডাক-বাংলোয় ঝাউগাছের সারি—সামনে সীমান্তের বাড়ি।...পাশে পাশে তোতা হেঁটে আসছে—চুপচাপ—পায়ে পায়ে শরীর হারিয়ে আসছে যেন ও—শুধু একটা গন্ধ—ওর চুলের গন্ধ—দেহের গন্ধ—আমাকে জড়িয়ে আছে তপতী—আমার কবিতার তপতী। তিলফুলনাসা।

'এখন তোমায় যেমন মনে হচ্ছে আমার—'প্রসারিত রাত্রিকেই যেন সম্বোধন করল আমার (দীপায়নের জর্নালের 'আমি') মন : 'কবিতায় তোমাকে ঠিক তেম্নি পাই আমি—জানো ?'

'আমাকে ?' মুগ্ধ কণ্ঠ।

'তোমাকে। সত্যি তুমি কিন্তু সব-সময়কার 'তুমি'র চাইতে অনেক আলাদা !'

'আমাকে নিয়ে তোমার কবিতা !'

'সে-তুমি এ-পৃথিবী ছাড়িয়ে, সময় হারিয়ে কত জায়গায় আছো—হয়তো শকুন্তলা হ'য়ে, হয়তো জুলেখা, হয়তো ডিডো—এম্নি আরো কত—হয়তো অন্য কোন গ্রহে, যেখানকার রাত্রিতে আরো বেশি, আরো সবুজ, আরো গাঢ় জ্যোৎস্না—আমরা হেঁটে চলেছি সে-জ্যোৎস্নার ভেতর—আমরা অন্যরকম—অথচ ঠিক আমরা।'

এই সঙ্গে সঞ্জয়বাবুর প্রথমযুগের কবিতাটি ('জ্যোৎস্নায়'—সংকলিতা দ্র°) যদি মনের সামনে তুলে আনি ছবিগুলি কি হুবহু একরকমের পাই না ? দীপায়ন যা তোতাকে বলতে চেয়েছিল, এখানে কবি কি অনেকটা তাই বলছেন না, বোঝাতে চাচ্ছেন না তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত কোনো সূক্ষ্ম-দেহিনীকে, কোনো বিশুদ্ধ সত্তায় স্থিত ও উপনীত কবিতাশরীরী নারীকে :

ভেবে দ্যাখো একবার—এমনি মদির জ্যোৎস্নারাতে
মালিনীর স্তব্ধ জল কেঁপেছিল রূপালি বাতাসে,
উটজে ফেরেনি শকুন্তলা।
চেয়ে আছে কোন্ পথে এসেছিল দুষ্মন্তের রথ।
সমুদ্র-সৈকতে এসে এমনি জ্যোৎস্নায়
দাঁড়ায়ে কেঁদেছে ডিডো, কার্থেজের স্বপ্ন চোখে তার।
ঘুম ? আজ না-ই হোল ঘুম! থাকো জেগে।...
এই রাতে ঘুমায়নি ইসুফ জুলেখা।

নেমে এসো অবিশ্রান্ত জ্যোৎস্নার বর্ষণে।
নগ্ন আকাশের তলে অসহ্য নূতন
প্রথম প্রেমের মতো স্পর্শ জাগে নিঝুম জ্যোৎস্নায়।
আজ আর না-ই হোল ঘুম!

'অসহ্য নূতন প্রথম প্রেমের মতো স্পর্শ' একদিন মুছে যায়। কিন্তু মোছে না সেই অনুভব, তার স্মৃতি। ঘোচে না তার দুঃসহ জ্বালা। তাই দিয়ে কবিসত্তার ধূপদীপারতি চিরকালের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমপাত্রী সরে যায়, প্রণয়গুঞ্জরণ (আত্মগত বলেই) তবু থামে না। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' নাটোরের বনলতা সেন একবারই চায় হয়তো, কিন্তু সে তবু থেকে যায় কবির 'প্রাণের প্রান্তে,' অন্তর্মনে, রক্তের আলোড়নে, যখন কবির চারদিকে 'জীবনের সমুদ্র সফেন', তবু তার যাবতীয় তরঙ্গভঙ্গময় 'লেনদেন'-উপান্তে পৌঁছে গিয়ে বা পৌঁছতে গিয়ে তিনি পান, পেয়ে যান পুনরায় সেই তাকেই : 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'! এতই মগ্ন থাকেন সেই তন্ময়তায় যে, যদি কেউ তখন কবিকে প্রশ্ন ক'রে জাগিয়ে দেয়, তিনি স্বগতোক্তির মতো ব'লে বসেন : 'মনে আছে? শুধালো সে। শুধালাম আমি শুধু : বনলতা সেন?' তাই কেন কোথায় কীভাবে তোতা তপতী হয়ে যায় কবি দীপায়নের কাছে, আমরা তা দেখতে পাই;এম্নি ভাবে, তাঁর চিত্রনির্মাতার বর্ণনায় :

'দীপায়নের সে-জগতে বাইরের মানুষ একমাত্র তপতীরই ঠাঁই ছিল। তপতী, তোতা নয়, তোতার কোন সত্তা—দীপায়নের চেতনায় তৈরি। তন্বী, শ্যামা তোতা সেখানে স্বচ্ছ, শুভ্র তপতী।'

দীপায়নের চেতনা মানে কবিচেতনা। অচ্ছোদ-সরসীর মতো নির্জন স্বচ্ছতোয়া দর্পণ। তোতা নারী মাত্র, তপতী তার গাঢ় গূঢ় পরিচয়, কবির প্রেমপ্রতপ্ত অনুভব, রক্তাক্ত উপলব্ধি, স্মৃতি, প্রতিবিম্ব, স্মৃতিতর্পণ। সঞ্জয়বাবু যখন কবি তখন তাঁর পক্ষে ওপরের সমগ্র বিশ্লেষণটাই সত্য। যে-কোন সৎ কবির পক্ষেই। তাঁরা কি প্রণয়িনীকে মৃদু কণ্ঠে, মনে-মনে কখনো বলেন না, দীপায়ন যা বলত শেফালি, বীণাদি, ময়না, তোতা-তপতীকে?—

'আমাকে সাজিয়ে দাও, সুরভিত উজ্জ্বল করে দাও তোমরা। তোমরা আকাশ হারাও, আমি তোমাদের আকাশ পাই।'

এভাবেই পৃথিবীর মাটিতে পা রেখে কবিরা আকাশের জ্যোৎস্নায় হাত বাড়ান—অন্ধকারকে স্পর্শ করেন। নারীদের দিয়ে নিয়ে তৈরি করে তোলেন সত্তাময় ভাবনা-চেতনার ভাবগ্রাহী রূপবলয়। রূপ থেকে ভাবে, ভাব থেকে রূপে অবিরাম

আসা-যাওয়ায় তৈরি হয়ে ওঠে কবিবাসনার অসংখ্য ছবি, তাই মুঠো মুঠো কবিতায় তা বিন্যস্ত হতে থাকে।

দীপায়ন চৌধুরীর কবিতা ব'লে আমরা কিছুই পাইনি। (পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো'য় যেমন অনেক পেয়েছি)। অথচ সঞ্জয়বাবুর যথেষ্ট পেয়েছি। পরিণামে তো বটেই, 'সৃষ্টি'র একাত্মতায় দেখলেও, কবির কবি তিনি। তাঁর প্রথম যুগের কবিতাগুলি ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে লিখিত। ১৯৪৭-পূর্ব বাঙলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে একটা ঝড়-সংশয়-উদ্বেগের যুগ চলছিল তখন, সারা পৃথিবীর দিশেহারা চেহারায়, বিচলিত পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথম যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় ও সর্বনাশের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই নতুন বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে : এতাবৎ কায়েমী 'বেনেতি' সাম্রাজ্যবাদ বনাম ফ্যাসিস্তশক্তি, নববাজারেচ্ছুক ক্রূরতর সাম্রাজ্যবাদ। এদেশে সন্ত্রাসবাদীদের বৈফল্য ও গান্ধীবাদের বৈকল্য, নিহিত-পরাভব। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্তদের যৌবন-খোয়ানো (রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ লক্ষ করেছিলেন, দ্র° তাঁর স্বীকারোক্তি বা 'কনফেশন্‌স্' শীর্ষক এখানকার প্রথম প্রবন্ধ) বৃথাপচয়, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, যৌন সংক্ষোভ, অবদমন, চেতন-অবচেতনের 'লোহসাথে অশ্রু'মেশা অস্বস্থ অসহ্য আর্ততা, 'মারীহাওয়া'। কংগ্রেসের শক্তি ও দৈন্য। এদেশী সাম্যবাদ-মার্ক্‌স্‌বাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-সূচনামাত্র, কোনো স্পষ্ট চরিত্রচিত্র নয়। সাহিত্যে তাই উৎখাত চিৎকৃত জীবনের ছবি ও সিনেমা-নাটকের ছবিতে ভ্রষ্টনষ্ট সাজানো বাগানের ব্যর্থ হাহাকার। তখন যাঁরা তরুণ, প্রথম কবিতার ধ্বনিশিল্পে প্রাণশক্তি প্রতিধ্বনিত করতে তৎপর, স্বপ্ন ও বাস্তবের দারুণ দোটানায় পড়েছিলেন তাঁরা। সঞ্জয়বাবুও অব্যতিক্রম। তাঁর প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ 'সাগর' ও 'পৃথিবী' ('সংকলিতা'য় আশ্রিত) নামতও সেই স্থল-জল-বিবাদ-বিরোধের অভিজ্ঞান বহন করছে (পাশাপাশি তুলনীয় ব'লে স্মরণীয় শিবরামের 'চুম্বন' ও 'মানুষ' ?)। 'সাগরে' জলকন্যাদের খেলা, স্বপ্নশয়নের মেলা, ঘুমের জগৎ, ছায়ার জীবন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা ছবি ও ভাবনার কারুকাজে মিহি মসলিনের মতো বোনা হয়ে যাচ্ছে বহমান কল্পনায় ; আর 'পৃথিবী'তে তখন রূঢ় বাস্তবের ব্যস্ততা, রকমারি মনোহারী নরনারী-জিনিসের ভীড়, অন্যতর বুদ্ধি বোধের তির্যক গন্ধময় সংবাদ ; অথচ সুকান্তের গদ্যের হাতুড়ি-হানা তখনও এসে পৌঁছয়নি, তবে "বিলম্ব কত আর ?"—সেখানে ট্রামের কর্কশ ধাতব আওয়াজ, ইলেকট্রিসিটির প্রেতায়িত হাসি (ডি. এইচ. লরেন্সীয় অর্থে কি ?) এরোপ্লেনে পাখিমানুষনিধনের যাগযজ্ঞ। মেরু-বিপ্রতীপ দু-প্রান্তেই কবি-মন যাতায়াত করতে আরম্ভ করেছে। কখনো মৃদু চালে মিহি

কথায় সুরেলা শীতল স্বপ্নভাবনা, কখনো তীক্ষ্ণ গন্তব্যক্রান্তির মোটা তারে রূঢ় সত্যের রৌদ্র-টংকার : ছায়া স্বপ্ন-হরিণের কালো চোখকে নয় শুধু, সমগ্র সুন্দর সত্তাকেই যা ব্যাধের মতো পাশে বেঁধে, ফাঁসে জড়িয়ে, লক্ষ্যবেধে জীর্ণ করছে। একদিকে :

কখনো বাইরে দাঁড়ায়েছ এসে ঘুমের চোখে নরম ভোরে?
ছাখোনি আকাশ বোবা হয়ে আছে শেখেনি ভাষা
আলো এসে গেছে আসেনি আভা!
ঘুমিয়ে রয়েছো, কতো বার এলো এমন ভোর এমন আলো!—
পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে বনের স্ফটিক ঝর্ণাতলে।

অথবা

যে স্বপনগুলি চোখ হ'তে রাতে হারিয়ে যায়
তা'রা কথা কয় বনের নরম লতার ফুলে :
তা'রা যেন লঘু পালকের মত, বনের মেঘ—স্বপ্নগুলি।

অথবা

নদীর জলে
ঢেউ নয় ওরা পাখিরাই বুঝি মেলেছে পাখা
রূপা হয়ে আছে আকাশের রোদে চরের বালু
অনেক দূরে।···
দুপুর বেলা
সেখানেও পড়ে অলস মেঘের নরম ছায়া,
জ্যোৎস্নাও বুঝি চায় কোন দিন মুখর হ'তে
গভীর রাতে।

ঐ 'স্বপ্নগুলি'র গুলি-খাওয়া দুর্গতি, দুর্বিপাক, দুঃসহ-দুর্বহ মেনে-নেওয়া মানিয়ে-নেওয়ার দুরবস্থান আরেক দিকে :

আজ কি আর পাবে সে দুপুর
কোথায় সে হারিয়ে গেছে কে জানে?
উড়ছে আকাশে এরোপ্লেন—
আর জানো?
পাখিরা পুড়ে গেছে রোদের আগুনে।

শুধু পাখিরা নয়, হরিণেরা, মানুষেরা, মন-হুঁশিয়ার মনুষ্যত্ব, মানবতা সবাই, সব-কিছু পুড়ে খাক হয়ে গেছে, যাচ্ছে।

অথবা

সূর্য থেকে মুছে ফ্যালো সাত রঙ—ছাখো নতুন কা'রা আসে
আকাশের নীল পাথর ঢেকে রেখেছে কা'দের—আসুক তারা বেরিয়ে
—ফিরিয়ে আনো মাটির যৌবন।

(এই সময়ে কি 'অন্য'-মনোভাবে বা অনন্যমনে সঞ্জয়বাবু 'মরামাটি' উপন্যাসটি লিখেছিলেন ?)

ফিরে যাই ঘরে
জ্বলছে সেখানে নতুন দানব
ইলেকট্রিসিটি।

(কিন্তু এহেন 'দানব'-তড়িৎ-চেতনায় যন্ত্রশক্তি ও সভ্যতার বিরুদ্ধে লরেন্সীয় বিশুদ্ধ বিদ্রোহ বা গভীর অনীহা যেন কেউ খুঁজতে না যান।)

কেবল বয়োতারুণ্যের দিক থেকে কেন, সৎ কবিস্বভাবের তাড়নাতেই নির্জন স্বপ্নসাধে মন তবু ফিরে যেতে চায়, ফিরে পেতে চায় ফেলে-আসা গ্রাম-মাটি-আকাশের দূরদুর্গম ফেরিঘাট। কিন্তু 'ফিরবে না আর, ফিরবে না সে'। তবু দোটানার বিবাদ কাটানো কঠিন, অভ্যন্তরেই তো যুযুধান স্ববিরোধ—বুদ্ধির জগতে; অথচ আবেগের সংসারে হৃদয়ের দুয়ারে-জানালায় সেই চিরকালের মেঘের কড়ানাড়া, অস্থির বিদ্যুল্লতা, সেই 'নিরবধি'র রাধা, উর্মিলা, শকুন্তলা আর পার্বতীর পারাপার, আসা-যাওয়া। 'স্বপ্নে ছিল যাওয়া আসা' ? কবিমনে ও স্মরণে তাদের স্থায়িত্ব যেমন পাকা, তেমনি তাদের অবলম্বনে যেসব কবিতা উল্লেখনীয় ভাবে প্রস্তুত হয়েছে, কাব্যরসিকের সহৃদয় সংসারে তাদের দাবিই প্রাথমিক, পৌনঃপুনিক, শাশ্বত। (সাধে কি জীবনানন্দের এই ধ্রুবপদী 'খেয়ালী' উচ্চারণটি এত অমোঘ 'এখনও নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'।) প্রসঙ্গত 'পুরাণ'-মেলামেশানো নবীনের এই পুরো কবিতাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

মেঘে ছায়া-ঘন হ'ল আকাশের দিন,
পৃথিবীতে আজ তমাল হয়েছে কালো
তোমাদের দেহ-যমুনায় বলো, রাধা,
কাঁদে না উর্মিমালা ?

বন বুঝি মেঘে গহন হয়েছে আরো,
কার নীল চোখ হারায়েছে নীল বনে !
তোমাদের কতো উর্মিলা জাগে রাত
রাজপালঙ্কে ব'সে।

একা আরো কত জেগেছ মেঘের রাত
কোন তপোবনে তোমরা শকুন্তলা,
মালিনীর জলে সেখানে ভাসেনি কেয়া
আসেনি বিজয়ী রাজা।

হিমগিরি হতে মেঘের ধ্বনি কি শোনো ?
উমা, তোমাদের দেবতা মেলেনি আঁখি।
কত যুগ গেল যাবে আরো কত যুগ
কত মেঘ, কত ব্যথা।

এ-কবিতাটি বিশেষত লক্ষণীয় এজন্যে যে, এখানে দূষিত বিবর্ণ জটিল-কুটিল কুলাঙ্গার কাল-বর্তমান থেকে ছুটি নিয়ে, নিতে চেয়ে, কবি শান্ত সুদূর সুরভিত অতীতে প্রস্থান করেছেন ঠিকই, কিন্তু তা ব্যক্তিগত স্বস্তি স্বাচ্ছন্দ্য 'শান্তিকল্যাণে'র দিক চেয়ে নয়—ব্যক্তিসত্তার অশ্রু-অভিব্যক্তি এখানে প্রবল নয় ; কবি এখানে চিরকালের সর্বজনীন ব্যথাকেই ধ্বনিত পংক্তিতে বাজিয়েছেন ; আপন 'স্মৃতির ক্ষতে' চোয়ানো রক্ত (হাইনে স্মরণীয়) এখানে সেই আবহমান বাল্মীকি-কালিদাসের কাল থেকে ছুটে-আসা এই শাশ্বতনৈরাশ 'কত মেঘ, কত ব্যথা'র নতুন আবেগে, নতুন মর্মবেদনায় অনর্গল ক'রে দিয়েছেন। অবশ্য এখানে যে-চারটি নারীর ছবি পাই, তারা কি কেবল 'ভারত'-ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ? কাব্যকাল্পনিক ? আধুনিক জীবন-জগৎ মন্থনে-সঙ্গমেও এদের সঙ্গে আমাদের ঘন ঘন সাক্ষাৎ, ঘনিষ্ঠ জানাশোনা আছে বৈকি ! তাহলে স্পষ্টত ও সরাসরি আধুনিক কাল এল না কেন ? তার উত্তর দীপায়ন চৌধুরী দিতে পারেন, দেন, যিনি সঞ্জয়বাবুর সমসাময়িক, হয়তো কেন, নিশ্চিতই সমভাবুক, সোদর-'দোসর' :

নিটোলভাবে তুমি অতীতকেই পেতে পারো, বর্তমানকে নয়। বর্তমান ঝড়, তার ছবি ঝাপসা। আজ আমি ঝড়কে চিনি সুপর্ণা (দীপায়নের জীবনে সে সাম্প্রতিকতম, 'আধুনিক'), তুমি ঝড় তুলতে চাও তাকে চিনি।
বৌদি জিজ্ঞেস করতেন : 'কবিতায় তুমি কী লেখো, ঠাকুরপো ?' 'যা আমরা পাইনে তা-ই।' 'তা কি লিখলেই পাওয়া যায় ?' 'পাওয়া গেলেই লেখা যায়।' 'বারে—'ছেলেমানুষি আবিষ্কারের আনন্দে হাততালি দিতেন বৌদি : 'যা পাও না বলছ তা আবার পাও কী ক'রে ?' 'সবই কি হাতে পেতে হয় বোকা ?' "লিখলেই" কেন, হয়তো কোন-কিছুতেই ঠিক-ঠিক পাওয়া যায় না, হয় না। তবু দীপায়নদের মনে-মনে কিছু আসে যায় না তাতে। কারণ তারা হাতে-হাতে

পেতে চায় না ; রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ নিয়ে 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,' তাকে নিয়েও যে তাদের ভাবনা-বাসনার উত্তরাধিকার, নবীন-অভিনবীন 'শাশ্বত-আধুনিক' কবিচিত্তপ্রবৃত্তি। অথচ এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, দীপায়ন চৌধুরী তথা সঞ্জয় ভট্টাচার্যর মতো অতিআধুনিক মনন-জীবনে বের্গসঁ-প্রুস্ত-জেম্স্ জয়েস-নীটশে-মান্‌দের অবিরাম আঘাত, কেননা 'আঘাত ছাড়া··· অগ্রসর সূর্যালোক নেই'। তাই এঁদের নারী-ভাবনায় এখানে নীট্‌শে উদ্ধৃত হওয়ার যোগ্য, কেননা নারীরা যে কবিদের কাছে শেষ পর্যন্ত 'পাখি' ; আর নাম। পাখি কেন ? দীপায়নের জর্নাল-এ তা প্রাসঙ্গিক-উল্লেখিত।—

> **'Women have hitherto been treated by men like birds which losing their way, have come down among them from an elevation'—Neitzche**
>
> আকাশের পাখি! আজও ওদের তাই মনে হয় আমার।···আজ তোতা সেই পাখি, যে তার হারানো পথ খুঁজে পেয়েছে। আমার আকাশ থেকে মুছে গেছে তার পাখার রোদ—সে আজ শুধু একটা নাম! আমার কবিতায় তাকে যেমি চেয়েছিলাম তেমি সে আজ!

তাই পাখির সত্তায় নারীর সত্তা যখন মিশে যায়, যাবেই, কবির কাছে তখন রূপনামেই না, নামরূপেই নারী, স্বরূপতঃ, তাঁর প্রেমপাত্রী, দয়িতা, 'নায়িকা' : তা তিনি মহাশ্বেতা, উর্বশী, আর্টেমিস, কঙ্কাবতী, সুরঙ্গমা, দময়ন্তী, বনলতা সেন, সুচেতনা, শ্যামলী, সুরঞ্জনা ; রাধা, শকুন্তলা, জুলেখা, ডিডো, নীলিমা, পদ্মা (স্বনির্বাচিত সঞ্জয় পৃ ৯, ১০) যে-ই হোন, অথবা শুধু 'তুমি'। (এমনকি এই 'তুমি'র বিবরণ-বর্ণনা দূর কথা, উল্লেখ-পর্যন্ত-হারা অসাধারণ প্রেমের কবিতা 'বিনিময়'— অমিয় চক্রবর্তীর—মনে রেখেই বলছি : 'তার বদলে পেলে'—কীসের বদলে, কার বদলে ? পরম ব্যঞ্জনাগর্ভ এ-ও সে, সেই 'তুমি', অথচ একটুও প্রত্যক্ষগোচর নয় সে, অথচ তার উপস্থিতি পরোক্ষ প্রমাণে ঢের বড়ো, প্রাণবন্ত ও জীবন্ত ভাবে যে সে পরমা ; মনোরমা ছিল, আছে, থাকবে : 'তুমি যে তুমিই ওগো, এই তব ঋণ' লিখে কি রবীন্দ্রনাথও সেই 'না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে' চির-বিরাজমানাকে বুঝিয়েছেন ? অথচ তিনিও একসময় কত নামে তাকে খুঁজেছেন, 'মহুয়া'র 'নাম্নী'-পর্যায় দ্র°)। দীপায়নের কথায়, এরা সবাই 'চেনার ভস্মা-বিশেষ নামের ওইটুকু ধ্বনি!'—এই নাম-কীর্তন বা আত্ম-পরমাত্ম-মণিহারের চিত্ত-ঝলমল উপঢৌকন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে আধুনিক সুধীন্দ্রনাথ (অর্কেস্ট্রা) পর্যন্ত সবিস্তারে প্রচারিত এবং তদবধি 'আজও নাই শেষ'। তাই সঞ্জয়বাবু তাঁর

প্রায় ত্রিশবছরের কবি-জীবনে ভাবনাবেদনা ও ভাষাভঙ্গির পরীক্ষানিরীক্ষায় যত দক্ষতাই দেখান, যত বিচিত্রপথগামীই হোক তাঁর কবিকল্পনা-পরিকল্পনার উত্থান ও অভ্যুদয়, তিনিও শেষ বিশ্লেষণে যে-কোন সৎ কবির পরিচায়ক সেই আদি-অকৃত্রিম 'বেদনার ভাষ্যকার'—সেই 'eternal pain' ও 'eternal passion'—সেই আমূলবিদ্ধ প্রেম, যার শাখায়িত কল্পনাবলয় বোরুত্থমান 'ক্রন্দসী'—একসঙ্গে আকাশ ও পৃথিবী। সবিশেষ তিনি বেদনার কীর্তনেই যে সমধিক সফল, সার্থক, তার আরেক অভিজ্ঞান এই যে, অন্য বহু ব্যক্তিগত ব্যথাবেদনা তো বটেই, এমনকি 'রোদের রোদন' পর্যন্ত তিনি আপন অনুভবে শুষে নিয়েছিলেন। স্বভাবতই, প্রেমের আনন্দ নয়, বেদনা, সঞ্জয়বাবুর কবিতায় সর্বাধিক ফসল ফলিয়েছে, পরিমাণ ও গুণগত, উভয়ত্র। আর বেদনাপ্রেমিক মননের কোমল ও স্পর্শকাতর উৎস থেকেই ভাবনাচেতনা উৎসাহ পেয়ে কখনো কখনো তির্যক দীপ্তিতে ধেয়ে গেছে পরিহাস-ব্যঙ্গের হাসি, শ্লেষ ও বিদ্রূপ : তখন কবিব্যক্তি সমাজ-ব্যক্তিত্ব তথা সামাজিক কবি হওয়ার দায়িত্বে ঘনিষ্ঠ যুক্ত হয়েছেন অনুরূপ সাড়ায়, প্রতিক্রিয়ায়। এই 'দায়ী' কবিতার সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় নিদর্শন তাঁর 'প্রেতায়িত' : এখানে পৃথিবী ও আকাশের পরস্পর-বিরোধিতা শুধু নগ্ন বিশ্লেষণে উচ্চকিত হয়েছে যে, তাই নয়, কবিসত্তার অন্তঃসার সংবেদনে মৌলিক ও ধ্রুব ক্ষতস্থলও উচ্চকিত হয়ে উঠেছে ; সেখানে তবু অবশ্যই তিনি মান্য সাদৃশ্য সত্ত্বেও সমর সেনের সুহৃদ নন, বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহোদর :

আমাদের জীবন থেকে
ছিনিয়ে নাও দেবতা,
তোমার সূর্যকে—
সে শুধু আমাদের শঙ্কিত আয়ুর বিধাতা—
আর-কিছু নয়। ..
নিয়ে যাও তোমার আকাশ, দেবতা,
তারার জ্যোৎস্নায়
করো না আর সুদূরের ইশারা
মাটির গন্ধ আমাদের রক্তে
দেহে বিসর্পিত শুধু কবরের অন্ধকার।
এ পৃথিবী কেন আমাদের দিলে, দেবতা,
দিলে মেঘের রঙ আর নদীর ছায়া।...
আমাদের রক্ত কেন আজও ঝরে পড়তে চায়

ফুলের অজস্র মঞ্জরীতে ?
কেন মেয়েরা চায় কালো চোখে—
কালো চুলে নিবিড় ক'রে আনে রাত
—আর ভালোবাসা ?

আত্মস্তগভীর প্রেমিক-কবির পক্ষে এই—'আর ভালোবাসা ?' উচ্চারণেই প্রভূত প্রমাণ মেলে যে, তিনি এই আযোজন-'প্রেতায়িত' আয়োজনে কী ভীষণ হতাশ, হতাশ্বাস ! তাই পরে যতই তিনি শূন্যজিজ্ঞাসু নাস্তিক্যবাদীর মতো 'নেতি'র অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুলুন চারদিক :

দাও আমাদের আকাশকে ইস্পাতে মুড়ে—
বিদ্যুতে জ্বলুক আমাদের সূর্য,
কার্বন ডায়োক্সাইডে ভরে যাক হাওয়া,
আমরা বেঁচে থাকি ক্লাইভ স্ট্রীটের দালানে
বেঁচে থাকি কংগ্রেসে আর সিনেমায়।
তুমি মরে যাও দেবতা—
ভরে উঠুক আমাদের নতুন পৃথিবী
তোমার প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসে।

বেনেতী-কারবারী বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়া রাজ্যে-সাম্রাজ্যে একেই বলে বেঁচে-থাকা—এই 'ক্লাইভ স্ট্রীটের দালানে' আর 'কংগ্রেসে আর সিনেমায়' ! যথাযথ ও সমকালীন নয় শুধু, যথার্থ ও দীর্ঘকালিক—যে-পর্যন্ত এই স্থানকালপাত্র বর্তমান, বর্ধমান। অথচ সব সত্ত্বেও কবিতাটির নাভিমূলে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আর্ত-আর্দ্র অনুভূতির সেই অকৃত্রিম আদিধ্বনি, হার্দ্য সুষমার বোধ ও সঙ্গত উপলব্ধি, গভীর যন্ত্রণার মন্ত্র :

এ পৃথিবী কেন আমাদের দিলে, দেবতা,
দিলে মেঘের রঙ আর নদীর ছায়া !···
কেন মেয়েরা চায় কালো চোখে—
কালো চুলে নিবিড় করে আনে রাত
—আর ভালোবাসা ?

অর্থাৎ এই 'মেঘের রঙ আর নদীর ছায়া', এই মেয়েলি কালো চোখ ও চুলে নিবিড়-ক'রে-আনা রাতের সঙ্গেই যথোচিত বনিবনা যে-ভালোবাসার, তা আর তবে কেন। হায়, অগত্যাই, কেন !

জাগতিক মহাপ্রবঞ্চনার দিকে অপলক চেয়ে, মাত্র 'অবাক পৃথিবী অবাক

করলে তুমি'র কৈশোরক বিহ্বলতায় বা বিস্ফোরণে নয়, তারও চেয়ে স্বতঃ-পরিণত ও গভীর ভাবনায় ভীষণ উদ্বেগে কাঁটা হয়ে উঠতে হয় শারীরিক ও প্রায় মনস্তাত্ত্বিক বেদনা-বিষাদ ঘনিয়ে-ওঠা এই ছত্রে-ছত্রের সচ্চরিত্রে :

আমরা পাইনি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন…
আমরা পাইনি দেহে অরণ্যের সবুজ আঘ্রাণ…
আমরা পাইনি মনে পর্বতের অভ্রভেদী স্বর…
আমরা পেয়েছি শুধু পৃথিবীর অন্তিম দিবস…

সুতরাং সেই মারাত্মক 'অন্তিম দিবসে'র অনুযায়ী এই অভিনব-মর্মান্তিক 'অ্যান্থেম্ ফর্ ডুম্ড্ ইয়ুথ' :

আর ফুলের গন্ধ নয়, পৃথিবী,
ভালো লাগে এবার
ঘামের গন্ধ—
জন-সমুদ্রের লোনা জল
প্রচুর তার দুরন্ততা, সাগর,
তোমার উত্তাল লোনা ঢেউ-এর চেয়ে।

বলা বাহুল্য যে, 'জনসমুদ্রে লেগেছে জোয়ার' বলে বিষ্ণু দের ঘোড়সওয়ারী-মনোভাবের দুর্গম দূরত্ব উন্মোচন এই নৈকট্যনিটোল উচ্চারণের কাছে কিছু অত্যুগ্র মনে হয় আবেদনে, তার জোরালো জাদুকরী আমন্ত্রণ-আহ্বান যদিও দ্ব্যর্থতায় অমোঘ। সরাসরি ব্যর্থতা ও ব্যথাবোধের সঞ্চারী উত্তাপ যে কত বেশি সংবেদনশীল, তাঁর এই প্রস্ফুট দেশকাল-'অনুগমনে'র দৈন্যযাতনায় জড়িত নিবেদন, তার আরেক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যা অনুচ্চ স্বতঃপ্রকাশে বিশেষ আন্তরিক :

আমাদের স্বপ্নসাধগুলি
শুধুমাত্র ঋণ
আমরা ইন্দ্রের সেনা অনুগমনের।
আমাদের বিবর্ণ জীবনে
পৃথিবী আসে না কোনদিন।

তথাপি এই ঘনান্ধকার অরাজকতার আড়ালে সূর্য-সম্ভাবনার প্রতীতি সঞ্জয়বাবুর মনকে প্রবুদ্ধ প্রজ্বলিত রেখেছে চিরদিন, সেই তাঁর মন্ত্রবৎ পুনরাবর্তিত আন্তরিক গুঞ্জন তাই কখনোই থামে না, থামে নি—'আর ভালোবাসা?' এবং আলো-আশা। যেহেতু তিনিও জানতেন, বিশ্বাসী ছিলেন : 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়'। রবীন্দ্র-প্রেমেন্দ্র-জীবনানন্দের মানসবৈভবে তিনি

ঋদ্ধ, সম্পন্ন; 'লোকে যারে বলে বিড়ম্বিত' সত্ত্বেও রিক্ত, বিরক্ত ও বিশীর্ণ নন। অবশ্য কোনো দার্শনিক স্বাস্থ্যসচ্ছলতার নয়, করুণ কষ্টকর আত্মস্থতারই সনির্বন্ধ উদাহরণ এই কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও 'সৃষ্টি'র দীপায়ন চৌধুরী। কার্যকারণেই যুগপৎস্মরণীয়।

বোধ করি নারী-প্রেম ও আত্মপ্রণয় কখনো কখনো এক। তাই দিয়ে যাত্রারম্ভ হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে জনসমুদ্রে নিজের থেকে নিজেকে বের করে মিশিয়ে দেওয়া। যাকে বলে আত্মনিমজ্জন। নির্জনতা-নিঃসঙ্গতা থেকে 'উজ্জ্বল উদ্ধার'। 'সংকলিতা'র মধ্যপর্বের কবিতাগুলি তার সাক্ষ্যবহ। কিন্তু কতকাল 'একান্ত'-নিজেকে ছাড়া 'অনেকান্ত'-নিজের চলে? বিপ্লব, সাম্যবাদ, প্রগতি, কৃষক-শ্রমিকনির্ভর স্বয়ন্তর সমাজ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও আশুফলদায়ী জনগণ-চিন্তাচেতনা-হিতৈষণা বহির্গত মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, কিন্তু অন্তর্লীন মানুষের শেষ আশ্রয় নয়। তাকে খুঁজতে হয়, পেতে হয় নিজেরই আতলশায়ী অতলে। সঞ্জয়বাবুও নিজ জগৎ ও জীবনের অন্তর্গতে ফেরেন, নবচয়িত বিশ্বাসে, নবজয়িত আশ্বাসে; স্বায়ত্ত সহজপ্রত্যয়ের সেই ছবি 'সংকলিতা'র অন্ত্যপর্বে প্রতিফলিত। হয়তো এবারও আত্মপ্রেম; ঠিক নারীপ্রেমে নয় এবার, কিন্তু নারী-জননীর মতোই জন্মভূমি আছে—সেই স্বদেশপ্রেমে তো নিজেকেই পাও, পেতে পারো। জীবনানন্দের যেমন 'রূপসী বাংলা', সঞ্জয়বাবুর ঠিক তেমনি নয়, সম্ভব নয়, তবু ততোধিক 'প্রাচীন প্রাচী': এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাঙলা—উক্ত-ত্রয়ীরই পুরোহিত-ব্রতী ঐতিহাসিক পরিচয় উন্মোচনে, স্থানকালপাত্রের বিবর্তনী বাঁকে বাঁকে সঙ্গত প্রমাণের দানে ও গ্রহণে গভীর বিস্তৃত বহু অভিজ্ঞতাপুঞ্জে কবির যেন আত্মপরিচয়ই অন্বিষ্ট। হস্তামলকবৎ নয় তা, অন্ধের হস্তীদর্শনও নয়; রীতিমতো ইতিহাসাশ্রয়ী যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য আলোকসন্ধান ও বর্ণিমা-সন্নিপাত, আদৌ কোন আতিশয্য-অতিরঞ্জনের ঠাঁই নেই সেই বিচারে-বিশ্লেষণে। এখানে তাঁর স্বদেশপ্রেম নিছক উনিশশতকী আবেগপ্রধান বুদ্ধিযুক্তিবাদ নয়, বরং মননঅধ্যয়নগত বুদ্ধিপ্রধান স্বভূমিধ্যানে কবিতার আবেগ-সন্নিধান: যান্ত্রিক জয়োল্লাসের মত্ততামধ্যেও কৃষিনির্ভর নদীমাতৃক ভূমিসভ্যতার ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্যসন্ধানী একটি স্পষ্ট ভূমিকা-নির্ণয়ী চেষ্টা হিসেবে ধন্যবাদ দিতে হয় এই কাব্যকে। মার্ক্সবাদ থেকে গান্ধীবাদে আস্থা-স্থাপনের সাময়িক চিন্তাচিহ্নিতও কি এই প্রয়াস? অথবা ১৯৪৬-৪৮ ক্রান্তিকালে দেশোপযোগী এশীয় সমষ্টিচেতনায় সাক্ষাৎকার, অনুসন্ধিৎসা? ভূগোল-ইতিহাস-মানবযাত্রা ঘিরে, আবর্তমান অতীতকে ঘুরে বৃহৎ দেশ ও নিজস্বত্বের প্রকৃতসত্য-'প্রদক্ষিণ'—'গগন ভ'রে' 'উদ্বোধন'?

তারপর 'নতুন দিন'। সঞ্জয়বাবুর চিরাচরিত প্রখর সৌরচেতনার মতো

সময়বোধ, এখনকার পরিভাষায় ঘড়ির দোলকের মতো, এখানেও সুলভ। রচনাকাল : ১৯৪৭। দীর্ঘ পরাধীনতার দুর্দিন ও দুর্গতি পেরিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চলেছে ভারতবর্ষ। চোখে যত আশা, বুকে তত ভয় ও সংশয়। তবু আজ যারা জীবিত, তাদের সর্বাধিক উল্লাস একথা ভেবে : বহুজীবনের বলিদানে যা সম্ভব হয়েছে তার মোহ সাময়িক সত্ত্বেও সামগ্রিক মহিমাটুকু যেন কিছুতেই মুছে যাবার নয়। দীর্ঘ দীর্ণ কাল, কঠিন কঠোর ত্যাগ ও তিতিক্ষা, 'রাত্রির তপস্যা'ই বটে, অমানুষিক অনাস্থা ও অপ্রত্যয় ভেঙে যা আজ দ্বারবর্তী তা কি স্বপ্ন, না সত্য? 'স্বপ্ন' বা 'মায়া' না-ই হলো, 'মতিভ্রম' নয় তো? কবি তখন একে অমতিভ্রম ও সত্যই ভেবেছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের শেষ ২৬শে জানুয়ারিতে প্রমত্ত বর্তমান মানুষদের দিকে চেয়ে অতীতমুখী হয়েছে তাঁর মন। খুঁজতে ও বুঝতে বেরিয়েছে কবিভাবনা নিকট ও দূর অতীতের দুঃখব্রতীদের রক্তস্রোতপ্লাবী সেই প্রতিশ্রুতিকে।—বড়ই বশম্বদ, বিনীত আর্ত তাঁর আচরণ, তাঁদের প্রতি প্রণাম-নিবেদনের বেদনার্দ্র প্রসন্নতা, নাকি বিপন্নতাই?—

একটু সময় দিও, হৃদয়ের খানিক সময়
তাদের সে-ছায়ার উপর—
ছায়া হয়ে গেছে যারা তোমাদের ছায়া দেবে ব'লে।...
তোমার প্রাঙ্গণে, দ্বারে
জীবনের মরণের সেই অন্ধকার
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিতে আসে নি কখনো, কোনবার।
তোমার রোদের গায়ে মাখা ছিল ছায়া
মায়ের চোখের মতো,
প্রিয়ার চোখের মতো রোমাঞ্চিত মায়া,
ছিল রোদ ঘুম-ভাঙা—রোদের নবম কিশলয়!
একটু সময় দিও মন থেকে—যদি মনে লয়—
তোমারে করেছে প্রদক্ষিণ
বার বার আশ্বিনের ফাল্গুনের সুরভিত দিন;
তাদের দিগন্তহীন, নিদ্রাহীন রাত্রির শিয়রে
ছিল মরু-ঝড়।...
ধূসর মরুর ইতিহাসে
রেখে গেছে নামহীন নাম।
তাদের ছিল না কিছু—যা ছিল তা সব—

অকরুণ আগ্নেয় আকাশে
উজ্জ্বল-সূর্যেরে-দেওয়া গভীর প্রণাম।

বস্তুতপক্ষে কবি তাঁদের, সেই অতীতচারী অতীতশায়ী বীর শহীদদের "আগ্নেয় আকাশে" "উজ্জ্বল সূর্যেরে দেওয়া গভীর প্রণাম"ই নিবেদন করলেন। করুণ কিন্তু গৌরবজনক, ব্যথাম্লান কিন্তু মহিমার্জিত।

সামাজিক-সত্তা-লীনতায় 'সংকলিতা'র অধিকাংশ কবিতা, 'প্রাচীন প্রাচী' সমগ্র কাব্য ও 'নতুন দিনে'র কবিতাগুলি লিখিত। কিন্তু সঞ্জয়বাবু যে সেই সত্তায় একেবারে বিলীন হননি, হতে পারেন না, তার প্রমাণ 'যৌবনোত্তর' এবং 'অপ্রেম ও প্রেম'-এর সূক্ষ্মসুকুমার অনুভব-প্রধান, বলা উচিত উপলব্ধি-গাঢ় অন্যদুর্লভ সুরেলা ও মেদুর লিরিকগুচ্ছ; এদের 'জন্ম'ঋতু যা-ই হোক, 'ভূমিষ্ঠ' কাল পূর্বোক্তদের আবির্ভাবকালে মিলে-মিশে গেছে। 'প্রাচীন প্রাচী'র সনাক্ত ১৯৪৮, 'নতুন দিন' ১৯৪৭-চিহ্নিত, আর 'যৌবনোত্তর', 'অপ্রেম ও প্রেম' যথাক্রমে ১৯৪৩-৪৮ ও ১৯৪২-৫২ মধ্যবর্তী কালপর্বে উৎসারিত।

বস্তুত কবিতারূপেগুণে পূর্বোক্ত কাব্যত্রয়ী যদি জন্মলাভ ক'রে থাকে, 'যৌবনোত্তর' এবং 'অপ্রেম ও প্রেম' তবে এক-একটি আবির্ভাব—অনেক আশ্চর্য মনমুহূর্ত-মন্থনী দিব্যদেহী মন্ত্রগুণান্বিত 'আবিষ্কার', উদ্ভাবন নয়। যৌবনোত্তর গোধূলি-বিচলিত ঢলে-পড়া সূর্যের বিষণ্ণ রশ্মিপাতে, যদিচ এখনও আরক্তিম, মনোদিগন্তে নিবিড়-হয়ে-আসা কবিচেতনার এইসব অভিজ্ঞান অনন্যনিটোল পংক্তি ও স্তবকে, নিখুঁত শব্দবন্ধনে, পরিণত কবি-মনের পরিমিত স্বর্ণস্বাক্ষরে, জ্যা-বদ্ধ তীরের অমোঘ লক্ষ্যভেদে পাঠককে বারবার বিস্মিত ও ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত করে:

রাত্রিকে কোনদিন মনে হতো সমুদ্রের মতো
আজ সেই রাত্রি নেই।

কেন?

আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হ'তে জানে।

কোথায় গেল সে-মন? এখন তবে তার প্রকৃত অবস্থান বা পরিস্থিতির প্রতিচিত্রটি ঠিক কী?—

একবার ঝরে গেলে মন
সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর:
তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর—

তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর—
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন।

জ্যামিতির মতোই সংহতশরীর এই কবিতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। কিন্তু কী অব্যর্থ মর্মস্পর্শী! এমনকি জীবনানন্দের মতো ক্রান্তদর্শী সুনিপুণ 'প্রথমশ্রেণীর প্রথম' কবিও এমতাবস্থায় হুবহু একথাই তো এম্নি ঈষৎ-শিথিলতায় লিখেছিলেন :

জানি আমি পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ ;
দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝ'রে যায় মন।

সঞ্জয়বাবুর বাক্‌নির্মিতির ঋজুতা, ভাষা-ভাব-সন্নিবেশ-সংহতি সত্যই এক অন্য অভিনিবেশ, অন্য মনোনিবেশের সংবাদ দেয়। এমন নিবিড় সরলার্থে নিহিত-গভীরে সরাসরি প্রবেশ বাংলা কবিতায় সংখ্যা-গুণে অঙ্গুলিমেয়। যা-ই যিনি যেভাবে বলুন, জীবনের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বেদনায় কোন ভুল নেই, কোন ব্যতিক্রম নেই ; বিভিন্ন কবি বিভিন্ন স্বভাবে ও উচ্চারণে ভেতর-কাঁপানো এই অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-বেদনাবহকেই বাইরে সাজিয়ে তুলে বাজিয়ে যাওয়ার স্বতন্ত্র ধ্বনি, স্বতন্ত্র আওয়াজ তোলেন, তাতেই স্বকীয় কবিধর্ম, কবিকর্ম, কবিত্ব রক্ষা পায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্যে এমত-আপন-সত্তার গভীরে প্রবেশ-প্রস্থান আমরা প্রায়ই লক্ষ করি ; গভীর ধ্যানে জ্ঞানে ও প্রেমে সেই প্রবেশ একরূপ প্রস্থানও বটে, তথা পুনঃপ্রবেশ— অতীত-চারণে মাত্র নয়, অতীত-অবগাহনে, স্মৃতির পুনরুজ্জীবনে, অঙ্গাঙ্গী-যুক্ত প্রেমের, যুগ্মজন্ম-মৃত্যুর, 'মহামৃত্যু'র, নবজন্মের এই সব অদ্ভুত আশ্চর্য 'কোলাহল' :

যখন জীবনে
একদিন কোন এক জীবন অতীত হয়ে গেছে—
(সমুদ্রের থেকে দূরে চলে এসে শুনি তবু সমুদ্রের স্বর)
সে জীবন আমারি এ জীবনের মনের ভিতর
কোথায় কখন যেন করে যায় মৃদু কোলাহল।

এই কম্বুকণ্ঠ অনুভব, অথচ অসোচ্চার স্বোপলব্ধি তখন এক নিভৃতের অবলম্বন হয়ে ওঠে কবির। কেননা তখন মাত্র একে নিয়েই একা-একা, একাকী, অবিরাম ভাঙা-গড়া চলে মনের, মনের ভেতর মনের। 'জীবনের মনের ভিতর' পৌঁছে গিয়েই এমন সমুদ্র-স্বর-ভাসানো তুমুল অকূল ভালোবাসার সন্ধান করা যায়, দেওয়া যায়। পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয় বুঝি তখনই, সেই চিরন্তন 'তুমি'র মায়ায়, অন্তর্মাধুর্যের জাদুতে— 'তার' উপলব্ধিতে তথা স্বোপলব্ধিতেও, আপাতত যা আজ কঠিন কঠোর নির্লিপ্ত

স্মৃতির কফিনে শয়ান মর্ত্য মৃত্যুমূর্তি ছাড়া কিছু নয়, অমৃতের লেশও কি আছে তাতে ?—রাবীন্দ্রিক তো নয়, এ-কবি তাই তখন বলেন :

তোমার কাহিনী ছিল হৃদয়ের খানিক সময়
সে সময় ভেঙে গিয়ে নীল,
নেই তার আকাশের, দিনের, রাত্রির গাঢ় ভাষা ;
আমি নেই,
নেই তুমি তোমার চোখের ঝিলিমিল।
ছিল শুধু আমাদের হৃদয়ের খানিক বিস্ময়
হয়তো মৃত্যুর মতো—
মহামৃত্যু তোমার আমার,
তোমার একার মৃত্যু নয় !

উপরোক্ত কথাগুলির সঙ্গে 'মহামৃত্যু তোমার আমার' ইত্যাদি পূর্ণবিবরণী মিলিয়ে পড়লে স্বতই উদ্ভাসিত হয় এ-কবির নিজস্ব বিচার, পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি, পাশাপাশি কাছাকাছি এই শ্বাসরোধকারী সাংঘাতিক অমোঘ নিয়তির উচ্চারণ : 'আমি নেই, / নেই তুমি তোমার চোখের ঝিলিমিল'। কেবল কবরের খবর তো নয়, তার চেয়ে ঢের বড়ো মৃত্যুর সংবাদ এখানে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময়। অথচ 'চোখের ঝিলিমিল'। হায় ! তাই 'মহামৃত্যু' এবং দুজনের ; 'একার মৃত্যু নয়', একেবারেই না। এভাবে বাংলা কবিতায় প্রণয়িণী-প্রণয়ীর যুগল-মৃত্যুসংবাদ আর-কেউ নিবেদন করেছেন কিনা, এমন মমতায় ও নির্মমতায়, আমি ঠিক জানি না।

পুনরায় 'সৃষ্টি'-উপন্যাসের নায়ক দীপায়ন মনে আসে। এমনি এক অবস্থায় সেও নিজেকে বলেছিল—স্থূল নারীরসত্তায় স্থিত, অবস্থিত কোন নারীর কথা ভেবেই অবশ্য (গভীর-মনোযোগী 'সৃষ্টি'-পাঠকদের পরিস্থিতিটা স্মরণে থাকা সম্ভব) :

প্রতি মুহূর্তে মনে কি হ'তো না যেন একটি শবদেহ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছ—
তোতার শব, তাই তোমারও শব ! মৃত্যু-সমর্পিত !

কিন্তু এই বিশিষ্ট মৃত্যুচেতনা, মর্মান্তিক স্মৃতিরোমন্থন, ব্যথাঘন বিভোর মহাবিষাদ নিয়ে কত তন্ময় মুহূর্ত আর রচিত হ'তে পারে জীবনে, কত "ক্লান্ত-ক্লান্ত-ক্লান্তিহীন" কবিতাই বা তৈরি হয়ে উঠতে পারে ? অনেক পারে। নিখিল পৃথিবীর কবিতা-কথা তুলব না—অবিমৃষ্যকারিতা হবে ; তবে এক সঞ্জয়বাবুই সপ্রমাণ যে, প্রেমপাত্রী-পরিক্রমা-মৃত্যুব্যথা-স্মৃতি-তন্ময় মুহূর্ত যে তাঁর মধ্যে কত ভঙ্গি ও ভাবে দেখা দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই ; 'যৌবনোত্তর', 'অপ্রেম ও প্রেম', 'উত্তরপঞ্চাশ' ও 'জর্নাল'ধর্মী রচনার

অনেক নিদর্শন—(বর্তমান 'স্বনির্বাচিতে' অগ্রন্থিত—সে-প্রসঙ্গ পরে) তাঁর প্রায় সব-কবিতাই এমত মৃত্যু-অমৃত-মন্থন, প্রেত-প্রিয়া-'প্রদক্ষিণ'। প্রেম-পাত্রীর মৃত্যুজনিত ব্যথাকে ছুঁয়ে নিজেকেই ফিরে-ফিরে পাওয়া, নিজত্বেই ফিরে-ফিরে আসা; এবং মানুষের কাছে তার আপন প্রেমিক-সত্তার চেয়ে পরমাশ্চর্য আর কী আছে (বাউলেরা যাকে 'মনের মানুষ' বলেছেন।); তাকে ক্ষণে-ক্ষণে নতুন-নতুন রূপে চেনা চলতে থাকে, একেক ব্যথাভঙ্গির স্মরণে বহুভাবে আবিষ্কার হ'তে থাকে ব্যথিতের নিত্য-নতুন, নিত্য-অপস্রিয়মান অস্তিত্ব, কখনো ঘরে, কখনো বাইরে, আকাশে, বাতাসে, পথে, পথের প্রান্তে, কোথায় নয়? এবং এভাবেই কবির ভীষণ দেনাশোধ চলে বুঝি সেই প্রগাঢ় প্রণয়ের, মৃত্যুলীনার, তথা মৃত্যুত্তীর্ণার। মৃত্যু-নীল নয়, মৃত্যু-'সবুজ' (অথচ সবুজতা তো সজীবতাই।) সেই 'মেয়ে'র তদ্‌গত উপলব্ধি এ-কবির কাছে এরকম :

একটি সবুজ মেয়ে ভেঙে গেছে কাচের মতন
হয়ত কখন।
সবুজ আলোর কাচ মিশে গেছে আষাঢ়ের রোদে—
তারপর সেই আলো এখন অনেক—
অনেক সবুজ মুখ জানালায়, আলিসায়, মাঠে
আকাশে তাকায় একা, একা-একা হাঁটে।

অর্থাৎ জীবনের 'সবুজ মেয়ে' মৃত্যুর নীল কালোয় মিলেমিশে, তবু মিলিয়ে না গিয়ে, আজও এখন ও 'সবুজ'—কবির স্মরণ-মনন-ধ্যানের বৈশিষ্ট্যগুণে, নৈপুণ্যে। অন্যত্র এই সম্ভাবনারই আরেক জীবন্ত অভিব্যক্তি কবির অনুভবময় সৃষ্টি-সৌন্দর্যের মুহূর্ত-দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল, স্থিরচিত্রে মাত্র নয়, চলচ্চিত্র-চরিত্রে :

হৃদয়ের অনুভবগুলো
একদিন স্মৃতি হয়ে যায়,
আকাশে খানিক আর খানিক হাওয়ায়
হঠাৎ বিকেলে জানালায়
ছবির মতন যেন কিছু আঁকা থাকে ;
ছবি আছে—রেখা নয়,
ঘোলাটে দূরের রঙে রেখাগুলো মুছে গেছে বলে মনে হয়।
ছবি হয়ে স্মৃতি হয়ে যায়
বিষণ্ণ মেয়ের মতো চোখ তুলে একটু তাকায়
অনুভবগুলো।

'সেই' মেয়েকে নিয়ে অনেক অনুভব আজ. 'এই' মেয়ের মুখ-চোখ-চাহনি—'একটু'-তাকানো অনুভব! তাই তো পরমা!—সেই 'ক্ষণটুকু' আজ এখন, এই 'চিরকালে' আশ্চর্য-পরিণত, পর্যবসিত। মৃত্ত-জীবিত প্রণয়-অভিজ্ঞতার এহেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বাংলা কবিতায় অভিনব।

'অনুভব'গুলোও অভিব্যক্তি পেয়ে যায় না শুধু, রীতিমতো ব্যক্তিত্ববান হয়ে ওঠে! কবিতাটিতে যে-স্পর্শযোগ্যতা ঈর্ষনীয়ভাবে এসেছে, তা এই 'বিষণ্ণ মেয়ে'র চোখ তুলে তাকাবার গুণে, মানে, মর্যাদায়। আরেক মাত্রার কবিতা এটি; আরেক যাত্রার। মজাটা এখানে যে, অম্নি একটি মেয়ের বিষণ্ণ ব্যথার অনুভব দিয়েই কবিতাটির সূত্রপাত হয়েছিল। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো বটে! স্মৃতির মূলে যে একটি ছবি বিরাজমান—সেই ছবিটি স্মৃতি হয়ে স্মৃতিকে পুনরায় ছবি ক'রে তুলেছে। মৃতের পুনর্জীবন নয় শুধু, পুনরুজ্জীবন। ('ভুলিব না -জীবনের স্পর্ধিত শপথ'ও মানুষ, কোন-কোন মানুষ, করতে পারে বই কি! বুদ্ধদেব বসুর 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতাটি স্মরণীয়, তুলনীয়)। তাঁদের 'জীবন' তাঁদের 'ক্ষমা'ও করে। তখন সেই পুনরুজ্জীবিত ছবির পাশে মৌলিক ছবি এই মেয়েটিকে—সজীব সতেজ অবস্থায় যে 'সবুজ' ছিল, তাকে—এসে দাঁড়াতেই হয় তার বিষণ্ণ-মেদুর ভঙ্গিতে। আদৌ 'মধুর খেলা' তো নয়, বলতেই হয় তাই: 'নয়, নয় এ মধুর খেলা'। যুগপৎ মৃত্যুহিম অথচ মৃত্যুমদির, মেদুর অথচ মোহিন কবি-প্রণয়িনীর এমন অদ্ভুত ভূমিকা বাংলা কবিতায় নেই বললেই চলে; অথচ সে সর্বক্ষণ এই বিশেষ কবি-মনে আছে: সৃষ্টিলগ্নে তার ব্যথাক্লিষ্ট নেত্রপাতের করুণ ভূমিকাই যেহেতু তার নিয়তি, স্বয়ং এই কবিরও। এহেন একাকারত্ব বড় সহজে আসে না। অথচ একে আনাও যায় না। এ আসে, কচিৎ কোন বিশেষাবস্থ মনে, 'অনুভবে'। সঞ্জয়বাবুর মন সেই বিশেষ অবস্থারূঢ় অবস্থানগত আবিষ্ট মন, যেখানে এমন আসা-যাওয়া বেশ সমীচীন, সাবলীল, সম্ভব!

দীপায়ন চৌধুরীর ডাইরিতে ('সৃষ্টি' দ্রষ্টব্য) এই অদ্ভুত যুগ্ম-স্রষ্টা-মনস্তত্ত্বের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

> ব্যথা দিতে পারো মেয়েদের? তেম্নি কোন ব্যথা যার ছায়া লুকিয়ে থাকে তাদের চোখের পাতায়, চোখের তারায়, চোখের নিবেদনে? যে-ব্যথা তাদেরই, তুমি শুধু হাতে তুলে মাখিয়ে দিচ্ছ তাদের হৃদয়ে। পারো দিতে কোন ব্যথা? দেখবে অদ্ভুত হয়ে গেছে তারা তারপর। তখন তারা আর তোমার পাশে অন্য কেউ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, দেখবে যেন তোমারই বিস্মৃত কোন অনুভূতি, কোন

কামনা, কোন স্বপ্ন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তোমার চোখের উপর। সে-মুহূর্তে তোমরা এক হয়ে গেছ। সৃষ্টির মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছ।

প্রেমিক ও প্রেম-পাত্রীর এই ব্যথা-দেওয়া-নেওয়ার পারস্পরিক, অন্যোন্য-নির্ভর সম্পর্ক নিংড়ে অজস্র সৃষ্টি-মুহূর্ত তবে সত্যিই তৈরি হ'তে পারে। স্বয়ং কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'যৌবনোত্তর', 'অপ্রেম ও প্রেম' শীর্ষক নিটোল লিরিকগুলির অনশ্বর জনক-জননী হয়ে রইল তারা, একাকারত্বে, চিরকালের জন্য। মূলত এই লিরিক-গুচ্ছের সূক্ষ্ম সুকুমার ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও আশ্চর্য ভাবনা-বিন্যাস-পারিপাট্য দেখে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সঞ্জয়বাবুকে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য গীতিকবিতার লেখক হিসেবে সুনির্দিষ্ট করেছিলেন। সঙ্গততম তাঁর সিদ্ধান্ত। সত্যই, 'অপ্রেম ও প্রেমে'র তেরোটি লিরিকের মনোধর্মে ও গঠনকর্মে, মননে এমন একটি মৌলিক ও অমোঘ শিল্পকর্মের সাক্ষাৎ মেলে যে, তা বিদ্যাপতি থেকে আজ পর্যন্ত লিখিত সার্থক প্রেম-কবিতা-গুচ্ছের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন ব'লেই মনে হয়, কয়েকগুচ্ছ গোলাপ বা আঙুরের মধ্যে অনবদ্য রসরূপ-ভরপুর আরেকটি আলাদা গুচ্ছ—স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে যার তুলনা দুষ্কর, দুষ্প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের সে-কথাই মনে হয় আবার :

তুমি যে তুমিই ওগো এই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।

(শেষ পংক্তিটি ভাবগত দিকে শক্তিমান, রচনাগত কারণে যত দুর্বলই হোক) এখানে, সঞ্জয়-প্রসঙ্গে সবিশেষ মনে হয় যে, কোন একটিমাত্র রমণীর ভূমিকা একটি পুরুষের মনে কাজ করছে, ক'রে গেছে অবিরাম, তা যেমন অর্ধসত্য—শাশ্বত নারীপ্রকৃতিরই কাজ তা শাশ্বত পুরুষের দেহমনোপ্রাণে, স্বোপলব্ধ অনুভবের গভীর অবগাহনে, মন্থনে—বাকি-অর্ধেক সত্য সে-ও।

'সৃষ্টি'র দীপায়ন যেমন নিজেকে বলেছিল :

তোতা যা বলতে পারত সুপর্ণা বলছে আজ। অনেকবার অনেককে 'ভালোবাসি' বলেছি—হয়তো ভালোবাসিনি—পারিনি ভালোবাসতে। হয়তো কোন পুরুষই পারে না মেয়েদের ভালোবাসতে। যে-মন তুমি জানো না—গাছের পাতার মতো হাওয়ায় এলোমেলো দুলছে যে-মন, কী করে পারো তার গায়ে আদর বুলোতে? পারো না। আমি পারিনি। যাদের বলেছি, ভালোবাসি, হয়তো তারা বলার উপলক্ষ ছিল শুধু। ভালোবেসেছি আমি কোন একটি মেয়ের সত্তাকে—একটি ভাবকে—তা আমার মা নয়, শেফালি নয়, ময়না নয়, বীণাদি নয়, তোতা নয়, সবিতা নয়। সুপর্ণা? সুপর্ণাও কি হতে পারে? সবাই ওরা ভঙ্গী, যে-সব ভঙ্গী মিলেমিশে একটি

ভাবকে মেয়ের রূপ দেয়। ভালোবাসিনি সত্যি, সুপর্ণাকেও আমি ভালোবাসিনি। ভালোবেসেছি ওর উপাধিকে—ও মেয়ে।

দীপায়নের কথা আক্ষরিকভাবে সঞ্জয়বাবুর আন্তরিক কথা না-ও হতে পারে এবং এ-বক্তব্যে যদি সাংখ্য-পুরুষের প্রকৃতিদর্শনও হয়, ক্ষতি নেই। তবে কবিপ্রাণেমনে তা যে কী গভীর ভাবাবেগ ও কী নিপুণ শিল্পকর্ম, ভাষাশিল্প তৈরি ক'রে দিতে চায়, পারে, সঞ্জয়বাবু তা দেখিয়েছেন—বিরলদৃষ্ট সেই তাঁর একলা-একাকারত্বের আত্মীয়-তন্ময়তা, তা কোন নারীতেই হোক বা নারীত্বেই হোক, তার অসামান্যতা সীমাহীন এবং আবেদনেও এমন যে, তাকে অনির্বচনীয় বলতে লোভ হয়। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আত্মসম্বরণ করব, বিশেষ এক-জাতীয় প্রেমকবিতার লেখকদের মধ্যে সঞ্জয়বাবুর আসন যেজন্য প্রথম সারিতে, তারই আরেক উৎকৃষ্ট নিদর্শন :

সব আজ খালি
দিলাম ফিরায়ে সব। সব আলো সোনালি-রূপালি
তোমার দিনের হাতে। সব তাপ তারার আগুনে।
প্রাণের নিখিল
হয়তো ছিলে না তুমি। গন্ধ তাই দিয়ে যাই ফুলে
ছোঁওয়া মৃত্তিকার কায়ে। তাই নাও চির-হৈমবতী।
আকাশে ও জলে মুছে যাক ব্যর্থ আমার আরতি
পদচিহ্ন মুছে যাক অন্ধকার সময়ের কূলে।

প্রশ্ন শুধু একটাই : এত ক'রেও 'ব্যর্থ' 'আরতি'? উত্তরও একটা : 'আরতি' 'ব্যর্থ' কিনা আরতি-যোগ্যারা জানেন, আমরা শুধু বুঝি, তাঁর এহেন গভীরারক্ত আর্তি ব্যর্থ নয়, অন্তত সার্থক শাশ্বত কবিতা হিসেবে নয়, কিছুতেই না।

তারপর তাঁর অপসরণ-কথা। অপরিসীম দুঃখদায়ক ও গভীর শোচনীয় সন্দেহ নেই—কিন্তু এমন কবি তো আসবেনই আমাদের মধ্যে, যিনি তাঁর এহেন আলোকিত-দীপিত-আবির্ভাব ও তাঁর অপস্রিয়মানতা দিয়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য ও প্রেম সাধারণ-চোখে অসাধারণ ক'রে তুলবেন। প্রতিভার প্রতিভাত-করণ এমনই। এতে তাঁর 'জন্মদিন'ও সার্থক ('জন্মদিনে' কবিতাটি দ্র°)। অবশ্য আদৌ এই প্রেমজনিত দুঃখদহন, ব্যথাবগাহন ও পরে অপসৃতি মেটাফিজিক্যাল কবি ডন-কথিত **'Love's martyrdom'**। সঞ্জয়বাবু সেই প্রেম-শহীদত্ব ও প্রেম-সহিতত্বের, একাত্মতার, মমত্বঘন অন্তরঙ্গতম কবি। হয়তো এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরী হিসেবে আর কারও সঙ্গে বিশেষত সাফো, ডন ও আমাদের বলদেব পালিত (একটিদুটি কবিতায় মাত্র), রবীন্দ্রনাথ (অনেক গানে ও স্বল্পভাষী কবিতায়), জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ,

বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-কেও (কয়েকটি ছোট কবিতায় বা সনেটকল্প রচনায়) কখনো মনে পড়বে। সঞ্জয়বাবুর পক্ষে অধিকন্তু বক্তব্য এই যে, তাঁর প্রেম-প্রাসঙ্গিক মৃত্যুভাবনা জীবনাচরণই, অন্ধকারধ্যানও আলোকসাধনা, অপ্রেম-কল্পনাও প্রেম-প্রবর্তনা-প্রেরণাই বটে। এদেশে একটি প্রেমিক-হৃদয়ের আন্তরিক সততা ও অগ্নিশুদ্ধতার ছবি যদি গভীরভাবে দেখতে চাই, বারবার তবে সঞ্জয়বাবুর কবিতায় আমাদের ফিরে আসতে হবে। এবং আমরা আসব।

সঙ্কলনটিতে কবির প্রথম ও মধ্য, মধ্য-অন্ত্যযুগের কবিতাই 'স্বনির্বাচিত'। কিন্তু অন্ত্যযুগের, বিশেষত 'পদাবলী', 'উত্তরপঞ্চাশ' ও জর্নালধর্মী কবিতা অগৃহীত থাকাটা মর্মান্তিক ; যেহেতু কবির আত্মোপলব্ধির প্রাগন্তিম উন্মোচন, পরিণততম প্রেম-পরিক্রমা, জীবন-পর্যটন ও মৃত্যু-'প্রদক্ষিণ' প্রতিনিধিত্বে অসম্পূর্ণ রইল। অর্থাৎ কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শেষাবধি:সর্বাধুনিক পরিচয় পর্যন্ত এ-সঙ্কলন আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে না। সেখানে সশ্রদ্ধ কাব্যরসিকদের 'পদাবলী', 'উত্তরপঞ্চাশ' ও জর্নাল-ধর্মী কবিতাগুলি স্বতন্ত্র অধ্যয়নের অধ্যবসায়ে অগ্রসর ও উপভোগে সন্ধিৎসু হতে হবে। তখনই আমাদের দেশের প্রকাশকদের দিকে আরেকবার চেয়ে বলিহারি বলতে হয়! তাঁদের কাছে খোলাখুলি প্রশ্ন : নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চেতন কাব্যামোদবৈকল্য তথা অবকাশরঞ্জনী কাব্যপাঠকৈবল্যদশার নিশ্চিত নিরাকার শ্মশানবিবাগী এলাকা ছেড়ে কবে আর জীবন-প্রাণ-মনের জয়োৎসব করবেন ? সৎ কবিদের 'মহৎ মৃত্যু' হ'য়ে গেলে ? তাঁদের চিতার ওপর মঠ তুলবেন ? সচরাচর-পাঠকসমাজের কবি ও কবিতা-বিষয়ক রুচি-প্রজ্ঞা-পরিতৃপ্তিবোধও আমাদের অবিদিত নয়। বুঝতে পারি না, বহু দুঃখে, দারিদ্র্যে, অবমাননা ও বঞ্চনা-বেদনায় বিচিত্রসুন্দর মনোজ্ঞ মানবীয় ভঙ্গিতে ও সঙ্গীতে কবিরা জীবনের কাছে আমাদের হয়ে এই যে অহরহ ঋণশোধ ক'রে চলেছেন, আমরা সে-ঋণের কতটুকু অংশ পরিশোধ করি কবিকে, করতে চাই বা পারি ? 'এদেশে জন্মে···' না, সুকান্তর সেই সম্পূর্ণ পংক্তির পাঠ ও উচ্চারণ আর এ-প্রসঙ্গে করতে চাই নে ; তিনিও এ-উপলক্ষে কবিতাটি, বিশেষত পংক্তিটি লেখেননি ; কিন্তু কবিদের সাধারণভাবে এ-দেশে, এ-দেশেই, নিদারুণ দুর্গতি। অথচ কবিতার পাঠকসমাজ আজকাল বেড়েছে, কেননা কবিদের সংখ্যাও অনেক, অনির্ণেয়। জানি না তাঁরা নিজেদের কবিতা ছাড়া অন্যদের কবিতাও কিনে পড়েন কিনা। ছিন্নভিন্ন হয়ে এই দুশ্চিকিৎস্য দেশকালব্যাধি উন্মূল হবে কবে ? অবশেষে কেবল একটি কথা : যথার্থগুণীদের প্রতি এই 'আত্মঘাতী' উপেক্ষা বিষয়ে অবশিষ্ট গুণী-গুণগ্রাহীরা কী বলেন !

সঞ্জয় ভট্টাচার্য-রচিত 'স্রষ্টা' ও 'স্বনির্বাচিত কবিতা' অবলম্বনে

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস

'ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের যে অবশ্যম্ভাবী সংঘাত এবং ফলে সমাজ-জীবনে বা ব্যক্তি-জীবনে যে রূপান্তর তা যেমন কথাসাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে, তেম্নি ইতিহাসেরও। এখানেই কথা-সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের মিলন সম্ভবপর। ...সব উপন্যাসই ইতিহাস—অতীতের কিম্বা বর্তমানের ইতিহাস।'

'বাস্তবভিত্তিক কল্পনা রোমান্টিকের পক্ষে সহজ কথা কিন্তু কল্পনা-ভিত্তিক বস্তু গড়ে তোলাই মানবিক সৃষ্টি। কথাটা সার্ত্র তাঁর দার্শনিক নিবন্ধে চমৎকার পরিবেশন করেছেন। মার্ক্স্‌ও বলতেন, চিন্তা বা কল্পনা মগজস্থ হলেই তা বাস্তব।'

উপরের উক্তি-দুটি নবপর্যায় পূর্বাশার ২য় বর্ষ আশ্বিন ১৩৭২ থেকে উদ্ধৃত। বিশেষভাবে পরিকল্পিত 'সম্পাদকীয়' রচনা 'পূর্বাশার কথা : বাংলা উপন্যাসের এক কাল'—'কল্লোল' ও উত্তরকালের প্রধান ঔপন্যাসিকদের দিয়ে একদা সঞ্জয়বাবু যে একটি সিম্পোসিয়াম করে তুলতে চেয়েছিলেন, তারই পুনর্মুদ্রিত সূত্রধারক তাঁর স্বকৃতাংশ। বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক রূপে তাঁরই সৃষ্টিকর্তৃত্বের অভিলাষ, অন্বিষ্ট ও অভিনিবেশ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মনোযোগ আকর্ষণে এই আহরণ অত্যাবশ্যক। উপরোক্ত দ্বিতীয়াংশে তিনি সার্ত্র ও মার্ক্স্‌কে উল্লেখ করেছেন চল্‌তি বুলির খাতিরী গুঞ্জনে নয়, সাম্প্রতিক অস্তিত্ববাদী ও মার্ক্স্‌বাদীদের 'সত্য'জ্ঞানার্থেও নয়, আপন-অভিলষিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-প্রযোজনার বাতাবরণ উন্মোচনেরই প্রয়োজনে। যদিচ তিনি অস্তিত্ববাদী দর্শন ও উপন্যাসের সহমর্মী রসজ্ঞ ছিলেন, মার্ক্সেও তাঁর সশ্রদ্ধ প্রত্যয় ছিল, তথাপি তাঁর অস্তিত্ববাদে কোন প্রবল সমর্থন, মার্ক্স্‌বাদে কোন প্রচণ্ড আকর্ষণ কখনো দেখা যায়নি। তবে কথাসাহিত্যের লেখকরূপে তিনি যে কল্পনাভিত্তিক বস্তুর স্রষ্টা এবং চিন্তা বা কল্পনাকে মগজস্থ ক'রে 'বাস্তবিক,' তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে প্রচুর আলোবাতাসে তাঁর মনের ঘরকে তিনি ভরিয়েছেন, মননশীল লেখক ব'লে তাঁর সমাদর নয়, শ্রুতি ছিল, উপন্যাস-রচনার সময় বহুবিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষায় নিরত হয়ে তিনি পশ্চিমের দিগন্তেই অবিরত চেয়েছেন—তবু স্পষ্টত তাঁর ওপর তেমন কারও প্রভাব সোজাসুজি বাৎলে দেওয়া অসম্ভব,

অসমীচীন। এই মাত্র বলা চলে, তিনি বের্গসঁর স্মৃতিজড়িত প্রাণপ্রবৃত্তির ঐতিহাসিক পরিণতি ও রূপ-রূপান্তরে সোৎসাহ ছিলেন, সেই সূত্রে এবং আরো একাধিক কারণে প্রুস্তের প্রতি অনুরাগী, জয়সের জন্যও তাঁর জঙ্গম-চৈতন্যবান জীবনে প্রতিক্রিয়ার বলয় ফুটে উঠেছিল। আপাতত তাঁর উপন্যাস আলোচনার ভূমিকায় ঐ কথাটাই খুব জরুরি যে, তিনি স্বীকার করেন, 'সব উপন্যাসই ইতিহাস—অতীতের কিম্বা বর্তমানের ইতিহাস' ; অনেকটা প্রুস্ত কিম্বা জয়সের মতোই এ-বিশ্বাস।

"চল্লিশের দশকে, যুদ্ধ-স্বাধীনতা আন্দোলন-মন্বন্তর-দাঙ্গার সঙ্কট-সময়ে ভবিষ্যতের দিকে অনেকেই মন প্রক্ষেপ ক'রে কখনো কবিতায় কখনো বা উপন্যাসে কথা বলে মন তাজা রাখতে চেষ্টা করেছেন। আজকের দিনের যুবসম্প্রদায়ের মতো অ্যাঙ্গুইশ-অ্যাঙ্গারের অগ্নিদাহে হাংরি হননি। অ্যংজাইটি আমাদেরও ছিল, অস্তিত্ববাদীদের মতোই, কেননা শিয়রে শমন। আমার সে-সময়কার মাঝারি উপন্যাস: 'রাত্রি', 'কল্লোল', 'মৌচাক' ও 'সৃষ্টি'।" এখানে অবশ্য তথ্যের কিছু ভুল আছে। প্রথমত 'সৃষ্টি' পঞ্চাশ-দশকের সৃষ্টি—১৯৫১য় তার সূচনা। আর 'রাত্রি' 'কল্লোলে'রও পূর্ববর্তী ; 'বৃত্ত', 'কস্মৈদেবায়' এই তালিকার বহির্ভূত। ঐ দুটি রচনা চল্লিশ-দশকের কথাসাহিত্যে তাঁর উল্লেখ্য ভূমিকার প্রাথমিক সংযোজন।

প্রথম উপন্যাস 'বৃত্তে'ই তাঁর মনোবাদী ও পরীক্ষানিরীক্ষোন্মুখ সতর্ক-সচেতন কথাশিল্পীর অভিপ্রায়-রুচি সুস্পষ্ট। প্রায়-সংলগ্ন পূর্বসূরীদের আনীত অন্যতম প্রধান স্রোতে যে যৌনমুক্তি আন্দোলন তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনে উদ্‌ভ্রান্তি এনেছিল সেই ভারসাম্যহারা অস্থির 'বর্তমানের ইতিহাস' 'বৃত্ত'। এখানে একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক উদ্ধৃতিযোগ্য : 'যে জলন্ত আবেগ হইতে প্রেমের উদ্ভব, কিছুদিন একত্রবাসের ফলে তাহা স্তিমিত হইয়া জড়, অভ্যস্ত গতানুগতিকতার ভস্মরাশিতে পরিণত হয়—কাজেই আত্মার স্বাধীন, বাধাহীন স্ফুরণের জন্যই আবার নূতন আবেগের দীপশিখা হইতে এই নির্বাপিত-প্রায় আলোকটিকে জ্বালাইয়া লইতে হয়। প্রেমের এই পাত্র-পরিবর্তনে লজ্জা-সংকোচের কোন কারণ নাই, কেননা এই উপায়েই জীবনের সার্থকতা, তাহার তেজোগর্ভ, জ্যোতির্ময় স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব : এই স্বতঃস্বীকৃতির উপরেই আধুনিক উপন্যাসের প্রেমের আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন ঔপন্যাসিকই এই প্রেমের চরিতার্থতা কেমন করিয়া জীবনের মহনীয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তাহার কোন চিত্র আঁকেন নাই। বর্তমান ব্যবস্থার ত্রুটি, অপূর্ণতা, ইহার ক্ষোভ ও অতৃপ্তির ধারণাটি নির্মম বিশ্লেষণ ও পুঞ্জীভূত তথ্য-সন্নিবেশের দ্বারা আমাদের

মনে বদ্ধমূল করিয়াছেন ; কিন্তু ভবিষ্যতের উন্নততর ব্যবস্থার প্রতি দূর হইতে ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।...(এবং) প্রেম একটা বিজ্ঞান-চালিত যন্ত্রশক্তিতে পরিণত হইয়া তাহার সমস্ত মাধুর্য ও বৈদ্যুতী-শক্তি হারাইয়াছে।'[১]

সঞ্জয়বাবুর অগ্রজ স্বদেশী-বিদেশী কথাসাহিত্যিকদের প্রতি এই সমালোচনা উদ্যত রয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'বৃত্ত'কথা আলোচনা করলে দেখতে পাই, এ-সমস্যাই একেবারে ভিন্ন ভাবে, অনেকটা যেন প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনায়, কয়েকটি মাত্র পাত্র-পাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি পরিবেশনে বিন্যস্ত হয়েছে। মধ্যবয়স্ক অধ্যাপক সত্যবান পনেরো বছর আগে যে-সতীকে বিয়ে করেছে, সে সমাজের অনুমোদন ও মা-বাবার অনুশাসন অগ্রাহ্য করে তখন সাহসিকার কাজ করেছিল। কিন্তু বিয়ের পর তার স্বাধীনতাবোধ লুপ্ত ক'রে গার্হস্থ্য কর্তব্যে ও স্বামীর ইচ্ছানুবর্তনে সে যান্ত্রিক ভাবে নিযুক্ত হয়েছে। অধ্যাপকের জীবনে তাই উষ্ণতর সাহচর্যের উত্তেজনা ক্রমে প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়েছে। সুরমার সঙ্গে তার ক্ষণিক অন্তরঙ্গতা তাকে যৌন সম্বন্ধের বৈপ্লবিক উদ্ঘাটন সাক্ষাৎ করিয়েছে। তারপর তার জীবনে এসেছে বনানী—তারুণ্যের নির্ভীক স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু বনানীর সঙ্গেও তার মিলন ব্যর্থ হয়েছে। বনানীর কর্মজীবনে সে সংস্রবহীন। মাঝে মাঝে কোমল ভাবাবেগের ক্ষেত্রে তারা সাময়িক মিলিত হয়েছে মাত্র। শেষ পর্যন্ত তার পনেরো বৎসরের বিবাহসন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা আত্মবিশ্লেষণের ফলে সে সতীর মধ্যে মননশীলতার পরিচয় পেয়ে তার সম্পর্কে বিমুখতা জয় করেছে। সে অনুভব করেছে যে, স্ত্রীর কাছে তার স্বাতন্ত্র্যের দাবী আদৌ সম্পূর্ণ নয়, হতে পারে না—স্বার্থবোধ ও আত্মাভিমানে তা সীমাবদ্ধ। সে বনানীকে কামনা করেছে সতীর তরুণ জীবনের প্রতিনিধিত্বে, তার স্মারক-স্বরূপ প্রাচীন যৌবন-উন্মাদনার নবরোমাঞ্চ অনুভবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সতীর প্রভাব তার জীবনে চিরকাম্য মনে ক'রে সে সেকালীন অন্যান্য চিঠি ও প্রেমপত্রের সঙ্গে তার অতৃপ্ত হৃদয়াবেগ ভস্মীভূত করেছে। তার জীবনে এভাবেই নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির পরিবর্তে নিষ্ফল বৃত্তানুবর্তন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য চরিত্রেও এই বৃত্তানুগামিতা লক্ষণীয়। সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে প্রগতিশীল সুরমার ক্ষেত্রেও। সে স্বামীকে ত্যাগ ক'রে একাধিক পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে—তাতে জীবনে তার ব্যর্থতার ক্লান্তিই শুধু জমেছে। বিদ্রোহের যে-তীব্রতা তাকে চরিতার্থতা দিতে পারত, বিদ্রোহের প্রস্তুত পরিমণ্ডল না থাকায়, ব্যক্তিগতভাবে ক্রমেই সে-দাহিকাশক্তি ক্ষয়িত হয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক প্রয়াস তাই 'পরিবর্তনের সিঁড়ি মাত্র', সার্থকতার সেতু নয়। তাই

সুরমা যখন সত্যবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সে বাধা দেয়নি বটে, একে বুদ্ধিগত ভাবে মান্যও করেছে, কিন্তু হার্দ্য বিনিময় সম্ভব হয়নি। স্বীয় জীবনের দুর্বহ শ্রান্তি অনুভব ক'রে সে অজ্ঞাতবাসে স'রে গেছে। কারণস্বরূপ তার নিজস্ব নির্দেশ এই যে, আধুনিক যুগের সমস্ত মানুষী অন্তর্দ্বন্দ্ব, মতে-মনোভাবে-ব্যবহারে বিরোধ ও বৈষম্য এক অসাধ্য ব্যাধিরই প্রকাশ। দ্বিধাজড়িত পায়ে পশ্চাদপসরণ ভিন্ন তারও আর পথ নেই—উক্ত ব্যাধিবিরোধের এই ভূপতিত পরিণাম। বনানী যুদ্ধোত্তর কালের সন্তান—সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রমিকের প্রতি তার সহানুভূতি একরূপ সহজাত সংস্কার। কিন্তু তার জীবনেও ঐক্য ও শান্তির অভাব। কর্মসহচর ও যৌনপরিতৃপ্তির পাত্র তার বিভিন্ন। তার সমকালীন শিশির সমাজবিপ্লবী মতবাদের উৎসাহে মমতা প্রেম প্রভৃতি কোমল হৃদয়বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় না— রাষ্ট্র ও সমাজের পুনর্গঠন পর্যন্ত এ-সমস্ত তার কাছে স্থগিতযোগ্য দুর্বলতা। কাজেই হার্দ্য মোহের তৃপ্তিহেতু বনানীকে পূর্বযুগের প্রতিনিধি মধ্যবয়স্ক সত্যবানকে আশ্রয় করতে হয়েছে। কিন্তু ফলাফলে দেখা যায়, সে শ্রান্তি ও শূন্যতাবোধে আরো বিপন্ন হ'য়ে কর্মক্ষেত্রে শিশিরেরই সহযোগিনী। তার স্বতঃস্ফূর্ত লীলাচাঞ্চল্য ও যৌনবোধের নিশ্চিন্ত ভোগস্পৃহা দুঃসাহসী যৌবনেরই বিচ্ছুরণ। জোয়ারের কাল ফুরোলে, ভাঁটার দিনে, বয়োবৃদ্ধিতে, সেও সুরমার দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হ'তে পারত, এম্নি মনে হয়। এই আশা ও আস্পৃহাপূর্ণ নবযুগের তরুণীরও ভবিতব্য অনিবার্য ব্যর্থতার চক্রাবর্তন। রবীন্দ্রাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রবীণ মাষ্টারমশাই আরেক মোহভঙ্গের দৃষ্টান্ত। সুরমাসম্পর্কিত নবীন রজতেরও স্বাধীন ইচ্ছা মাত্র সাময়িক সরলরেখায় ধাবমান হয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে চিরপ্রথার পূর্বনির্দিষ্ট পথে, আচরণে।

উপন্যাসে একমাত্র ব্যতিক্রম সতী। অক্ষুণ্ণ চিত্তপ্রসাদের প্রতিনিধি। সংসারের কেন্দ্রে আপন জীবনগতির নিশ্ছিদ্র তাড়নায় সে এমনই নিশ্চিন্ত-ঘূর্ণিত যে, এই কক্ষাবর্তনে সে আদৌ অনুভূতিহীন অভ্যস্ততায় স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নিশ্চেতন। এই একান্ত আত্মবিলোপে সে বহির্দেশাগত চিত্তবিক্ষেপ থেকে রক্ষা পেয়েছে, অন্তর্দেশীয় বিক্ষোভ প্রশ্নাতীত, অবকাশহীন; অবশেষে অক্লান্ত পরিচর্যা ও দৈহিক আকর্ষণে স্বামীকেও উৎকেন্দ্রিক পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছে। সজাগ বিচক্ষণতায়, প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে সে অচিরকালেই অভীষ্ট লাভ করেছে—স্বামীর দুরন্ত চাঞ্চল্যকে আপন স্বভাবের স্থিরতায় শান্ত ও নিয়মিত করেছে, নিজেকেও সব মিলিয়ে অব্যর্থ-আনন্দিত ব'লে অনুভব করেছে।

সমস্যা ও চিন্তাপ্রধান উপন্যাসের নিয়মে এখানে সমস্যার প্রবেশ-প্রস্থান দিয়েই

পাত্রপাত্রী প্রত্যেকের জীবনেতিহাস রচিত হয়েছে। এতে মনে হতে পারে : 'এই জাতীয় উপন্যাসের জীবনালোচনা সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী। ইহাতে জীবন সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম মন্তব্য আছে, জীবনীশক্তি নাই।'[১] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। অতঃপর বৃত্তার্পিত জীবন এখানে সকলেরই, ক্লান্তিবোধে পাণ্ডুর ও ম্লান তবু সকলে নয়। কেন্দ্রীয় শক্তি অটুট থাকলে জীবন যে বৃত্ত-সমর্পিত হয়েও নিরালোক-নিরানন্দ হয় না, সতীই তার বড়ো প্রমাণ ও সমর্থন। পক্ষান্তরে সত্যবান প্রভৃতি অন্যান্য সবাই আইডিয়া-নির্ভর জীবনযাপনে কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে মাত্র ব্যর্থবিচিত্র অভিজ্ঞতায় বিক্ষিপ্ত পরিধিব্যাপ্ত হয়েছে, 'সত্য'হীন হয়ে পরে সত্যবান রূপেই ফিরেছে, ইতিমধ্যে আত্মশক্তিহীনতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সভ্যতার সংকটে দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত চরিত্রশক্তির অপচয়-উন্মোচনই এ-গ্রন্থের উপজীব্য—ভবিতব্য-ভারাতুরতার দীর্ণ দীর্ঘশ্বাসে শিক্ষিত মনস্বীদের জীবনবৃত্ত যে বৃথাই ফুলেফেঁপে উঠছে, কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে হাতের কাজ, বাস্তববুদ্ধি ও আদর্শবাদিতা, একটি পরস্পর-বিকিরণী তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী রশ্মিপাতে এই স্বল্পপরমায়ু সংসারসমাজচিত্রের **'typical'** চরিত্রগুলি তারই তীব্র বেদনায় প্রতিহত ও ব্যর্থস্বরূপে প্রতিসরিত। বৃত্তাভাসিত সময়ের স্পাইরালে কয়েকটি 'ফাঁপা মানুষ' উঠেছে নেমেছে : শব্দ শোনা গেছে তার, **'Not...a bang, but a whimper'** ![২]

কেবল উন্মার্গ যৌনমুক্তির আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, অন্তঃসারহীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির পরিপ্রেক্ষিতও সঞ্জয়বাবুর ধীমান কল্পনায় সেদিন প্রত্যক্ষবৎ ফুটে উঠেছিল। একদিকে গান্ধী-নেতৃত্বে কংগ্রেসী-ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় পথচ্যুত তারুণ্যের সন্ত্রাসবাদিতা, অন্যদিকে মার্ক্‌স্‌বাদী দর্শন-সাহিত্য-চেতনা-প্রেরণায় চাষীশ্রমিকের বৃথানুসরণ! স্বয়ং সঞ্জয়বাবু ব্যক্তিগত জীবনে এ-সময়ে অনিশ্চিত-ভাবাপন্ন ছিলেন, সন্ত্রাসবাদিতায় নিজে যাননি, মার্ক্‌স্‌বাদ-গান্ধীবাদে যুগপৎ ছিলেন, কিন্তু চাক্ষুষ ও অন্তরঙ্গ করে নিয়েছিলেন সময়কার ব্যর্থবিষণ্ণ বুদ্ধিজীবীদের অস্থির 'বর্তমান ইতিহাস'—প্রত্যয় ও বিশ্বাস-বিলুপ্ত সেই অন্ধকার দিনরাত্রির ইতিবৃত্ত লেখা হয়েছে একে একে 'বৃত্ত', পরবর্তী 'কস্মৈদেবায়,' 'মরামাটি', 'দিনান্ত', 'রাত্রি' 'কল্লোল' উপন্যাসগুলিতে—১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ এই সময়সীমায়। মরামাটি দূরপল্লীর চাষীদের কাহিনী। তিরিশের দশকে তারাশঙ্কর সরোজকুমার রায়চৌধুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা যতটুকু অগ্রণী ছিলেন এদিকে, চল্লিশের দশক প্রথমভাগ ততটুকুই পিছিয়েছিল ভ্রান্ত রাজনীতির আবর্তে আত্মহারা অসংবদ্ধতায়—সঞ্জয়বাবু আন্তরিক-ভাবে ক্ষতিপূরণ করতে চাইলেন বটে, যথাসম্ভব আত্মীয়সম্পর্কে মাটি ও মানুষকে আবাহনও করলেন, কিন্তু সত্যকার সম্পূর্ণ শ্রেণীচেতনায় বিন্যস্ত হলো না সেই

রচনা—'সাধ্য ছিল না'। এ-প্রসঙ্গে তাঁর নিজের স্বীকৃতি প্রণিধানযোগ্য : 'কখনো সমসাময়িক যুগের প্রতিক্রিয়ায়, কখনো ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় বা কারো সঙ্গে আলোচনার ফলে সোস্যাল কনটেণ্ট আমার উপন্যাসে এসেছে। তবে ধূর্জটিদা যেমন বলেছিলেন, এদেশে এখনো বুর্জোয়া উপন্যাসই হলো না, তো কম্যুনিষ্ট উপন্যাস! ধূর্জটিদার সেকথা মনে ছিলো, যখন আমি 'দিনান্ত' লিখি।' অর্থাৎ একই সঙ্গে পূর্বপদক্ষেপ 'মরামাটি'র জন্য আক্ষেপহীনতার হেতু এবং পরবর্তী 'দিনান্তে'র বাতাবরণ-সঙ্কেত এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সঞ্জয়বাবু সময়কাল সম্পর্কে অতিসচেতন দায়িত্ববান লেখকদের অন্যতম। 'কস্মৈদেবায়' ১৯৪৩ সালের শেষে কলকাতার যুদ্ধশংকা দিয়ে সূচিত। তার প্রাকৃভাষণ এই : 'শেষে এখানেও আকাশের ভয় এল : এই কোল্‌কাতায়। পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, বলকান, গ্রীস, রাশ্যার মাটি ছুঁয়ে যায় এই ভয়। যে-ভয় উপকথার দানবের মত আকাশ ছেয়ে এসেছে সুমাত্রা-জাভার, মালয়ের, বর্মার। বাংলাদেশের আকাশ—রবীন্দ্রনাথ যাকে গান দিয়ে ভরে দিয়ে গেছেন—সবুজ মাটির উপর সেই নীল আকাশ—আকাশের সেই জ্যোৎস্না, যাকে দেখলে নাকি মনে হয় রজনীগন্ধার গন্ধের মতো ভালবাসা ভেসে বেড়াচ্ছে—সেখানেও কিনা ভয়ের একটা অদ্ভুত, ঠাণ্ডা, রোমশ অনুভূতি!

বাইশে ডিসেম্বর রাত বারোটা। সাইরেনের আর্তস্বর বেজে যাচ্ছে।...'এর পর ক্রমান্বয়ে সেকালের তরুণ-তরুণীদের রাজনীতির পাকে আবর্তের কথা। আর্তি থেকে আবর্ত, পুনরাবর্তন, আর্তি। নইলে গল্পের নায়ক শ্যামল সন্ত্রাসবাদ-ফেরৎ সক্রিয় সাম্যবাদী হ'য়ে নায়িকা চিত্রার কাছে এসে শেষে, subjective realityর আশ্রয় চাইবে কেন। 'পার্টির কাজে' 'হয়ত objective realityতে আমি ধাক্কা খেয়েছি।—তাই।' কেন্দ্রশক্তিচ্যুত ভারসাম্যহীন মানুষকে এম্নি কেবল ঘুরতে ফিরতে হয় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, বিকৃত হ'য়ে ; সোজা কোন লক্ষ্যভেদী পথ নেই।

পথ ছিল না সেদিন ভারতবর্ষে, বাংলায়, কলকাতায়। ১৯৪৭ পর্যন্ত একটানা এই ইতিহাস—রামেশ্বর-রসিদ আলি ডে, শোচনীয় দাঙ্গা, আরো শোচনীয় স্বাধীনতা পর্যন্ত। মানুষ বিশেষত যুবশক্তি কেবলই বিকিয়ে গেছে, বিকৃত হয়েছে, একদম দেউলে হয়ে ফিরেছে পথে পথে। কল্লোল শোনা গেছে রাজপথে—মিছিলে, শোভাযাত্রায়। কিন্তু 'দিনান্তে'র পর 'রাত্রি' কাটেনি। 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?' কণ্ঠে কণ্ঠে প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিধ্বনিত হয়েছে আবদ্ধ দেয়ালে, প্রশ্নকর্তাকে আঘাত করেছে, তার বেশি কিছু হয়নি!

নরনারী একে অপরের কাছে কনফেশন পেশ করে কালস্রোতে ভেসে প'ড়ে

কর্তব্য শেষ করেছে। এদিক থেকে 'কস্মৈদেবায়'র শেষভাগ যথাসাঙ্কেতিক!—
"'No man can save the earth from tillage. It is tillage, not salvation.' চাষ ক'রে উল্টে পাল্টে দেওয়া—নিজের বাগান চাষ করবেন ব'লে ভল্টেয়ার যে-সান্ত্বনা পেয়েছিলেন তা নয়—এ-চাষে সবাই মিলে নূতন হয়ে ওঠা চাই আবার—মাটি, বলদ, চাষী সবাই। এরই আরেক নাম হয়ত মার্ক্‌সবাদ—জীবনকে এভাবে দেখাবারই হয়ত নূতন একটা দৃষ্টিভঙ্গী। নিজের তৈরী আচার অনুষ্ঠান তার আদর্শের শৃঙ্খল যখন মানুষের জীবনকে জড়িয়ে ধ'রে তার শ্বাসরোধ করতে চায়, তখনই আবার মানুষ হয়ে উঠবার তাগিদে য়ুরোপে আসে রেনেশাঁস—ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগ—চণ্ডীদাস বাংলাদেশ থেকে বলে ওঠে··· মানুষ হবার জন্যেই মানুষ বিপ্লব চায়—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাতেই জ্বলে ওঠে ফরাসী বিপ্লব। মানুষ সেখানে মানুষের দাম দিত না বলেই ফরাসী-বিপ্লবের নূতন ফসলও একদিন আবার পুরোনো হয়ে গেল, তা দিয়ে আর তৈরী হল না মানুষ—তাই এলো রাশিয়ার অক্টোবরের দিনগুলো—এবার নূতন আবাদ রাশিয়ায়, য়ুরোপ-এশিয়া জুড়ে অসংখ্য জাতিধর্মকে নিয়ে হল নূতন ফসলের আবাদ।

পৃথিবীকে এই নূতন ফসল দেবে যারা, তাদের কেউ যদি জন্ম নিয়ে থাকে ভারতবর্ষে—তার চেয়ে বেশি আর আমাদের যুগ কী চাইতে পারে? সমাপ্ত না-ই বা হ'ল তাদের কাজ, তাদের জীবন ত পূর্ণ আছে সে-কাজে! সে-কামনাতে তো জ্বলছে তারা—পুড়ে যদি ছাই ই হয়ে যায় তাদের জীবন, সে-ছাই জমে থাকবে নূতন ফসলই তৈরী করে তুলবার জন্যে।···" দুর্মর আশা ও আদর্শবাদী এই চিন্তা, অসমাপ্ত ইতিহাসের সমুদ্রপথে 'ক্লান্ত—ক্লান্ত—ক্লান্তিহীন' নাবিকের ক্রমাগত অগ্নিদীক্ষা, কাল'চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন'।

তথাপি এবং তাই 'সভ্যতার সংকট'-দীর্ণ রাবীন্দ্রিক আশাবাদে ভর ক'রে 'মানুষ' হ'য়ে ওঠার ক্রান্তিকালীন কাহিনীতে উত্তীর্ণ হ'তে চাইলেন এবার সঞ্জয়বাবু। 'মনোবাদী' নাট্যকার ভবভূতির মতো ফিরে গেলেন নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর ইতিবৃত্তে। 'বৃত্তধর্মী' ব্যর্থ মানুষের নয়, স্ব-স্বকালীন সংগ্রাম-শ্রান্ত মানুষের বিষণ্ণতাকে খুঁজতে চাইলেন অতীতে, স্মৃতিচারণে, আত্মজীবনীতে, সর্বস্তরের ব্যাপক বিস্তারে। রচিত হয়ে উঠতে লাগল ট্যাসিটাস-বের্গসঁ-ভাবিত 'মৌচাক', ঈষৎ-জয়সিয়ান যৎসামান্য-এক্‌জিসটেন্‌সিয়াল 'সৃষ্টি', প্রুস্তিয়ান 'প্রবেশ প্রস্থান'। এবং 'মুখোশ'—নীটশের 'মাস্‌ক্‌'-মুখোশধারী 'will to power'-এর নৈরাজ্য, নৈরাশ্য, নব-আশা। সর্বোপরি তাঁর নিজস্ব পরাক্রম-পরিবর্তিত পরিণতির সৃষ্টি-নবসৃষ্টি-ভারাতুর ভবিতব্য: 'resignation' নয়—যুগপৎ 'despair' ও 'desire'-এর

পৃথ্বীমথিত আকাশচুম্বন, নক্ষত্রের ক্ষয়-জয়যাত্রা। 'নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়'... 'নূতনেরা আসিতেছে ব'লে'...'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়'।'

"পৃথিবীর মতো বস্তুটাকে যেহেতু আমলকি করা মুশকিল, আমার হাত যে-কাজে চেষ্টিত সে কাজেই বরাবর দৃষ্টি আমার।"

"আকাশ অনেক বড়ো, পৃথিবীর পর্যাপ্ত পরিধি।"

—গদ্যে ও পদ্যবন্ধে একই সঞ্জয় ভট্টাচার্য। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-বাহিত মানুষের ইতিহাস-রচনাই তাঁর কাজ। 'সে-কাজেই বরাবর দৃষ্টি' চালিয়ে অতঃপর যা তৈরি হ'তে চাইল তা 'পর্যাপ্ত পরিধি'র পৃথিবীব কথা—কয়েক প্রজন্ম মানুষের যন্ত্রণাহর্ষঘন মৃত্যু-জন্মযাত্রী কাহিনী, অন্তরঙ্গ 'চেতনার পরিমাপ'মতো, অনেকটা জীবনানন্দের এই ইতিহাস-ভাবনায়: 'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব/থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে/আজকের আগে যেই জীবনের ভিড় জমেছিলো/তারা ম'রে গেছে; /প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে/অন্ধকারে হারায়েছে; /তবু তারা আজকের আলোর ভিতরে/সঞ্চারিত হ'য়ে উঠে আজকের মানুষের সুরে/যখন প্রেমের কথা বলে/অথবা জ্ঞানের কথা—/অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে-সময়/দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের; /চলেছে—চলেছে—'।

এই প্রসঙ্গে তুলে আনছি সঞ্জয়বাবুর বিশ্বাস: "ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস ব'লে-ছিলেন, পনের বছর পর-পর মানুষের জীবনে এক-একটি গুরুতর পরিবর্তন আসে। জ্যোতিষীরা বলবেন: তা শনির প্রেম। ...ফ্যাসিস্টস্পেনত্যাগী মনস্বী গ্যাসেট বলেন: 'The face of the world changes every fifteen years"; এবং আমরা আরো মেলাতে চাই বের্গসঁকে, তাঁর বিবর্তিত, বিবর্তমান কালতত্ত্ব-চিন্তায়: 'What are we, in fact, what is our *character*, if not the condensation of the history that we have lived from our birth—nay, even before our birth, since we bring with us prenatal dispositions? Doubtless we think with only small part of our past, but it is with our entire past, including the original bent of our soul, that we desire, will and act. Our past, then, as a whole, is made manifest to us in its impulse; it is felt in the form of tendency, although a small part of it only is known in the form of idea.

From this survival of the past it follows that consciousness cannot go through the same state twice. The circumstances may still be the same, but they will act no longer on the same person, since they find him at a new moment of his history. Our personality, which is being built up each instant with its accumulated experience, changes without ceasing. By changing, it prevents any state, although superficially identical with another, from ever repeating it in its very depth. That is why our duration is irreversible. We could not live over again a single moment, for we should have to begin by effacing the memory of all that had followed. Even could we erase this from our intellect, we could not from our will.

Thus our personality shoots, grows and ripens without ceasing. Each of its moments is something new added to what was before. We may go further : *it is not only something new, but something unforeseeable*…' এই অনিশ্চিত অনির্ণেয় ব্যক্তিত্বের চরিত্রায়ণ, মানুষের দ্বিজত্ব-বহুজত্বময় জঙ্গম জগৎসংসার তথা ব্যক্তি-সামাজিক সভ্যতার নিগূঢ় মৌলিক অভিপ্রায়, মৌলিক পরিচয়—সঞ্জয়বাবু 'মৌচাক' থেকে 'প্রবেশপ্রস্থান' পর্যন্ত সেই গভীরার্থতেই নিবিষ্ট হয়েছেন দেখতে পাই—প্রথম গ্রন্থে তুলে এনেছেন De Toqueville-এর সদুক্তিসারকে : "Each generation is a new people"—১৯১২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত বারো বছর (পূর্বকথিত ১৫ নয়, আমাদের 'যুগ'চিহ্নস্বরূপ বারোই গৃহীত হয়েছে) অন্তর-অন্তর একটি পরিবারের অন্তর্গত বিনাশ-বিকাশ-বিধৃত একেকটি যুগ ও যুগাবসান এবং যুগান্তর। সমস্ত মিলিয়ে ব্যক্তি ও সময়ের তথা 'মানবে'র যন্ত্রণা-কণ্টকিত আশাতীত আশান্বিত হাত-ধরাধরি যাত্রা, রূপ-রূপান্তর, কাল-কালান্তর পেরিয়ে। একটি সুচিন্তিত সুবিন্যস্ত ছক-গড়া ছক-ভাঙা এই সুনিহিত-পরিবর্তিত, সংবর্তিত, সৃষ্ট ও উৎসৃষ্ট 'কালের যাত্রা'—বলয়িত-কুলায়-কালপুরুষ-অঙ্গী মা ও বাবা তথা বিরজা ও মোহিনী, যথাক্রমে ১৯১২ ও ১৯২৪। তজ্জাতকেরা যথাক্রমে বড় শিশির ১৯৩৬ এবং ছোট মিহির ১৯৪৮। উপন্যাসটির রচনা-প্রকাশকালও ১৯৪৮। যুগপৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা-চিহ্নিত এক বিশিষ্ট বর্ষাঙ্ক।

১৯১২। আধাশহুরে গৃহ। মা-বাবা। মা বিরজা সদাসতর্ক, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে বিচক্ষণ, অনুচ্ছল, উজ্জ্বল একটি চরিত্র। তিন ছেলে হাবুল, তিতু ও মিতুকে নিয়ে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। বাবা মোহিনী তার অনিচ্ছুক দারোগাগিরি তথা সরকারি কাজেকর্মে নির্লিপ্ত ভাবে ন্যস্ত, ব্যস্ত—সংসারে গভীরভাবে আসক্ত নন, আবার বিরক্তও নন। নেপথ্যভূমিকা। বিরজার বোনপো যতীন স্নেহাশ্রিত, ছেলেদের কলেজীপড়া অগ্রজ, তাই অনেকখানি সম্ভাব্য দৃষ্টান্তস্থল। যতীন গতানুগতিক নয়, নিয়মিত নয়, 'স্বদেশী'ভাবে ভাবুক: কিন্তু মাসিমার অবাধ্যও নয়। বিরজা তাকে বলেন, 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। স্বামীকে নিয়েও আছে—'স্বদেশী ডাকাত'দের শাস্তি-শায়েস্তার দায়িত্ব তাঁর অনেকটা। এর মধ্যেই বড় হচ্ছে ছেলেরা। হাবুলকে নিয়ে ভয় নেই, সে অসাধারণ নয়, তাই বাধ্য। তিতু সবচেয়ে ধীমান, সবচেয়ে বেপরোয়া। তাকে নিয়ে ভয়—এমন কি কুশঙ্কা—সে বাঁচতে আসেনি, সে বাঁচবে না, এবং তার আগে একটা কলঙ্ক-কেলেঙ্কারি করে ছাড়বে। একটা ঘটনা ঘটলও। পাড়ার মেয়ে নিরুকে নিয়ে। সে তাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল, ধরা পড়ে গেছে। তারপর প্রত্যাবর্তন, মিটমাট। কিন্তু ভালো ছেলে হয়ে ঘরে-থাকা নয়। কলকাতায় প্রস্থান, ভাগ্যান্বেষণ, অকালমৃত্যু, প্রতিভার অপমৃত্যু। ইতিমধ্যে হাবুলের বিবাহ। যতীনের রাজদণ্ড। মোহিনীর মৃত্যু। তিতুর পিঠোপিঠি যে-মিতু, বাল্য-কৈশোরের একত্রসঙ্গী, এখন সে একা—সে মিহির—রাজনীতি সাংবাদিকতা ইত্যাদিতে কলকাতা-দিল্লী-পারাপার করছে। মোহিনীর একটা অনিয়ন্ত্রিত অতীত ছিল—তাঁকে বিরজাই বশে এনেছিলেন, আত্মদানে, আত্মজদানে, সাংসারিক সেবায়, মাধুর্যে—সর্বতোভাবে। মোহিনী যখন বিগত হলেন, দেখা গেল, বিরজা সর্বহারা। জ্যেষ্ঠ শিশির সংসারের কর্তা, স্ত্রী তার উপযুক্ত হয়নি—আধাশহরটায় দাঁড়িয়ে ও ব'সে সে আইনচর্চা আব থিয়োসফি করে, নিতান্তই সাধারণ হয়ে গেছে, অথচ বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যে সে একেবারে সামান্য ছিল না। মায়ের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল—কিন্তু স্ত্রীর প্রতি শান্তিভঙ্গের ভয়ে, আপোষমূলক অশ্রদ্ধ মনোভাবে সে সরিয়ে নিচ্ছে নিজেকে, ক্রমেই আস্থাহীন অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে, নির্বিকার, নির্বিবাদ। বিস্ফোরণ হলো একবার—যতীনদা রাজদণ্ড ভোগ ক'রে ফিরে মাসিমার কষ্টে যখন দোষী সাব্যস্ত করল হাবুল অর্থাৎ শিশিরকে। দেশে—গ্রামে (যেখানে বিরজা একসময় যেতেই চাইতেন না, মুখ ফিরিয়েছিলেন ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে, তাদের মানুষ করতে হবে, মানুষ দেখতে হবে ব'লে) চ'লে গেলেন বিরজা তার সঙ্গে অনায়াস নিঃশব্দে. দিনরাতের সঙ্গী নাতনীকেও, অশ্রুমুখী, লক্ষ্য

করলেন না—। মাত্র তখন সেই বিস্ফোরণ—তাও বাইরে স্বল্প, অনেকটাই ভিতরে। ভয়ানক অন্তর্মুখী হয়ে গেছে শিশির, অনর্থক হয়ে গেছে, প্রায় বোবা, নিষ্ফল। ১৯৩৬ পর্যন্ত পেরিয়ে এসেছে কাহিনী এভাবেই। প্রথম বারো বছর প্রধানত—মা, মা-বাবা, ছেলেরা। দ্বিতীয় যুগ প্রধানত বাবা-মা, ছেলেরা। তৃতীয় যুগ: শিশিরের ছিন্ন সংসার। মাঝে মাঝে মা-বাবার নেপথ্য দুঃখের আর্ত আত্মকাহিনী ঘটনাক্রমে, কাহিনীর মধ্যে কাহিনী ক'রে বিশেষতঃ মোহিনীর ক্ষেত্রে, সিনেমার মন্তাজ-এর মতো বলা। তারপর ১৯৪৮। মিহির। কলকাতা-দিল্লী ক'রে সেই আধাশহরে ফিরছে, সঙ্গে শম্পা, প্রণয়িনী, সম্ভাব্য স্ত্রী। দেশ বিভক্ত। দেশবাসী ছন্নছাড়া। মা মৃতা: বৌদি বেঁচে নেই। একটি মেয়ে—এখন রীতিমতো বড়ো হয়েছে—তাকে নিয়ে শিশিরের হতশ্রী সংসারের ভগ্নাবশেষ। সেখানে মিহিরের আজ এহেন পদার্পণ। আবার আলো জ্ব'লে উঠতে চায়, জ্বলে না। দাদার মুখে ভাইঝির চোখে আনন্দ ফুটতে চায়, আশা জুটতে চায়—আধখানা হ'য়ে ঠেকে যায়, ভেঙে যায়। নবজীবনের বার্তা নবযুগের প্রতিশ্রুতি আনে মিহির আর শম্পা, শোনায় নবযুগের নবীন-নবীনা তারা—বহির্বিশ্বের অনেক আহৃত আলোক তাদের সুঅভিজ্ঞ সঙ্গে, প্রসঙ্গে, প্রণয়ে-পরিণয়ে; কিন্তু স্বপ্ন দেখে মিহির—মাকে। স্মৃতি হ'য়ে বাজতে থাকে বাবা, তিতু, সবাই। মশারির মধ্যে তাদের নবযুগোচিত অপরিণীত-মিলিত শয্যায় মাতৃমূর্তির আশ্চর্য অবতরণ, অবলোকন—যেন পুতুলের সংসার পাতছে তারা, সে আর শম্পা। এম্নি আশা ও আশাহীনতায় স্বপ্নে ও স্মৃতিতে ১৯৪৮-এর যবনিকা কাঁপতে থাকে। বস্তুত যা অন্তঃক্ষরণে কাঁদতে থাকে—**Vanity···Vanity···beyond redemption···**যেন মাকে নিয়ে, বাবাকে নিয়ে, তিতুকে নিয়ে, দাদাকে নিয়ে, যতীনদাকে নিয়ে, এমনকি বৌদিকে নিয়েও অস্পষ্ট প্রচ্ছন্নভাবে বুঝি এই মনোলগ বাজতে থাকে—১৯১২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সবকিছু, সবার প্রতি: স্বকালের সকলের জন্যই এই আর্ত আর্দ্র স্বগতোক্তি যেন বাজতে থাকে, বাজতে থাকে '**···how old was I when I first came here ? ·· six···with my father···father···how dim his face has grown ! ...he wanted to speak to me just before he died . the hospital smell of iodoform in the cool hall···hot summer...I bent down .. his voice far away···I couldn't understand him··· what son can ever understand ?...always too near, too soon, too distant or too late.' (Strange Interlude, O'Neill)**

স্মৃতিস্বপ্ন, কিন্তু সত্য, যেহেতু জাগ্রত 'স্বপ্ন', অভিজ্ঞ অনুভব, উপলব্ধি—মা-বাবা

ছিলেন, এসেছিলেন : 'মশারিটা সত্যি দুলছে। ভোর হল।' এ-ভোর প্রতীকী ভোর। কারণ 'মিহিরের মনে হ'ল গভীর নিশ্বাসে ঘরের সবটুকু অন্ধকারই বুঝি টেনে নিয়েছে টুলু (শম্পার ডাকনাম)—সব ছায়া—অন্ধকারের রেখাগুলো।' তাই বলা যায়, এই দুলে-ওঠা অন্ধকার যবনিকা আলোকিত ক'রে দিচ্ছে দুটি সদ্যমিলিত সদ্যমুক্ত নরনারী। আজ তারা কেবল মননেই পরিপক্ক নয়, শারীরিক ঘনস্পর্শে ও স্পন্দনেও পরম অভিজ্ঞ মুহূর্তে উপনীত। 'সমস্ত শরীরের স্পন্দনে এ-কথাই উচ্চারিত হচ্ছে মিহিরের—শম্পার। আমি থাকছি—চিরদিনের জন্যে থেকে যাচ্ছি—শম্পার মনে, শম্পার দেহে, চিরকাল মানুষের স্রোতে। মিহির এবার স্পষ্ট তার নিজের গলা শুনতে পেল—অবিকল মিহিরের সেই গলা যাকে অনেকদিন বলতে শুনেছে সে : আমি মুক্ত, আমি মুক্ত।' এই দেহমনোমুক্তিই ভোর। এই সব-কিছুকে স্বীকার, সবাইকে স্বীকার, এই সর্বাস্তিবাদই মুক্তি—সুদূর অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত 'চিরকাল মানুষের স্রোতে' এই বর্তমানের অবগাহন, আবাহন, নিত্যনতুন, নিছক নিত্যবৃত্ত নয়, নিত্যপবিত্র—এই সর্বময় অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা, তার প্রতিষ্ঠা—জীবনের সর্বস্ব। 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়'; তাই 'ভোরের কল্লোল'; 'Ripeness is all'।

মিহিরের এই সমস্ত অভিজ্ঞতা আহরণ, স্বীকরণের আগ্রহভূমি থেকেই 'সৃষ্টি'র দীপায়ন যাত্রা করেছে। অঙ্গীকার, সর্বাঙ্গীণ অঙ্গীকার। তার জীবনের পটভূমি আরো জটিল, আরো প্রতিকূল তার যাত্রা-পথ—আরো কঠিন তার শপথ, যন্ত্রণাও তাই তীব্রতর, তীক্ষ্ণতর। সে বৃহত্তরভাবে স্রষ্টা। এবং সৃষ্টির পথ বহুবিচিত্র ছলনাজালে যে আকীর্ণ, বিশশতকী দ্বিতীয়ার্ধের পাদদেশে পৌঁছে মহা-আস্তিক্যপূর্ণ রবীন্দ্রনাথও তা জেনেছেন, বলেছেন। আর এ-শতকের আদি-মধ্য-অন্ত্য বা উপান্ত যাদের শরীরে মনে পরিব্যাপ্ত তারা তা আরো প্রত্যক্ষবৎ জানবে, সম্যকভাবে বুঝবে, তা-ই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তবু দীপায়নের পানু থেকে দীপায়ন চৌধুরী হওয়ার প্রথম বঙ্গজ ইতিহাস, বহু বিরোধ ও অসঙ্গতির বিভঙ্গে আশ্চর্যজনক। প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকের সুবিবেচনায় : 'গুটিপোকা কী করে প্রজাপতি হল, সেই রহস্যই এই উপন্যাসের উপজীব্য'।[৩] 'মৌচাকে' মিতুর মিহির হওয়ার চেয়েও যে তা আরো রহস্যময়, নিঃসন্দেহ। ১৯৪৮-এ 'মৌচাক'-রচনার অভিজ্ঞতা তাই 'সৃষ্টি' ও 'স্রষ্টা' উভয়ের পক্ষেই খুব গুরুত্বপূর্ণ, আগেই বলেছি। উপস্থিত দীপায়নের বন্ধু লেখক অনিরুদ্ধের সাক্ষ্যে দীপায়ন-রহস্যে যথার্থ দৃষ্টিপাত করি : 'তোর মন শিকড়ের মতো টেনে নেবেই নিজেকে তৈরী করবার উপাদান। শুধু বাবা-মাই আমাদের তৈরী করেন না, আমাদের চেনা প্রত্যেকটি মানুষ দিনের পর দিন আমাদের তৈরী

করে তুলছে।' কেবল দিনের পর দিন নয়, প্রতি মুহূর্তে। ইয়েটস্-এর মতো 'we are blest by everything'। এবং বের্গসঁর মতে: 'Each of its moments is something new added to what was before' এবং জয়সম্মলভ 'to render as exhaustively, as precisely as it is possible in words to do, what participation in life is like—or rather, what it seems to us like as from moment to moment we live.' পান্থকে পৃথিবীতে আনলেন তার বাবা-মা এক বিশেষ পারিবারিক প্রতিবেশে। তার ধমনীতে কাজ করতে লাগল একটি বিশিষ্ট রক্তধারা। কিছুদিন পর্যন্ত তার চোখের সামনে তবু তার 'স্বদেশী' দাদা ছাড়া আর কেউ রইলেন না। তারপর সহপাঠীর দল। অনিরুদ্ধ, মানিক, আলি, প্রতুল, সুরজিৎ, অতীনেরা। সেই সঙ্গে এল শেফালি, তারপর বীণাদি, তারও পরে ময়না, তোতা, প্রমিতা, সবিতা এবং সুপর্ণা। এবং এল সাম্যবাদী বাসব, কাঞ্চন, সবাই। 'halo of consciousness'।

নরনারীর এই বিচিত্র শোভাযাত্রার পারে বয়ে চলেছে ঘটনা, রক্তপ্রবাহ—সমতালে, কখনো হিংস্রতায় পিঙ্গল, কখনো স্নিগ্ধতায় নীল, কখনো নৈরাশ্যে ধূসর। আর পান্থ চলেছে দীপায়ন হ'তে এইসব নিয়ে, এইসবকে ছাড়িয়ে। সে একা, অথচ একা নয়। যারা পান্থ নয়, যারা অন্য, তাদের অন্যতাই তাকে টানছে আর ছেড়ে দিচ্ছে। যুগপৎ অন্যতা এবং অনন্যতা, to be and to let be। এর মধ্যে দিয়ে 'তৈরি হচ্ছে কোনো শপথ, কোনো দুর্গম পথ, তৈরি হচ্ছে দীপায়ন, নিজের রক্তমাংস ছিঁড়েখুঁড়ে আবার সাজিয়ে তুলছে একটি মানুষের চেহারায়, —যার সুখদুঃখ হাসিকান্না আরেকরকম, যাকে চেনা যায় না আগেকার মনের পরিচয়ে, তেমনি একটি মানুষ তৈরি হচ্ছিল দীপায়নের বিষণ্ণতায়।' অর্থাৎ একটি 'মানুষ-হয়ে-ওঠা'র বিষণ্ণতাই এই রহস্য। তাই ওকে সাধারণ বলা যায় না। ও ঠিক কাউকে 'নিতে' পারে না—নাকি 'দিতে' পারে না? দেহ ওকে বিকর্ষণ করে। সুপর্ণাকে ওর প্রশ্ন: 'তুমি কেন এলে পানি? দু'হাতে আমি নিজেকে জড়িয়ে আছি—আজ যেমন নিয়ে আছি শৈশব, কৈশোর, যৌবনকে, তেমনি শিশু পান্থ তার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বকে। আমাকেই চেয়েছি আমি, হয়তো আমাকেই পাব। তুমি আরেকটি আমাকেই আমার হাতে তুলে দিয়ে যাবে জানি—তুমি তা জানো না পানি। শেফালি জানত না, বীণাদি জানত না, তোতা জানত না। হয়তো ময়না জানত। তাই সে আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল এমন একটি আমাকে, যাকে দেখলে আমি শিউরে উঠি।

কিন্তু তোমরা তা পারো না—আমাকে সাজিয়ে দাও, সুরভিত উজ্জ্বল ক'রে দাও তোমরা। তোমরা আকাশ হারাও, আমি তোমাদের আকাশ পাই।'

এবং নিজেকেও পায়, নিজেকেই পায়। সে জানে, "অন্যের ভেতর দিয়ে নিজেকে খুব ভালো করে চেনা যায়, যেমনি নিজের ভেতর দিয়ে অন্যকে।" ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুঁথিপড়া ব্যবহারিক গৌরবকীর্তন অনেক হয়েছে, সমস্তটাই উপর-উপর, তার ভিতরের কথাটা কী, সারাৎসার কোথায়—সে কি দায়-দায়িত্বহীন আত্মরতি মাত্র, স্বার্থসন্তোষ? একেই চ্যালেঞ্জ করেছে দীপায়ন। অর্থাৎ মিহিরের সেই essential morality বা 'সহিষ্ণুতা'কেই দীপায়ন 'relative' ও 'reciprocal' অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত করে চলেছে, বিকিরিত করছে, হ'তে দিচ্ছে। সম্যক জ্ঞান ও সম্যক প্রেম—জীবনানন্দও যাকে জানতেন, বুঝতেন, 'মানুষের মৃত্যু হলে' কবিতায় এবং অন্যত্র তা দেখেছি—দীপায়ন নিজ-জীবনে ফিরে ফিরে চিরে-চিরে তা আবিষ্কার করেছে। সে তাই প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারে, তার অন্তঃসার লাভ ক'রে, আত্মশক্তির প্রত্যয়ে: 'আমি স্রষ্টা। আমার চরিত্র নিজেই জরাসন্ধের মতো চিরে দেখাতে পারি—দেখিয়েছি কত—কিন্তু যারা বাংলাদেশকে চেনো না, তারা কি শত দেখালেও দীপায়ন চৌধুরীকে দেখতে পাবে?' অর্থাৎ একসঙ্গে একটি গোটা মানুষের মানে আর একটি জাতির, দেশের যথার্থ সত্য, রূপে রূপে, রূপান্তরে, স্বরূপত দেখা ও দেখানোর দায়িত্বপালন—তথাকথিত কর্ম তত্ত্ব ভাব আদর্শ ইত্যাদি ভেঙে ভেঙে তাদের অন্তর্গত মানুষের নিশ্চয়তাবোধকেই চূর্ণিত করা, তাদের আত্মবঞ্চনা ও পরস্পর-ছলনাকে খুলে খুলে দেখানো—যেন জয়সের মতই দীপায়ন এবং তাঁর স্রষ্টা সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলতে চান, পারেন: **'I have broken through these assumptions and pretences and shown you how he must recognise himself to-day'—'to supply him with the subject, which will enable him to enter imaginatively—as an artist—into the common life of his race'** এবং তার সর্বাস্তিবাদী অংশগ্রহণে **'to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race.'**

এবং এমনি একটি সর্বাঙ্গীণ চারিত্রশক্তি ও মনুষ্যত্ব হ'য়ে বিকশিত হওয়া যে-দীপায়নের ভবিতব্য, তার সঙ্গে 'বাংলাদেশ' ওতপ্রোত জড়িত—কুমিল্লা এবং কলকাতা-পারাপার সমগ্র একটি জাতীয় জীবনযাত্রা। এবং সে চলেছে "শেষ রাত্রির নদীর মতো" স্পষ্ট-অস্পষ্ট একটি রহস্যময় ব্যক্তিত্বে। হোয়াইটওয়ে লেডলর দর্পণে-পড়া তার নাগরী অবয়বেও তার জঙ্গম জীবনীশক্তি, তার নিগূঢ় আত্মবল,

প্রত্যয় এবং ধীরোচিত বীরত্ব ফুটে উঠেছে, তার সমস্ত শ্রান্তি ও বিষণ্ণতা ছাপিয়ে—**'Pride like that of the morn,/when the headlong light is loose /·· may be as cold / And passionate as the dawn.'** কারণ **'Myself must I remake···'**ভারতীয় ভাগ্যের মতোই পতন-অভ্যুদয়ে-জড়ানো আরেক আইরিশ, কবি ইয়েটস্ যেমন বলেছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন। 'মানব-প্রেমে' আ'বৃত্ত'-'মৌচাক' তাঁর সমস্ত আগুন নিয়ে খেলা পুতুল নিয়ে খেলা-দেখা চোখ শানিয়ে উঠে এই দুর্গম ও অত্যাবশ্যক মনুষ্যসত্যকে অমোঘ লক্ষ্য করেছিল—দীপায়ন এবং 'সৃষ্টি' উপন্যাস তাই বাংলাসাহিত্যে একটি অভিনব 'মানুষ'-সৃষ্টিশীল সাহসী নিরীক্ষা। 'সৃষ্টি'র নায়ক খাঁটি বাঙালী, তাই খানিকটা গ্রামীন। নায়কের জীবনদর্শন অস্তিত্ববাদ নয়, তা একধরনের ভারতীয় সর্বাস্তিবাদ হতে পারে। 'সৃষ্টি' ১৯৫১ থেকে ধারাবাহিকভাবে 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত হতে থাকে। "বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমি লক্ষ্য করেছিলাম পৃথিবী নামক বকযন্ত্রটির ভেতরে বিস্তর তলানি পড়েছে—সেখানে আলোড়ন শুরু—পরিস্রুতির দিন অতীত হয়েছে। এম্নি ক্রান্তিতে বা ক্রাইসিসে অনিবার্যভাবে যে অতীতস্মরণ জরুরি হয়ে পড়ে, তা 'সৃষ্টি' উপন্যাসে ছিল।" (স. ভ.)

ক্রান্তিকাল কাটেনি। ক্রাইসিস অব্যাহত। 'বিস্তর তলানিযুক্ত' এই 'বকযন্ত্র'ঘটিত যন্ত্রণার শ্রীবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধিহারে ঘটেই চলেছে। সঞ্জয়বাবুর স্মরণীয়তম উপন্যাস 'প্রবেশ প্রস্থানে'র অবস্থানভূমি সেখানে, সেই আবর্জনাকুণ্ডে, সেই পঙ্কে। যেখান থেকে তাঁকে মন-প্রাণ, চোখ সব ফেরাতে হয়েছিল সুদূর অতীতে, 'পদ্মপাণি' কুমিল্লায়, শৈশব-কৈশোরের অমল শুভ্রতায়, তারুণ্যের শৌর্যে, যদিও মনে সংশয় ছিল: 'রক্তে রাঙা হল ত শহরের ছেলে-মেয়ের হাত। পদ্মপাণি, সে-হাতে কি ফিরে আসবে না কমলাঙ্কের পদ্মদীঘির পদ্মগন্ধ?'—'প্রবেশ প্রস্থানে'র ১০৯ পৃষ্ঠার এই তাৎক্ষণিক প্রশ্নই চিরন্তন প্রশ্ন—বৈপরীত্যের মেলাবসান খেলাবসান আছে, হয়? আমূল প্রশ্নকণ্টকিত অজস্র পথে, মতে, মনোভাবে, সংশয়ে; প্রত্যয়ে, প্রস্তাবে, স্বাদে, বিস্বাদে, সন্দিগ্ধতায়, বিষাদে, অবসাদে, আনন্দে, উদ্যোগে, উদ্যমে, উদারতায়, জন্মে মৃত্যুতে, জীবনের বিশালকায় এই লোকযাত্রা—'প্রবেশপ্রস্থান' একটা রূপক, একটা মহাকাব্য, আধুনিক কাল যা দিতে পারে। কুমিল্লা থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে কুমিল্লা। বিশ শতকের প্রদোষ থকে মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ন থেকে প্রত্যুষ। কখনো প্রুস্তিয়ান-আইজেনস্তাইনী মন্তাজ, কখনো জয়সের ক্যালেইডোস্কোপ: জীবনের এত বড়ো, এত জটিল, অথচ এত বিশদ ছবি। এই গ্রন্থিলতম শতাব্দীকে দেখা ও দেখানোর অভিজ্ঞতা যে সাবলীল ব্যক্তিত্ব, নমনীয়

পর্যবেক্ষণ ও ঋজু স্বভাবের দাবি করে, এক কথায় যে ট্রোগ্‌ল্‌ ও হ্যাকরিফাইসের ইতিবৃত্ত, তদ্ভব চারিত্র—সঞ্জয়বাবু ছিলেন তাই। দুই বাংলা ও দুই নগরের নাগরিক, দুই জগতের জাতক, দ্বিজত্ব তাঁর সত্যসত্যই ঘটেছিল, জানতেন, দ্বীপায়ন যেমন জানত,—তাই প্রীতি, প্রীততা, প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি-পালনের ইচ্ছা, বহনের ক্ষমতা—উপযুক্ততম, বিশুদ্ধতায় 'refreshing river' 'Time'-এর মতো, তিনি আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, রক্ষা করেছেন। 'Time's tool' না-হ'য়ে 'Time's tide'[৪] হওয়ার গুণে ও গৌরবে।

'প্রবেশ প্রস্থানে'র ৫১১ পৃষ্ঠা থেকে: 'আত্মানং বিদ্ধি। মানুষের পক্ষে এর চাইতে বড়ো মন্ত্র আর কিছুই হতে পারে না। অভির একটি করুণ চিঠি···তাকে একথাটাই লিখেছিলাম মনে পড়ে। ও নাকি কালো কলকাতার অভিশাপে কালো হয়ে যাচ্ছে। অভিশাপ পরিপার্শ্ব কিছুই কি কাউকে কালো বানাতে পারত, যদি নিজের ভেতরই কালোর সাম্রাজ্য না থাকত? সুভাষচন্দ্রের মতো এত বড়ো আত্মত্যাগী পুরুষের সঙ্গ লাভ করেও কি মৃণালের কাকা চিনির কালোবাজারে যাচ্ছেন না? নিজেকে জানতে পারলেই পাপের জন্যে পরকে দুষতে হয় না। হয়তে মার্ক্‌স্‌বাদীরা ভাববেন ঐ মন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজ নিহিত। উনিশ শতকীয় এই সমাজপরতন্ত্রতা থেকে আমরা মুক্ত হব? বা এ-শতকের মানবতাবাদের ভাবালুতা থেকে? নিজেকে মানুষ হিসেবে যতদিন তুমি না জানছ, দ্বিতীয় মানুষটিকে কীভাবে তুমি জানবে। পরকে জানবার প্রথম শর্তই ত আত্মানুশীলন! তা করতে হলে জর্নাল রাখা খুবই জরুরি। এ ফরাসী অভ্যাস আমার ছিল না। প্রসাদের পরামর্শেই তা হচ্ছে। অনাবৃত মনকেই দাবি করে জর্নাল। মন ছাড়া মানুষ কী? দৈহিক কার্যের বোঝা? ফাঙশানের সমষ্টি?···বকুলের কাছে আমি ঋণী—আমার অনেক মার্ক্‌সীয় চিন্তার ভিত্তিতে ও ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। ও যুক্তি দিয়েছিল: সব দেশ যদি সমাজতান্ত্রিক হয় তাহলে সমাজতন্ত্রে কি বিরোধ হবে না সুদত্ত, আজ যেমন ধনতন্ত্রে হচ্ছে? ভাববার কথা—যখন মার্ক্‌স্‌বাদ বলতে একটা অভ্রান্ত অচলপ্রতিষ্ঠ মত নয়।' এবং তাই সচল, উপস্থিত ও উপনীত জীবনের জঙ্গম লোকযাত্রায় দেহমনপ্রাণ-সমর্পণ তাঁর আত্মকৃত্যের অনুষ্ঠান। কারণ কিছুই শেষ নয়, কিছুই অশেষ নয়। 'ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে'।

> What we call the beginning is often the end
> And to make an end is to make a beginning,
> The end is where we start from···

Every phrase and every sentence is an end to a beginning,
Every poem an epitaph. And any action
Is a step to the block, to the fire down the sea's throat
Or to an illigible stone : and that is where we start.
We die with the dying :
See, they depart, and we go with them.
We are born with the dead :
See, they return, and bring us with them···

We shall not cease from exploration
And the the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time...
At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall...
Not known, because not looked for
But heard, half-heard, in the stillness
Between two waves of the sea.

Quick now, here, now, always—

... ...

And the fire and the rose are one.

কেবল কি ক্যাথলিক গীর্জায় আশ্রিত এলিঅটই এ-কথা বলেন—প্রুস্তও কি বলেন না—যিনি 'is perhaps the last great historian of the loves, the society, the intelligence, the diplomacy, the literature and the art of Heartbreak House of capitalist culture ; and the little man with the sad appealing voice, the metaphysician's mind, the Saracen's beak, the illfitting dressshirt and the great eyes that seem to see all about him like the many-faceted eyes of a fly, dominates the scene and plays host in the mansion where he is not long to be master'—সঞ্জয়বাবুর পক্ষে যা কিনা অনেকটাই প্রযোজ্য ; অথবা জয়সের শেষ সাকল্য : যা কেবল 'flux and reflux' নয়, 'reconciliation of opposites' এবং 'endless flux-eternal

becoming'—'We are to find in his dream all human possibilities—for out of human nature, all psychological plasm, which seems dark and deep beneath the surface of the meagre words, the limited acts, the special mask, of one man's actual daytime career, all history and myth have arisen—victim and conqueror, lover and beloved, childhood and old age—all the forms of human experience.'—সঞ্জয়বাবুরও যা অভীষ্ট এবং অন্বিষ্ট, নিশ্চিতই মনে হয়। 'প্রবেশ প্রস্থান' সেই বিপুল-মানুষী অভিজ্ঞতার বিরল বিচিত্র প্রবাহিনী।

'Show us History the operator, the organiser, Time the refreshing river'—অডেনের এই প্রার্থনা-প্রত্যাশা যেন সঞ্জয়বাবু এ-উপন্যাসের দিগন্তপ্রাবী পরিমণ্ডলে, অজস্র চিত্র-চরিত্রায়ণে, তাঁর সর্বাত্মক-বিশ্লেষণী-সংশ্লেষণী প্রতিভায় সম্পূর্ণ করেছেন। কেবল মননে-চিন্তনে-চরিত্রায়িত-চিত্রিত-চিন্তিতকরণে নয়, স্মরণে-অবিস্মরণেও নয়, একসঙ্গে রূপকল্প ও রূপকনির্মাণেও দুর্লভ সাফল্য দেখিয়েছেন—প্রধান দুই পাত্রের স্বগতভাষণে অসংখ্য দেশকালাগত পাত্রপাত্রীর আনাগোনায় একটি অর্ধশতাব্দী তার রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতির ইতিহাস-কম্পনে-ভূকম্পনে কালের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসে কালাঙ্কেই সমর্পিত হয়েছে। যেন **'History is Now and Bengal'**। এই বিশাল সংগ্রহশালাটি এক অদ্ভুতভাবে উজ্জীবিত, প্রাণবন্ত স্থাপত্যমন্দির। তাই কবি দীপায়ন চৌধুরী সম্পর্কিত 'সৃষ্টি' যেমন কাব্যসুরভিত-ভাষায়-ব্যঞ্জনায় প্রতীকধর্মে **Symbolism-Post-impressionism**-এর সিম্ফনিক দোসর—'প্রবেশপ্রস্থান' তেম্নি **'architectural'** শিল্পনিদর্শনরূপে মান, প্রুস্ত, জয়সের সহোদর। দূর থেকেও যেন সুরম্য এই হর্ম্যচূড়াটি নজরে আসে। তথাপি সঞ্জয়বাবু প্রুস্তের মতো কেবল **'privileged moments'**-এর **'past-recapturer'** নন, জয়সের অনুসারী **'epiphanies'**-সন্ধানী 'রীতিমতো' "প্রবাহী"ও নন, নিজস্ব নীতিরীতিগত ভাবে ও কারণে বিচক্ষণ উত্তরসূরি হিসেবে, বিশিষ্ট বাঙালী বলেও, তিনি আরো-কিছু। বাংলার প্রিয় সাংখ্যদর্শনে তার চিত্রকল্প আছে—সেই তরঙ্গিত জীবন, ঢেউভাঙার ছন্দ, সেই পুরুষ এবং প্রকৃতি।—

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে যথা নৃত্যাৎ
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতি॥"

এবং 'কর্কলাইন্‌ড্‌ রুমে'র প্রুস্তিয়ান স্বপ্নজাগরণে যে 'প্রবেশ প্রস্থান' সূচিত,

উপরোক্ত সাংখ্যশ্লোকে তার 'শেষ'—অনিঃশেষ এর তাৎপর্য। বাংলার জীবনবোধে, কথাসাহিত্যে, ভারতীয় সারাৎসারে য়ুরোপীয় 'কালযাত্রা'কে তিনি সংযোজিত করলেন, তৎসঙ্গী 'রিলেটিভিটি', সাপেক্ষবাদকে।

কিন্তু কে তার সন্ধান করে? বাংলার পাঠকসমাজ ও রসিকশ্রেণী তাঁকে চরম অবিবেচনা ও নৈরাশ্য দিয়েছে। এ-সম্পর্কে জীবনের অকালান্তে এসে তাঁকে খেদোক্তি করতে শুনেছি, নইলে তিনি নীরবই ছিলেন, নিঃসঙ্গ সময়প্রহরী সৈনিক। সেই সাক্ষাৎকার-উক্তিটি এই: 'আমার একটা দুর্নাম আছে প্রথম থেকেই—আমি দুর্বোধ্য, আমি মোটেও প্রাঞ্জল নই, আমায় বোঝা যায় না। এটা হচ্ছে যারা আমার প্রতি, যাকে বলে আক্রমণাত্মক, তাদের কথা। আর যারা বন্ধু হয়ে আমাকে বিপন্ন করেছে, তারা বলেছে যে, ওসব ইনটেলেকচুয়াল লেখা। ফলে আমার একেবারে কোনো পাঠক নেই। এবং আমার সাহিত্য সম্বন্ধে · আমার শেষ কথা এই: হয় আমি সাহিত্য সম্পর্কে অজ্ঞ, না-হয় বাংলাদেশের পাঠক এবং সমালোচকেরা সাহিত্য বিষয়ে নেহাৎ নির্বোধ। এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি, আমার ষাট বছর বয়সে। আর এক ছত্রও লিখতে ইচ্ছে করে না আমার।' তারপর তো তাঁর শোচনীয় অকাল-মৃত্যু, বুঝি ইচ্ছামৃত্যু, ঐ বয়সেই, শেষ 'জন্মদিনে'। সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন, না-লিখে থাকতে পারেননি ব'লে। একেবারে সাম্প্রতিক কালের 'decomposed' বঙ্গীয় বিশ্বপরিস্থিতি ও পাত্রপাত্রী নিয়ে 'মুখোশ', stream of consciousness-এর নারীজনোচিত (উল্‌ফ্‌-সংশোধনী) নবীন প্রয়োগে 'বারান্দা'। এ-দুয়ের এবং আরো সমগ্রভাবে তাঁর উপন্যাসাবলীর, বিশেষত তাঁর নিত্যনবীন পরীক্ষানিরীক্ষিত কলাবিধি, ফর্ম ও টেকনিকের আলোচনা, পুনরালোচনা অত্যাবশ্যক। 'Style is the man'-এর ভূমিকাস্বরূপ আমাদের 'Man is the style'—এই বিশ্বাস এখানে উপস্থাপিত রইল। উপস্থিত কেবল সতর্কীকরণ হিসেবে গোগল সম্পর্কে প্রিস্টলির সুযুক্তিকে উদ্ধৃত করছি, এজন্যে যে, আলোচ্য কথাশিল্পী সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পর্কে তা সঠিক এবং প্রায় হুবহু প্রযোজ্য: 'He has indeed been brushed aside, neglected, by many important... groups, distinguished coteries of men of letters. But when will any of them and their works become part of the nation's life, its cultural climate, almost its weather.'

১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
২ টি এস এলিঅট, 'দি হলো মেন'
৩ সরোজকুমার রায়চৌধুরী—'সৃষ্টি'র আলোচনা, অনুক্ত ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
৪ রোমাঁ রোলাঁ, জাঁ ক্রিস্তফ

কৌতুক, করুণ ও 'ভয়াবহ আরতি' সম্প্রতি

১

আজকাল কেউ কেউ ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করেন, বলেন : বাংলা কবিতায় করুণরস বা করুণাভিক্ষা এত ক্ষরিত হয় যে, মনে হয় বর্ষণ ; আর্দ্র দেশের মাটি সেঁতসেঁতে হয়ে উঠল। তদুপরি আর্ত কালপাত্র! অথচ হাস্য বা কৌতুকের সামান্যতম রোদ পড়ে না সেখানে। তবে কি আমাদের বর্তমান জীবনে কৌতুকের কোন উপকরণ নেই, রঙ্গব্যঙ্গের কোন উপলক্ষ, লক্ষ্য ?

চারদিকে যথাযথ চেয়ে দেখলে কিন্তু ব্যাপারটা বিসদৃশই ঠেকে। এখানকার চারপাশ এখন দীর্ঘকাল যাবৎ বিবিধ বিচিত্র অসঙ্গতি, বিরোধ ও বৈপরীত্যে ঠাসা। প্রতিক্রিয়ায় তাই কেবল করুণ কান্না নয়, কৌতুকে শ্লেষে কষাঘাতে ঠাট্টায় হাসাটাই বরং সেখানে সমধিক সঙ্গত, স্বাভাবিক। কেননা 'অস্বাভাবিকে'র কোন সীমাই মানে না এখনকার নিত্যদুর্গত বহুবিড়ম্বিত জীবনধারা। দুঃখে, দারিদ্র্যে, নৈরাশ্যে, নিরুপায় আত্মাহুতিতে, অপিচ বঞ্চনা, ভণ্ডকতা, সুবিধাবাদ ও ক্রূর স্বার্থপরতায় এদেশের বিষ-নিঃশ্বসিত আবহাওয়া আজ বহুকালাবধি ভারী, মহামারী, ভীষণ। এসবের কেন্দ্রীয় কারণ-কার্য-পরম্পরা এতই ছড়ানো জাল যে, তা অল্পে আলোচ্য নয়, সমালোচনার সামান্য শাণিত ভাষা হার মানে।

পাল্টা বলতে পারেন : দুর্গতি ও দুর্দিন জাতীয় জীবনে আজ এতই ব্যাপক যে, হাস্যরসাত্মক অসঙ্গতিগুলি বুঝি চোখে প'ড়েও পড়ে না। কেননা একটি এহেন বিশেষ বিসদৃশ দৃশ্য থেকে কৌতুক উপচে ওঠার আগেই দর্শক লক্ষ করেন অন্য-কোন অনুরূপ শোচনীয় দৃশ্য, নিকট-সংলগ্ন ; হয়তো কেন, নিশ্চিতই আরো ভয়ানক। স্বয়ং দ্রষ্টাও সে-দুরবস্থার অন্তর্গত, অতএব অন্যতম শিকার।

বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। হাস্যরসের মূল বা কুল-লক্ষণে পাই একটা অব্যাহতির আনন্দ, এমনকি ব্যতিক্রমী উচ্চমণ্যতা-বোধের আমোদ। যেমন পুরোনো দৃষ্টান্তে একটি পথচারী আম বা কলার খোসায় পা ফসকে গেলেন, সহচর হেসে উঠলেন—বলা বাহুল্য, তিনি নিরাপদ দূরত্বে সুস্থিত। কিন্তু মুহূর্তেই তাঁর পা টিও যদি ফসকে যায়, তিনি তবে আর কৌতুকে নেচে ওঠার ফুরসৎ পান না, বরং হাঁটু ভেঙে করুণ হয়ে যান। এভাবে দৃশ্যটাকে বড়ো ক'রে নিলে একটা যে

সামগ্রিক পিচ্ছিলতা ও মুহুর্মুহু অসহায়-পতনের ছবি ভেসে ওঠে, এখনকার বাঙালী জীবনজগৎ কি তাছাড়া আর-কিছু? কার দুঃখে কে হাসে, কার ক্বচিৎ সুখ কে গায়? অবশ্য মাত্রাবিচারে হাসি ও অশ্রু, কৌতুক-করুণ-একটি রেখায় এসে অতিসূক্ষ্মসংলগ্ন : 'বাহিরে যাহা হাসির ছটা ভিতরে তাহা চোখের জল' এবং 'অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়' তো একান্ত খেয়ালী কবিকল্পনা নয়, অনেকান্ত অভিজ্ঞতার বাস্তব ধ্রুবপদ।

অথচ বাঙালীর অশ্রুপ্রবণ ব'লে যে সুনাম-দুর্নাম আছে, পরিহাস-রসিক ব'লেও তেমন ছিল : তাই তো এই প্রবাদোপম উচ্চারণ : 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা'—তার অন্তরঙ্গ পরিচয়। তবে দূর-নাতিদূর সেদিনকার সমস্ত 'ভঙ্গ' দুর্দশায় বাঙালী একটি প্রতিপক্ষ-উপলক্ষ সহজেই দাঁড় করাতে পারত, সে হলো পরশাসন; আর তাই সেই 'পরধর্ম ভয়াবহ'-অনুকারকদের দিকে সেকালের অধিকাংশ রঙ্গব্যঙ্গ উচ্চকিত উদ্যত হয়ে উঠত। যাঁরা সেই অনুকরণ থেকে দূরে ছিলেন, এমনকি সেই দুর্বিনীত শাসন-বিপক্ষ হাঁটুভাঙা এজিটেশন থেকেও, তাঁরা অম্লানবদনে হেসে গেয়ে ক্ষণে ক্ষণে রঙ্গেব্যঙ্গে-কৌতুকে 'সুন্দর' হয়ে উঠতেন। প্রাচীন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-নবীন মধুসূদন-দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্ন-বঙ্কিম (নাটকে-গদ্যে-পদ্যে), পাশাপাশি হেমচন্দ্র এবং আরও কিছুকাল পরে 'মানসী' 'সোনার তরী'র রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রচনায়, কবিতায় তখনকার মতো ও পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়ে অন্য বহু বিচিত্র ভাবে-ভঙ্গিতে, এমনকি সঙ্গীতেও নিজেদের প্রকৃতিস্থ চরিত্রগৌরবেই স্ব স্ব স্থান-কাল-পাত্রানুগ দুর্গতি ও দুর্দশায় হাস্যের অশনি নিক্ষেপ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান' তো সেই ধারায় আরেক বিশিষ্ট পালা; (কৃষ্ণ)নাগরিক পরিহাসনৈপুণ্যের অন্য বিদগ্ধ নিদর্শন প্রমথ চৌধুরীর পদচারণে-সনেটে বিন্যস্ত; অত্যন্ত কোমল-কল্পনাপ্রবণ সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর 'হসন্তিকা'র কড়াপাকে বিচলিত-চিহ্নিত। আর স্বনামধন্য সুকুমার রায় তো এদিক থেকে পরবর্তী-'ভারতী' গোষ্ঠীর এক সম্মান, পুরোবর্তী 'সন্দেশে'র মর্যাদা। তাঁর অল্পবয়সী 'স্বদেশী' দ্রব্য ব্যবহারের সেই গানটি : 'আমরা দিশী পাগলার দল···দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশী/তা হোক না, তাতে দেশেরই মঙ্গল'-প্রস্ফুটন থেকে পরিণত 'ছায়ার সাথে যুদ্ধ ক'রে গাত্রে হলো ব্যথা'র স্পষ্টোক্তি মাত্র তাঁর স্মরণীয়তার নমুনা নয়, বরং তাঁর যাবতীয় উজ্জ্বল রচনারই মুখ্য দর্শন, সারসূত্র, মূল ধুয়ো। ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্রীয় সব প্রভাব-প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠানের ছায়াই আমাদের কাছে কায়াতুল্য, দেখেই ভির্মি খাই, রুখে দাঁড়াবারও ভড়ং করি, বাবুরামদের সেই সাপের ফরমাস দিই, যার 'দাঁত নেই, নখ নেই' ইত্যাদি—সেই নির্বিষ নিরাপদ সাপকে ধ'রে নয়, বেঁধে এনে

'তেড়েমেরে ডাণ্ডা ক'রে দিই ঠাণ্ডা'—এই তো আমাদের শক্তি, সাহস, আত্মপ্রসাদের দৌড়! এসব যিনি খুঁটিয়ে দেখে খাঁটি সমালোচনায় অবিচল অবিরাম বিঁধতে চেয়েছিলেন, শোচনীয় অকালমৃত্যু পর্যন্ত তা পেরেছিলেন, সেই অসামান্য-সাহসী অনন্যপ্রয়াসী মহাবোদ্ধা-যোদ্ধা কবিই হলেন কিনা মাত্র বাল-কিশোরদের দ্রুত পঠন ও দ্রুত বিস্মরণের সামগ্রী! হায়, রঙচঙে আশুশিশুতোষ সুকুমার রায়! তাঁর প্রাপ্য অভিনিবেশ ও যথার্থ মূল্যায়নে আমাদের এতকাল-অযোগ্যতাই প্রমাণ করে যে, আমরা এদিক থেকে কেন, সব দিক থেকেই দিনে দিনে কত দুর্বল হয়ে গেছি, কত দরিদ্র ও দীনহীন!

সেই উত্থান ও অভ্যুদয়পর্ব অচিরাৎ ফুরোল। তারপর থেকেই পতনের কাল শুরু। যতই যুক্তিমার্গে বিশ্বজিজ্ঞাসায় মন ধাবিত হ'লো, ততই বুঝি 'বিশ্বরূপ' দুঃখে প্রাণ দ্রবীভূত হ'লো সমধিক, আত্মদৈন্যেও সন্ধিৎসু চোখ পড়ল, ঘন ঘন অপরের আপাততুচ্ছ স্খলনের সুখে-দুঃখে আর সমুচ্চ উদার হাসির আয়োজন হ'লো না—বৃহৎ কোন আদর্শচেতনা অথবা মহৎ কোন উদ্দেশ্যবোধ নিত্যবিড়ম্বিত শতধাদারিদ্র্যে আত্ম-আর্তনাদের আযোজন প্রতিধ্বনিতে চাপা প'ড়ে গেল। 'বিপুল বিরতি' ও বিচ্ছেদ ঘটল কৌতুকের। (গদ্যে পরশুরাম ও পদ্যে অন্নদাশঙ্কর যেটুকু স্থির-স্থায়ী ব্যতিক্রম!) শুষ্ক শূন্য রিক্ত বিরক্ত জীবনে কেবল করুণ বা করুণার কণাসন্ধান অর্থাৎ বুঝি এক তির্যক তাৎপর্যেই: 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো'!—এই 'করুণ-মিনতি মাখা' 'এসো এসো-'সুরের যেন আর শেষ নেই, শেষ হতে নেই; কেননা শুষ্ক রুক্ষ শূন্যতার খাঁ-খাঁ যে নিরন্তর, হা-হাও অনিঃশেষ। এবং তারপর ধাপে ধাপে আমাদের অবস্থা-ব্যবস্থা—সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, বিশ্ববিপর্যয়সমেত, যত দুর্বিষহ, করুণ আর ভয়াবহ হয়েছে, আমরা ততই শামুকের মতো গুটিয়ে গিয়েছি খোলসে, নিজেদের ঢেকে ফেলেছি পৌনঃপুনিক দুঃখকষ্টে পীড়িত আত্ম-করুণার অবরোধে। একদিকে জাল, ভেজাল, জুয়াচুরি, ছলনা, মিথ্যাচার ও কাপট্যের বড়োবাজার-বহুবাজার, অন্যদিকে শিরে-করাঘাত-সর্বস্ব মানুষী-গড্ডলিকার রোমন্থনী রসনা-রসায়নে বৈঠকখানা-তৃপ্তি: রাজা-উজির-মারা তাৎক্ষণিকের তলায় তলায় ব্যক্তিগত ক্লান্তি শ্রান্তি প্রশমনের, হয়তো দিশাহারা উত্তেজনা-অবসাদেরও নানা গোপন-সুরঙ্গপন্থী ব্যতিব্যস্ততা; সেই পথ ধ'রে ক্ষতাক্ত স্নায়ুশিরাকে বিক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ ক'রে তোলাব নানা রম্য আয়োজন। তারপর সমস্ত চিত্তবিভ্রম বিত্তবিভ্রাট দুশ্চিন্তা দুর্বিপাকের অবসাদনাশা নিশাযাপন, ব্যথার বৈকল্য-বশীকরণ, নেশাতুর-'নিরাপদ' নিদ্রা। পরদিন পুনরপি 'দিনগত পাপক্ষয়' শুরু করার মুখেই আদৌ-অভুক্ত পেটের পিত্তশূল। সর্বত্রই আদতে

নাস্তি—মূলে ভুল—গোড়ায় গলদ। তাই বেড়াজাল-বেসাতির বহুতল সাম্রাজ্যে আত্মঘাতী বিপুল গোঁজামিলের স্তরে স্তরে পলেস্তরা-খসা অকাট্য বাস্তব। এহেন অবস্থায় আদৌ অসুস্থ-অস্বস্থ কবির ভূমিকাটা কী? তাঁর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চরিত্রবান সম্মিলিত-আদর্শ-রৌদ্রময় পিতৃপিতামহের ধারাবাহিকতায়, এই কালে, এই দেশে, "এই দিকে"?—

এইদিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর খাতক;
কিছু নেই—তবুও অপেক্ষাতুর;
হৃদয়স্পন্দন আছে—তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর;
পাগলের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায়;
কী যে চায়!

অথচ তিনি জানেন, পূর্বযুগে ও পূর্বপ্রজন্মে:

যেন কেউ দেখেছিল খণ্ডাকাশ যতবার পরিপূর্ণ নীলিমা হয়েছে
যতবার রাত্রির আকাশ ঘিরে
স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে···
যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে
রৌদ্রের আকাশে···

আর আজ?—

···তার
ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার।

কবি আজ তাই, 'সাতটি তারার(ও) তিমিরে' আচ্ছন্ন, বিগত সমৃদ্ধির ফাজিল দেনা শুধতে 'এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকারে' 'তবুও অপেক্ষাতুর'—'হৃদয়স্পন্দন আছে': যেন এটুকুও ঢের। তিনি নিজে কদন্ন-নিরন্নের ভোজে প্রতিপালিত, অসুস্থ, স্বাস্থ্যের প্রতিশ্রুতিহীন, ঔষধশুশ্রূষাহীন, মুমূর্ষু। শুধু 'ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর খাতক,' তালমানমাত্রাহারা, 'অহরহ বিপদের দিকে অগ্রসর'। স্বতই আত্মরক্ষায় শশব্যস্ত, আত্মহত্যায়ও বিব্রত, 'বিপন্নবিস্ময়'। এবং এহেন অদ্ভুত শোচনীয় অসুস্থ-অস্বস্থতার বিকার-বিকৃতি থেকে, আত্মবিক্রয় ও করুণার মেঘমেলা থেকে তাই বুঝি অশ্রুবর্ষণই সম্ভব; কৌতুক-রঙ্গব্যঙ্গের রৌদ্ররঞ্জন মিথ্যাবাদ, বৃথাপচয়; 'আশার ছলনা' এবং 'রৌদ্রের অন্ধকার'।—মধুসূদন থেকে জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ

('…নিয়তি অগস্ত্যযাত্রা…অথবা 'চরাচরে নেতির বিস্তার') এখানে একসুরে একসূত্রে বাঁধা।

২

বাঙলা সাহিত্যের সর্বত্র, বিশেষত কবিতায়, মনোবিদগ্ধকর কৌতুকেরই শুধু নির্বাণ হয়নি, প্রাণঋদ্ধকর বিস্ময়-কৌতূহলেরও অবসান হয়েছে। আনন্দ-আবেদনময় শরৎকালীন ঋতু-রুচির উৎসার, অগাধ অবাধ কুতূহল, প্রফুল্ল বেদনার উৎসাহী লীলারূপটি, তথা তার সেই প্রচলিত প্রাণশিল্পেরও নির্মম নির্বাসন ঘটেছে। অতঃপর কবিতায় তাই গুমোট-করা বেজায় বেজার 'ভাদ্রের দিনের ভাবনা' এসেছে এবং "গিয়েছে আশ্বিন"।

সত্যি, শরৎকাল দ্রুত চলে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে শরতের কবিতা। আমাদের বারো মাসে ছয় ঋতুর অঙ্কে সম্প্রতি কোন ভুল ঘটেনি। কিন্তু আজকাল বিশেষত কলকাতায়, ঋতুর অনুভব আকাশ বাতাসের পরিবর্তনে যদি যথারীতি মান্য হয় তবে বলতেই হবে যে, শরতের ভাগ্যে বাস্তবিক আয়ুষ্কাল তার কাল্পনিক তথা পঞ্জিকা-জল্পিত পরমায়ুর চেয়ে ক্রমাগত ঘাটতি-বাজেটেই ঝুঁকে আছে। বৃহত্তর বাঙলা দেশের পক্ষে এ-বিষয়ে প্রসঙ্গপাত কাম্য নয়। বস্তুত কলকাতা-গ্রস্ত রূপে তা আমাদের 'অসাধ্য', 'অন্যায়', অনধিকারচর্চা।

এখন দেখা যাক, প্রকৃত ব্যাপারটা কী।

যে-দেশকালপাত্রে রবীন্দ্রনাথ শরতের এই মর্মচিত্র এঁকেছিলেন: 'শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম।' সেই দেশকালপাত্রসহ সমগ্র আনুষঙ্গিক অনুভব থেকেই আমরা এতদূর নির্বাসিত যে, পুনর্বাসনের কোন প্রশ্ন নেই—পুনর্বাচনেরও না। কেননা শরতের সেই মৌল রূপচিত্র, যথা 'রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা' ইতিমধ্যে আমাদের, অর্থাৎ এখনকার কবিদের ও কবিতা-পাঠকদের, পুনরুদ্ধারের উপায়হীন, বিলক্ষণ হারাতে হয়েছে। শারদীয় কলকাতা সে-ছবি দেখাতে অক্ষম ; আর এখনকার কবিসমাজ সংখ্যাগুণ-গরিষ্ঠে কলকাতার। তাছাড়া দুদিনের জন্যে (নাকি দুর্দিনের জন্যে ?) কলকাতার ধোঁয়াটে আকাশ চুঁইয়ে যেটুকু কাঁচাসোনা রোদ আচমকা আমাদের কৃপণ জানলায় দরোজায় উঁকি দিয়ে যায়, বনস্পতি-মহীরুহ-হারা লতানো উদ্ভিদের ঘাসতৃণের অদৃশ্যে 'পাষাণ কারা'য় যেটুকু সবুজের ছোঁয়া তবু ইতিউতি কখনো-বা জাগে, এবং নীলের ইসারা—তা এতই ক্ষীণ, ক্ষণিক ও স্বল্পস্থায়ী যে, 'শতেক কবি'র সহস্র শারদীয় কবিতায়ও তার কোন প্রমাণযোগ্য প্রতিফলন বড়ো একটা নজরে পড়ে না। কদাচিৎ কোন চিত্রবিষয়ের নিছক নিষ্প্রাণ উল্লেখ হয়তো পাই,

কিন্তু তাতে গভীর গভীরতর মনপ্রাণের কোন সাড়া মেলে না। এর একটা বড়ো কারণ: নাগরিক অবস্থা-ব্যবস্থা ও আবহাওয়ার অভাব-কার্পণ্য ছাড়াও স্বয়ং নাগরিক মানসিকতার স্বভাবকার্পণ্য। একথা না মেনে উপায় নেই যে, সবসত্ত্বেও এখনকার কবিরা প্রাণের চেয়ে মনের দাবি বেশি মেটান। তাঁদের ঝোঁক প্রবল প্রশস্ত প্রাণস্ফূর্তির চেয়ে সূক্ষ্মসঙ্কীর্ণ মননের দিকে সমধিক। আর প্রাণ যেখানে অসাড়, স্পন্দন-বিমুখ, সেখানে 'প্রাণের ঋতু' (দুই বিভিন্ন তাৎপর্যে 'শরৎ' ও 'বসন্ত') স্বতই কোন ভাবাবহ নির্মাণে অসমর্থ। আলোচ্য 'শরৎ', হায়! আজ কলকাতার জনজীবনসমাজেই শুধু অগোচর নয়, কবিসমাজেও অগ্রাহ্য।

সেই উনিশ শতকেরও গ্রাম-নগরে যখন আজকের এই ব্যাপক ব্যবধান গড়ে ওঠেনি, কলকাতার চিৎপুরে জন্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পদ্মাপারাপার শান্তিনিকেতন-প্রকৃতিতে যোগযুক্ত ছিলেন—একনিষ্ঠ—তা তাঁরও ভাগ্য, আমাদেরও। সেই দৌলতে আমরা বাংলা দেশের শরতের কিছু বিবর্ণপ্রায় স্মৃতির দলিল এখনও উল্টেপাল্টে দেখতে পাই। বিশ শতকের প্রথম পাদেই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রাশ্রয়ী কবিরা, এমনকি মোহিতলাল (শিরায়-স্নায়ুতে সম্ভোগবাদী কবি হয়েও 'কন্যা-শরৎ' ও 'শিউলির বিয়ে'র পিতৃ-ঘটকালি করেছিলেন), নজরুল (সমুচ্চ-'ফরিয়াদী' কবি সত্ত্বেও তাঁর 'দারিদ্র্যে'র দর্শনে শরতের শেফালি-সাহানা আন্তরিক মিশিয়েছিলেন) যেটুকু গ্রাম-নগরের সেতুবন্ধ ঘটিয়ে গেছেন। বস্তুত বাস্তকার-কবি অতিবাস্তববাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই প্রথম সঙ্গত ভাববিপর্যয় টানলেন। 'আজিকে তোমার বিধুর মূরতি' কেবল রবীন্দ্রনাথের প্যারডি বা 'বঙ্গে শরতে'র ব্যঙ্গতির্যক অন্য-ছবি নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সমকালীন কবিচেতনা-ব্যতিক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ প্রথম পরিচ্ছেদ।

তদবধি গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধ'রে কলকাতার নবকবিসমাজ 'ঊর্ধ্বশ্বাস'-'রুদ্ধশ্বাস' ইঁদুরের ভূমিকায়, উদ্বাস্তু-উদব্যস্ত পটভূমিকায়, পল্লী থেকে, পল্লীপ্রকৃতি ও প্রাণতার 'সহজ' বোধজগৎ থেকে বিপরীত বুদ্ধিমার্গীয় কল্প-গোলার্ধে যাত্রা করেছেন। এখন তাঁদের সে-অব্যাহত-কবিপ্রস্থানে অখণ্ড যুক্তি-মনোযোগ শুধু 'বিশ্বরূপ'-কলকাতা-জীবনে তথা তাঁদের একান্ত নাগরিক মননে-চিন্তনে নিয়োজিত, অবসিত; 'কিছু নেই তবুও অপেক্ষাতুর'; 'হৃদয়স্পন্দন, আছে—তাই অহরহ / বিপদের দিকে অগ্রসর'; 'পাগলের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে / নরকের মতন শহরে / কিছু চায়; কী যে চায়!'—মাত্র কাকতালীয় যোগাযোগ নয় যে, যুগোচিত-যুগন্ধর 'বিপন্ন বিস্ময়ে'র কবি যিনি, সেই জীবনানন্দ দাশ আধখানি চরণেও শরতের কবি না হয়ে, স্পষ্টত, বিশদ তাৎপর্যে শুধু হেমন্তের কবি।

অবশ্য একথা সত্য, জীবনানন্দ বরিশালে থাকতেই ধানসিঁড়ি নদীর পাশে ধানকাটা মাঠে মাঠে হেমন্তের কুয়াশাকে হৃদয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন। ধুলোয় আকীর্ণ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কলকাতার কুয়াশা তাঁর ক্লান্ত বিষণ্ন বিপন্ন নাগরিক প্রৌঢ়তায়, বিশ্বস্ততা-আশ্বস্ততায় নয় আর—বিধ্বস্ততায়, হেমন্তের স্বাভাবিক কুয়াশাকে আরো ঘন আরো স্থায়ী ক'রে দিল পরবর্তী কবিতায়। শরতের বৃহত্তর ভাগ, সমগ্র শীত ও বসন্তের পূর্ব-রাগ সেই সুদীর্ঘস্থায়ী হেমন্তে (কবিদের পঞ্জরে, পুরুতের পঞ্জিকায় নয়) অবাধ প্রবেশাধিকার যেমন ঘটাল, তদবধি সাম্প্রতিক কবিসমাজে আরো অগাধ অবাধ আধিপত্য, হয়তো সমাচ্ছন্ন পাঠকসমাজেও সমুচিত প্রভাব। এমন-কি 'এই তো শরৎ হাসে শুভ্র মেখে কী প্রসন্ন হাসি' জাতীয় পংক্তি 'ইটের পরে ইট—মাঝে মানুষ কীট' জীবন-যাপনগত কুটিল-ক্রূর মানব-প্রহসনের নেপথ্যলোক রচনাতেই বিব্রত। জটিল জীবনের মতই এখনকার কবিতাও আত্যন্তিক, একস্ট্রিমিস্ট। নইলে সেই যে ঘোষণা বেজেছিল: 'প্রকৃতি ভুলায়েছিল, মানব ভুলালো' (অন্নদাশঙ্কর রায়), তাই তো অক্ষরে-অক্ষরে সত্য হয়েছে আজ। প্রকৃতি যে দোলা দেয়, দিতে পারে, তা এখন আমাদের কবিদের অভিজ্ঞতায় 'অতীত' বস্তু। মানবসভ্যতা ও বর্বরতার নানা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, দুশ্চিন্তিত ভাব ও অভাব-চিত্রই আমাদের অহর্নিশ মনোযোগ দাবি করে। আত্মধিক্কৃতও করে তার বহুতর চাপ এবং তাপ, ক্ষিপ্র-ক্ষিপ্ত তীব্রতার-টানটান খেলার(?) বাধ্যতা (**rope-walker's tension and trade**)। এভাবে আমরা বহুদূর যেতে পারি, এমনকি স্পেণ্ডারের ভাষায় **"It was easy to be advanced only to take away the clothes"**-এর নৈরাজ্য পর্যন্ত—অগ্রগতির বাসনায় রাজনীতিতে যেমন, কবিকল্পনায়ও নাৎসীবাদী নগ্নতার ব্যসনে-অপব্যয়ে-ক্ষয়ে।

আমাদের এই অতিপরিণতিপ্রাপ্ত মনঃসাম্রাজ্যে স্বতই শরতের কোন গভীর স্পর্শ নেই, যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ: "বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণীধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে। তাঁর কাঁচা দেহখানি, সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচিধানের গন্ধের মতো। আকাশে-আলোকে গাছে-পালায় যা কিছু প্রাণেরই রঙ, একেবারে তাজা।" পীতযৌবন প্রৌঢ়তার কাছে 'কোমল' তাজা শৈশবের কোন স্বাভাবিক আবেদন কল্পনাতীত। এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা জানি যে, যখন "মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া উঠে, তখন লালনীল সকলরকম রঙই থাকিতে পারে, কেবল প্রাণের রঙ থাকে না"—আমাদের

এখনকার মৃত্যুপাণ্ডুর জীবন ও কবিতায় তাই প্রাণস্ফূর্ত শরতের রাহুগ্রস্ত দুর্দশা; খণ্ডগ্রাস থেকে পূর্ণগ্রাস চলেছে।

আর শুধু শরৎ কেন, সমগ্র প্রকৃতির দিকেই একাল পিছন ফিরে বসেছে; হয়তো বিশ্ব-প্রকৃতি, সমগ্র মানবতাও, তার প্রকৃতিস্থতায়, এখনকার অনবধান-যোগ্য। অথচ প্রকৃতিকে ছাড়া বিশ্বপ্রকৃতি ও বৃহত্তর মনুষ্যত্বের ভাবনা যে নির্মূল বৃক্ষভাগ্য তা আমরা রবীন্দ্র-আবহে-আগ্রহে জেনেছি। কিন্তু আধুনিক-সাম্প্রতিক ক্রমান্বিত অ'শুদ্ধির তাণ্ডবে' (অথচ স্মরণীয় : 'স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে শুদ্ধির তাণ্ডবে'—সুধীন্দ্রনাথ) সেই প্রাণোচ্ছল দীর্ঘচ্ছন্দ রবীন্দ্রনাথও তাঁর দীর্ঘবন্ধ কবিতাগুলির মতোই প্রায় প্রত্নস্মৃতি। তাই তাঁর শরৎ-উপলক্ষ কবিতা ও গানের অজস্রতায় না গিয়ে কেবল সেই ভাষ্যপ্রধান দীর্ঘ কবিতাটি 'যেতে নাহি দিব', এ-অবস্থায় দেখা যাক, কতটা অব্যর্থ-প্রাসঙ্গিক। কেননা এখনকার কাব্যে-উপেক্ষিত শরতের চারিত্র যেন তার মর্মে মর্মে বিরাজিত, অতঃপর-ঘটিত ভবিতব্যের কালো কুয়াশা, মেঘবৃষ্টিঝড় ক্ষণবিদ্যুতে দেদীপ্যমান। শরৎকালের ছুটিশেষের বিদায়-প্রহরে সমগ্র শরৎ-প্রকৃতির অন্তঃসারস্বরূপ যে দেখা দিল কবিকল্পনায়, সেও কবির সেই চিরপ্রিয় বিশ্বপ্রকৃতির নিশ্চিত নির্যাস শিশুপ্রাণ ও প্রকৃতির নির্ভুল নিশ্চল ব্যাকুলতা—শরতের সঙ্গেই তার প্রাণধর্মের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত, 'শরৎ'-নামীয় গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথই যার প্রচার করেছেন, এ-প্রবন্ধেও যার উদ্ধৃতাংশ বারবার ব্যবহৃত।

অবশ্য গদ্যে-শরতের চরিত্রভাষ্যে রবীন্দ্রনাথ ততটা গাম্ভীর্য ও স্তব্ধতার অবতারণা করেননি, অনায়াসে বলে গেছেন : "শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে—বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিযানের চলা।" বিষণ্ণতার ভাব যেটুকু আছে তা আগমনী-বিজয়ার ধুয়ায় ভরা—বিজয়ার ম্লানমেঘ আগমনীর নির্মল রৌদ্রকে মাঝে মাঝে আড়াল করছে, কিন্তু আচ্ছন্ন আবৃত করছে না। যতই তিনি বলুন : "শরৎ পৃথিবীর এইসব ছোটদের এইসব ক্ষণজীবীদের (ধান, ইক্ষু প্রভৃতির) ক্ষণিকের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা আকাশের নীচে হা-হা করিতে থাকে।" কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তিনি অক্লেশে উত্তীর্ণ হয়ে যান তাৎক্ষণিক স্থিরচিত্র ছাড়িয়ে চিরন্তনের চলাচলে, তিনি বলেন : "আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটি কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনীগানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের

মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।" এই গভীর আস্তিক্য-বোধের প্রশান্তি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার প্রৌঢ় পিতৃহৃদয়ে বিচলিত হয়েছে, তাই সেখানে সব সত্ত্বেও শেষ স্বাদ তদ্গতপ্রাণ মুগ্ধতার নয়, দীর্ণ দীর্ঘনিঃশ্বসিত ক্ষুণ্ণতার। কিন্তু সেখানকার কেন্দ্রচরিত্র অভিমানিনী মেয়েটি অবিচল, স্থির, ক্ষোভহারা। শরতের সঙ্গে তার ভাবৈক্য অক্ষয়-রাখিবন্ধনের, সে মায়ামোহপাশে বন্দিনী হয়েও মুক্ত। শরৎকালেরই অন্তর্গত সে, একাত্মতায়, একাগ্রতায়, অবিচ্ছেদে। সে তাই দূরদেশে দ্বারপ্রান্তে শরতের মতো ম্লানমুখী অবনত, তবু অপরাস্ত, র'য়ে গেল; আর কবিতায়-বর্ণিত পিতা-ব্যক্তিটি তখন শরৎকাল থেকে হেমন্তকালে দ্রুত অপসৃত হচ্ছেন :

…গিয়েছে আশ্বিন—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে
সেই কর্মস্থানে।

নিশ্চয়ই কোন দূর নগরে, শহরে, হয়তো সর্বকর্মপীঠ কলকাতায়। তাই 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর'; আর 'হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর'।

আমাদের এখনকার কবিতা ওই পিতৃপ্রস্থানের মতো নানা কর্ম-চিন্তা-বুদ্ধি-যুক্তি-তর্ক আন্দোলনের দুর্মর আহ্বানে ও তুচ্ছ-না-তুচ্ছ গুচ্ছগুচ্ছ জটপাকানো জীবিকার সত্বর তৎপর তাড়নায় তাকে সব-কিছু পিছনে রেখে ছুটে যেতে হয়— যা-কিছু কোমল, স্নিগ্ধ, শান্ত, যা-কিছু শরৎকালের মায়াজাল, সে-সমস্তই হেমন্ত-শীতের কুয়াশায়-ক্রূরতায়, রূঢ়তায়-জীর্ণতায় জড়াতে জড়াতে, জরাতে জরাতে। আমরা ;সময়-প্রভাবের গুণে আরো বদলেছি, শস্যহীন শুষ্ক মাঠ মননের কড়ারৌদ্রে পীত বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, এমন যে, সত্যি সত্যি 'শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নীচে হা-হা করিতে থাকে' বললেও যেন কিছুই বলা হয় না। এ তো আর প্রকৃতই কাঠ-ফাটা রোদ নয়, কাঠ-লোহা-পাথর-অ্যাসফল্ট-ঠা-ঠা রোদ : "কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া" সেই চল্লিশের দশকে ছিল, আজ আশিতে এসে সেই চামড়ায় ডুগডুগি বাজছে। বাজাচ্ছে। কারা? কেন? কোন্ অবসরে বা সুযোগে? কে দেবে উত্তর? তাই পূর্বসূর্যোক্ত(পূর্বসূরি+উক্ত) মাঠের শূন্যতা যে পূর্ণতায় ফিরে যায় বা ঘুরে আসে সেই চিরন্তনের আবেগকে আর উত্তরসূরিরা ধরতে চান না, পান না, পারেন না। ধরবার বা বলবার উপকরণ যে ঈশ্বর বা প্রকৃতি তা এঁদের অভিজ্ঞতায় যেহেতু বিলুপ্ত, এক্ষণবাদীর বিষণ্ন চিন্তা ও কূট তর্ক তাই প্রবল পক্ষ-প্রতিপক্ষে এঁদের শুধু 'মূক ক'রে রাখে'। "ভাষা নাই, ভাষা নাই"।

তাই নাগরিক মননেচিন্তনে প্রকৃতির ভাব ও ভাবনা আজও যেটুকু অবশিষ্ট, তা প্রাক্কালীন কবির পূর্ব-অভিজ্ঞতা অথবা অভ্যাস-সংস্কার-বশত, এ-কালীন স্নায়ুসমীক্ষারত কবিদের অযথোপযোগিতায়, তবু চিত্রকল্প-রচনার বাধ্যতায়, ব্যবহৃত। সে-হিসেবে ধূসর হেমন্তের স্বভাবপ্রৌঢ় কবি জীবনানন্দই এখনকার কবিপ্রতিনিধিত্বের যথার্থ 'দোসর'। এবং 'জরতী' হেমন্তের ভাষ্যকার সুধীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জন্মপ্রৌঢ় উনিশ-বিশশতকী পাশ্চত্য-প্রাচ্য কবিরা। সবিশেষ উল্লেখ্য: বোদলেয়র, মাল্লার্মে, ভালেরি, ইয়েটস্, পাউণ্ড, এলিঅট, অডেন, ম্যাকনীস, কামিংসরা; আংশিক বিষ্ণু দে, সমর সেন, পরিণত বুদ্ধদেব-সঞ্জয়রা—বিভিন্ন কারণ-কার্যে-পারম্পর্যে।

সেজন্য অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই মর্মান্তিক সত্যটি স্বীকার্য যে, আমাদের সমকালীন, পূর্বজ অগ্রজ ও সমজ সাম্প্রতিক কবি-অভিজ্ঞতায়, কবিতায় চিরতরে 'গিয়েছে আশ্বিন'; আর 'হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর'। সেই হ'লো পরবর্তী 'রৌদ্রের অন্ধকার'। রবীন্দ্রনাথ কি রূঢ়-'গূঢ়' ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?

৩

আসলে এখনকার মানুষের তথা কবি-মানসের একাকিত্ববোধ তুলনাহীন। যাঁরা স্বভাবতই চিন্তাশীল, আত্মমগ্ন, কবি, তাঁরা চিরকালই নিঃসঙ্গ! সে-নিঃসঙ্গতা বোঝা যায়। কিন্তু নিঃসঙ্গতা ও নিঃস্বনিঃসঙ্গতা এক জিনিস নয়। আদৌ বিভিন্ন।

এ-প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, গত শতাব্দীর মানুষ, কবি-দৃষ্টান্ত পরে আলোচ্য, অশনেবসনে আজকের মানুষের চেয়ে সুখে না থাক, স্বস্তিতে ছিল। সচ্ছলতা না থাক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তাদের পারিবারিক নিশ্চয়তায়, সামাজিক নিরাপত্তায়, ঘর-বাইরের সঙ্গতি-সামঞ্জস্যে। তাদের জন্য ঈশ্বর-চিন্তার সঞ্জীবনী অথবা ধর্মবাতের উন্মাদনা ছিল, রাজনীতি-সমাজনীতির কর্মকাণ্ডে শান্তি না থাক, প্রভূত সান্ত্বনা ছিল, শিক্ষাদীক্ষায় অন্তত আদর্শবাদী আত্মপ্রসারের তৃপ্তি-তুষ্টি ছিল। প্রকৃতিদেবীর স্নিগ্ধ ছায়া ছিল গৃহপ্রাঙ্গণে, মানুষ-মানুষে আত্মীয়তা ছিল ঘরের দাওয়ায় কিম্বা দাবাখানায়। আজ ধর্মের ধ্বজা ভগ্নছিন্ন, শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি বিরোধে-বিসম্বাদে-স্বৈরাচারে বিসর্পিল, আর ঘরে-বাইরের দাওয়া ও দাবাখানা 'বায়ুদুর্গ'। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও বহুখণ্ড হয়ে বিলীয়মান এবং বলা বাহুল্য, এ-অবস্থায় প্রকৃতি শুধু সুদূরের আহ্বান নয়, নিশ্চিহ্নপ্রায় ইশারা; 'ঈশ্বর বধির' অথবা নিরুদ্দেশ।

সুতরাং এই শতাব্দীর 'সমানবয়সী' 'অগ্রজ' কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন:

নিরুদ্দেশের যাত্রী আমার তরী;
নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা।

অচিরেই বুঝি : ওই দু'টি মাত্র পংক্তির রক্তাক্ত বেদনায় আমি-তুমি-সে-একাকার আমাদের সর্বস্বান্ত অস্তিত্বের নিরুপায় কাতরোক্তি। তাই একদিকে যেমন 'এ-যুগের চাঁদ কাস্তে', তেমনি আরেকদিকে 'Not with a bang but a whimper' বিশেষ-সমাজ-কাঠামোগত 'ফাঁপা' মানুষমাত্রেরই কাঁপা-কাঁপা মর্মবাণী।

কবিতার কথায় তাই সহজেই মনে হয়, দুই কবিকে নিয়ে আজকের এই 'নিরবলম্ব নিখিলে'র দুর্দিন, দুর্গতি ও দুর্দশায় বুঝি বেশ পৌঁছনো যায়।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমায়ু তাঁর কবিতার মতই একটি নিয়মিত দিনের ছন্দেলয়ে অর্থময়ে বলয়িত, বিকশিত! তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের নিরাবরণ-পুনরাবরণে যথাযথ। এমন সুসঙ্গত মানবজন্ম, মানব-জীবন, জীবনের উদযাপন উত্তররবীন্দ্রের সঙ্গে প্রতিতুলনায় পদে পদে আজ সম্যক স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের গৌরবগাথা বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা করে না, শুধু তাঁর পথনির্দেশ, গতি ও পরিণতিটা এক লহমায় যথাসাধ্য লক্ষ করা যাক। তিন বয়ঃসীমার ত্রিবিধ ধরিত্রী-সম্ভাষণেই তাঁর ক্রমপর্যায়ী স্তর বেশ ধরা পড়ে। 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা'য় মুগ্ধ খেয়ালী-কল্পনার অরুণরক্তিম প্রথম-প্রভাত প্রতিভাত :

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে।···
···এখনো মিটেনি আশা ;
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি ; তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন ;

পক্ষান্তরে 'পত্রপুটে'র 'পৃথিবী'তে (নামকরণে সম্বোধনে সম্ভাষণে বর্ণনায় সর্বত্র বৈপরীত্য লক্ষণীয়) নির্মোহ সত্যজ্ঞাপনের ঋজু রৌদ্র, 'ললিতে কঠোরে' মধ্যাহ্নের চিত্রাবলী :

ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
···দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।
···তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি—
·· হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে

তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

সেই মমতাময়ী মা বসুন্ধরা এখন নির্মম উদাসীন পৃথিবী!

আর 'শেষ লেখা'য় ' ...সৃষ্টির পথ'-এ সংশয়-সঙ্কট-দীর্ণ চেতনার অবসন্ন গোধূলি :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।

'পত্রপুটে'র "জীবপালিনী"-সংহারিনী পৃথিবীর রৌদ্ররোদনী দ্বৈত-ভূমিকা 'শেষলেখা'য় সুস্পষ্টতম সম্বোধনে সায়াহ্নপ্রাবী 'ছলনাময়ী'। অবশ্য অন্তিম বাণীতেও শতাব্দীলালিত স্বস্তিশান্তিবাদী সততা-সহিষ্ণুতার আত্মশক্তিই কবির একান্ত নির্ভর। সমকালীন 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে দেখা যায় যে, বিশ্বসংবর্তের সম্মুখীন হয়ে প্রাণের প্রথম প্রত্যয় জীবনের বহুল বিশ্বাস খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে, কিন্তু মনুষ্যত্বে আস্থা তখনও অটল। গভীর আত্মবিশ্বাসের উপাদান যে-মানবপ্রত্যয়, তা বহুকষ্টে কবি প্রাগন্তিম দিনের নিবেদনেও সংরক্ষা করেছেন।

অথচ পরবর্তী যুগে দুই বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের অবসানে ও সম্ভাব্য তৃতীয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অথবা তার অপরিমেয় বিপরিণামে পৌঁছে, 'বজ্রের আলোতে' প্রাপ্ত আদর্শ ও উন্মার্গ বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে ('পৃথিবী অনাথ, যথেচ্ছ পরমাণু'), স্বদেশে-বিদেশে মানবত্রাণের নামে মানবসংহার দেখে ('প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ত্রাতার বদলে') বুদ্ধির ভণিতায় তাণ্ডবের রক্তমোক্ষণে (যদিও কথা ছিল : 'স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে শুদ্ধির তাণ্ডবে'), মুক্তির মহিমায় অভুক্তি-কুযুক্তির আয়োজনে ('বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু'), নবযুগের নামে যুগান্তসাধনায় ('প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে') যা-কিছু আস্থার স্থল ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ঠেকেছে এসে ব্যক্তিতে, ব্যষ্টিত্বে—ভগবান, প্রকৃতি, সর্বোপরি 'মানব'-মানবতা সমস্তই সনাতন-অর্থহারা, অন্ততনে তাৎপর্যহীন। অবশিষ্ট শুধু অস্তিত্বের বিষাদ। কেননা সেই অস্তিত্বরক্ষায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জাতিতে জাতিতে মানুষীসভ্যতার-সর্বস্তরে যে নিত্যনৈমিত্তিক বিসংবাদ বিরোধ সংঘর্ষ আজ অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য, সেখানে মাত্র ব্যক্তিত্বের স্পর্ধিত ঘোষণা হয়তো ছদ্ম-বলিষ্ঠতার দ্যোতক, কিন্তু আদৌ বৈনাশিকতারই নামান্তর। অগত্যা

তাই স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পূর্বোদ্ধৃত যুগ-অগ্রজেরই উক্তি। এই অস্তিত্বের-ব্যক্তিত্বের অসারতা (সার্ত্র-এর দর্শন 'Existence & Nothingness' স্মরণীয়) স্বয়ং তাঁরই কথায়, সোহংবাদীর যোগরূঢ় অভিজ্ঞতায়, অসহায় আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত :

মহাশূন্যের মৌনে পরিস্ফীত,
বিবিক্তি আজ বেষ্টনী-বিরহিত ;
অধুনায় নিশ্চিহ্নে অতীত আগামী ;
নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা,
সোহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা,
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই।

অথচ :

পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যক্তির বুদ্বুদ,
সময়ের স্রোতে অচির, অরুন্তুদ,
মমতার জোট পাকায় এ-চরে ও-চরে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয় দিনের সুপ্রভাতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। পুনরুত্থানী নবজীবনের সর্ব-লক্ষণে তিনি দিনে দিনে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছেন! আত্মপ্রেম, প্রকৃতিপ্রীতি, ধর্মধ্যান, দেশহিত, বিশ্ববীক্ষা, মানবপ্রত্যয় ধীরে ধীরে ফিরে ফিরে অনন্য ও অন্যোন্যরূপে এসেছে অভিজ্ঞতার ভূমিকে বিস্তীর্ণ করতে, স্বভূমিকার উপলব্ধিকে ভূমাময় সুনিবিড় করতে। পরে যুগসন্ধিক্ষণে কল্পান্তের আশঙ্কিত দুর্দিনে ভূমি চৌচির হওয়ার উপক্রম করলেও ভূমা তাঁকে বাঁচিয়েছে। বঞ্চনা ও ছলনার ত্রাস বিশ্বাসের সমুদ্যত ভঙ্গিতে অপসৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকার ?—

একা সে এখন, বাঁধা অধুনার তালে ;
ত্রিসীমায় নেই আদ্যন্তের দিশা :
টলটল জল সচল চক্রবালে ;
সন্ধিলগ্নে সঙ্গত দিবা-নিশা।

এই দিবানিশার সঙ্গতিকল্পনা আসলে সংশয়-সঙ্কটে কণ্টকিত কালরাত্রির উপক্রমণিকা। তাই যখন তিনি আত্মবিশ্লেষণে বলেন :

কিন্তু চক্রচর কাল : সুরাসুর
বিশ্বে সমবল, সম্পূর্ণ পৃথিবী ঊষর, উর্বর
একাধারে ধর্মে কর্মে শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর—

তা আমার সমবয়সীরা মানেনি, মানিনি আমি ;
ফলে আমাদের নিয়তি অগস্ত্যযাত্রা, অনুগামী
হত্ত বা বিস্মৃত ফণিমনসার বনে।

তখন তাঁদের এই নাস্তিক্যের ভূমিকা রাবীন্দ্রিক আস্তিক্যের সঙ্গে তুলনায় একটি স্পষ্ট পদার্থ ব'লে আপাততঃ মনে হ'লেও এ যে আসলে দুঃসময়ের, দুর্গতির স্বতন্ত্র প্রবেশ প্রস্থানভূমিরই দান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা যে-কালের পাত্র বা চরিত্র তাঁরা সে-কালেরই পুতুল। অতএব রাবীন্দ্রিক 'এখনও ঝরিছে বৃষ্টিধারা'বাহী 'নবাঙ্কুর ইক্ষু' কালান্তরে শুষ্ক রুক্ষ।উষর ফণিমনসায় বনান্তরিত। নির্জলা দাবদাহী 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' বা 'পোড়ো জমি' স্মরণীয়—এলিঅটের। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর অন্তিম কালে অবিচলিত থাকতে পারেননি, থাকেননি, সে-প্রমাণ পূর্বেই মিলেছে।

ব্যক্তিত্বের সম্প্রসার-সম্প্রচারের যুগে কবিদের আত্মানুসন্ধান আত্মসমীক্ষা একটি সামান্য লক্ষণ। সেখানেই বা আমাদের পূর্বোক্ত দুই কবি অবশেষে কী গভীর বৈসাদৃশ্য রচনা করলেন, তা দেখার বিষয়। বিশ্বজীবনের বিপুল বৈচিত্র্যে নিজেকে ছড়িয়ে যে-কবি সূর্যোপম সার্থকতায় অনেক সত্যের অনায়াস অনবগুণ্ঠন করেছেন, সেই সঙ্গে যিনি মনে করেছেন :

চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়···

এবং 'সেঁজুতি'র আত্মপরিচয়-প্রতিষ্ঠার এই পংক্তিচয়ে : 'মোর নাম এই ব'লে খ্যাত হোক, / আমি তোমাদেরই লোক', তিনি তাঁর 'ভাষাহীন পারের উৎসবে'র যে-সাক্ষ্য রেখে গেলেন তা এই ভাষ্যসূত্রে একরূপ আত্মখণ্ডনীয় ধ্রুবস্বীকৃতি :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি ?
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—

কে তুমি ?

পেল না উত্তর।

সময়-স্বভাবের হিসাবে যেন যথোচিত, অতিসঙ্গত। পাশাপাশি সুধীন্দ্রনাথ স্মরণীয়। 'আত্মরতি'র অনীহায় যিনি মধ্যাবধি স্পষ্টঘোষিত, অন্ত্যযুগের ভাষণে তিনি অসহ্য আত্মসাক্ষাতে কী অসহায় আবেগেই না বিদীর্ণ হলেন!—

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই :
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই।
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে :
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি !

প্রশ্নেই প্রতিভাত যে, জীবনে বহুল প্রত্যভিজ্ঞা ও অর্ধপ্রত্যয় লাভ সত্ত্বেও শেষাবধি তাঁর 'আপনার দেখা' মেলেনি। অধুনা কারই বা মেলে ?

এবং এই সংশয়-প্রত্যয়জন্য পীড়ন, কৃচ্ছ্র, ক্লিষ্টতা, বিচ্ছিন্নতা ও সাংঘাতিক শ্বাসকষ্ট ('সনেটপঞ্চাশতে'র প্রমথ চৌধুরী কি কেবল পরিহাস করেছিলেন : 'পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় প্রত্যয়' ?) বর্তমানে দিনে দিনে বহুগুণিত। পূর্বযুগের পর্যায়ক্রমিক সংশয়-প্রত্যয় ধারাবাহিক আত্ম-ক্ষয় ও ক্ষতি মানব-অপচয়ের দুর্ভাবনায় বিষাদ-ভারকেন্দ্রে আজ চরম উপনীত। সেকালের নিত্যনবায়মান প্রত্যয় আজ সর্বব্যাপ্ত সংশয়ে বিধ্বস্ত, ধারাবিচ্ছিন্ন বেপথু একাকিত্বে 'সম্প্রতি' অত্যন্ত নিরুপায়, সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও বিপথগামী। ইংরেজি কবিতার দ্বিকালীন দুটি দৃষ্টান্তে ঐতিহ্যাশ্রিত শান্তস্তব্ধ শোক-সংশয় ও মাত্র আত্মপ্রত্যয়ের ভয়ার্ত কল্পনা—শুধু সংকট ও সুদ্ধ সর্বনাশ-প্রসঙ্গ অবশ্যতুলনীয় সামগ্রী :

And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and fight,
Where ignorant armies clash by night.

(Dover Beach : Matthew Arnold)

Around us fear descending
Darkness of fear above ;
And in my heart how deep unending
Ache of love !

(On the Beach at Fontana : James Joyce)

ঘটনাগত প্রশ্ন-উদ্বেগ-কণ্টকিত নিঃসঙ্গতাবোধের চেয়ে মৌলিক নিঃস্বনিঃসঙ্গতার উৎকণ্ঠিত আর্তি যে কত ভয়ানক, অস্তির উল্লাসে ক্ষণসংশয়ের চেয়ে 'নাস্তির মৌনে' চিরপ্রত্যয় যে কত মর্মান্তিক, তা একই দেশের দুই কালের দুই রচনার উদ্ধৃত বাগর্থ-প্রতিবিম্বেই স্বপ্রকাশ, আশা করি সেটি আর কোনো বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে না।

৪

আইনস্টাইনী প্রতিপাদ্যের সূত্রে চরাচরব্যাপী অন্যোন্যতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বরহস্যসমীক্ষায় লিখলেন : 'আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য।—এমন-কি আলোককেও বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়।' এই পরস্পর-মান্যতা-বাধ্যতার আয়োজন দেখে বৈজ্ঞানিক চতুর্থায়তন যেমন ধরা পড়েছিল, সর্বজনীন গতিধর্মে উদ্দীপিত কবিকণ্ঠও অনুরূপ সাধর্ম্যচেতনায় স্থাবর-জঙ্গমকে একতান করতে উৎসাহী হয়েছিল : 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'। এভাবে পরস্পর-ভাবিত ও প্রভাবিত রূপে, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, লীলায়, নিখিল বিশ্বজীবনকে জাগ্রত, ভঙ্গিম ও জঙ্গম দেখা যায়। ক্রমান্বিত-জটিল বিচিত্রে যা বিকীর্ণ সাতরং বহুকোণ, সংহত ঐক্যে তা জ্যোতির্ময় শুভ্র গোল। এক-অনেকের বিকিরিত বিচ্ছুরিত আদি-অকৃত্রিম খেলাই অবিচ্ছিন্ন চলেছে।

এমন যে-বিশ্বরূপ তার মেলায় বসে আধুনিক 'সভ্য' মানুষ এক ভয়ানক-নিঃস্রোত নৈঃসঙ্গ্যের শিকার হয়েছে বহুদিন। তাব এ-বিচ্ছিন্নদ্বীপত্বের কথায় আদর্শবাদী ভিক্টোরিয়ান ও বাস্তববাদী এক্‌জিস্‌টেন্‌সিয়ালিস্ট্‌ সমান সোচ্চার ; ম্যাথ্যু আরনল্ডের 'স্কলার জিপসি' এবং কাম্যুর 'আউটসাইডার'-'রেবেল' প্রায় অনুরূপ উৎকণ্ঠায় পীড়িত, কণ্ঠভঙ্গে তির্যক, বিষণ্ণ পরিহাসে দীর্ণ। 'প্রায়'-অনুরূপ, কিন্তু সমস্তর সমতল নয়, হতেই পারে না, তার প্রমাণ একটু পূর্বেই আরনল্ড-জয়সে উপস্থাপিত। কাম্যুর স্পষ্টোক্তি এই : 'Modern man is subject to a kind of solitude which is certainly the cruellest burden his age has laid upon him.' এই যে ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা বাস্তবিক তা নির্বাসন ; কাম্যু-কথিত 'Exile'। কিন্তু তার ওপিঠে রয়েছে 'Kingdom' (স্মরণীয় তাঁর গ্রন্থের নাম : হলোই বা গল্পের, তা মানুষের তথা আধুনিক মানসিকতারই, Exile and the Kingdom), উক্ত ব্যক্তির জন্ম-জন্ম অধিকার যেখানে! সর্বস্বান্তের দ্বীপান্তরে নয়, সব-পেয়েছির দেশান্তরে। তবে কোথায় তা ? আপাতত এটুকু বুঝি যে, বিশ্বসাপেক্ষ স্ব-স্ব দেশেই সে-দেশান্তর সাধ্য।

কিন্তু সে-দরোজা আপাতত বন্ধ।

অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উজ্জ্বলতম দিনগুলিতে এই 'ভারবাহী' জীবজন্ম যে নিভৃত নেপথ্যে অস্পষ্ট ছিল, ত শুধু স্বপ্নকম্পিত রাত্রির একান্ত কাব্যমালা নয়, তার একটি স্পষ্ট দিবালোকিত পশ্চাৎভূমি ছিল; সেখানে সুবিদ্যমান এক বহুতল-বিশিষ্ট দৃষ্টি, উদার ও গভীর ঐক্যদর্শন, এক অনেকান্ত-ভাবুক জীবনযাত্রা, মূল গ্রন্থি ও ভঙ্গি সে-ই, সে-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েই কি 'পোড়োজমি'র কাঁটাঝোপে বিবর্ণ আপাদমস্তক ডুবিয়ে বহুদল বহ্নিগোলাপের বর্ণাঢ্যতা ভাবলেন 'April is the cruellest month'-এর কবি – তাঁর কাব্য-চিন্তা-সমালোচনায়ও ধরা পড়ল 'islation'-এর দুর্বিপাক : 'a monarchy of death'? জীবন ও শিল্পের জগতে কেউ কিছুই যে একাকী-সম্পন্ন নয়, সেই আবশ্যক ঘোষণার বিশ্বাস?

এ-পর্যন্ত এসে বিশ্বাসের শক্তিক্ষয় ক্রমবর্ধিষ্ণু। দুর্নিবার গতির আক্রমণে, সংক্রমণে 'প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে'—কিছুই অধ্বংসনীয় বলে ধরে রাখা যাচ্ছে না বলেই কি এ-দুর্গতি? অথচ জগৎ ও জীবনের গতিস্বরূপ সেদিনও সুগোচর ছিল। তবে আজ তার জ্বলন্ত প্রতপ্ততম কটাহে দিনরাত্রিগুলি যে অতিশয় ক্ষুব্ধ, উদ্বেজিত ও দগ্ধশেষ, তা নিঃসন্দেহ। হঠাৎ-আলোর ঝলকানি নয়, নিত্যত্বরিত তাড়িত 'আগুনে-আলোয়' উত্যক্ত অধুনার অবিরাম অস্বস্তি ও যন্ত্রণা গত দুই মহাযুদ্ধের দ্রুত সর্বনাশ-সম্পাদনে এবং অন্য অনেক বিক্ষিপ্ত রণরঙ্গ-ভঙ্গে ছত্রখান প্রতিফলিত। একান্তবিচলিত, বিব্রত, আর্ত, মাত্রস্বতন্ত্র ব্যক্তির বহুধা অপচয়, 'বিপন্ন বিস্ময়', অবসাদ-বিষণ্ণতার যেন কোনো সীমাশেষ নেই!

'The mass of men lead lives of quiet desperation'—অন্যনিমিত্ত থরো-র এই উক্তি এ-শতকীয় পিত্তচিত্তজ্বালাকেই যথাযথ ব্যঞ্জিত করে। এই কোয়ায়েট ডেসপারেশন থেকেই জেগে উঠছে পুনরপি 'ব্যক্তির বুদ্বুদ', 'অরুন্তুদ' আত্মরত দ্বীপপুঞ্জ; 'আত্মহত্যার অধিকার' বোধও দেশে দেশে পালায় পালায় তাই মঞ্চস্থ হচ্ছে অবিরল।

আসলে একইসঙ্গে বিপুল বিশাল বিশ্বগতির আবর্তে পড়ে ও আত্ম-অগতির নেতিতে জড়িয়ে আমরা এই গ্রহে, গ্রহান্তরেও যেতে যেতে, দেহে-মনে-প্রাণে সর্বতোভাবে, দীর্ঘতম সংলাপ থেকে মহত্তম সংরাগ পর্যন্ত কম্পিত, আলোড়িত, বিড়ম্বিত ও ব্যাহত—একান্ত-অনেকান্ত উভয়ত্রই সমান অনাত্মস্থতা, অনাত্মীয়তা। মানুষের অন্তর্গত শক্তির বিকিরণ তাই যে-কোন মুহূর্তেই বিস্ফোরণে দাঁড়ায়। কিন্তু যে সদর্থকতা ও ইতিমূল্যবোধ থাকলে শোওয়া-বসা থেকে উঠে দাঁড়ানো, দাঁড়িয়ে-

যাওয়া সম্ভব, তার অবর্তমানে আমরা ক্রমে ক্রমে আজ স্বয়ংসন্তুষ্ট ক্ষণজীবী, অহঙ্কৃত অথচ অনাত্মপ্রত্যয়ী, মানববিরোধী।

কিন্তু একদা বিপরীত ভূপৃষ্ঠে ছিলাম।

পূর্বোদ্ধৃত থরোর সমকালেও। কেবল ক্ষয়রোগের সূচনা হচ্ছিল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের 'মন্ত্রপড়া অন্তরাল' মাত্র রইল, যথার্থ আত্মশক্তি যে অনেকনির্ভর সংযোগ-সাধনায় সফল, তার বিচ্ছেদ ঘটতে লাগল। 'আমি'-সম্বল মূর্খ ও মূঢ় ছিল না সময়, শক্তিসংগ্রহের যুক্তি ও কর্ম উভয়ই প্রবল ছিল, মানুষ প্রয়োজনবোধে ও বুদ্ধিতে সতর্ক ছিল, প্রযোজনা নির্বাধ ছিল। উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিত্বের যুগল চেতনায় সাপেক্ষ ও স্বাবলম্ব নির্মাণকৃতিত্বে, সৃজনে জীবনচর্যার এক মহোৎসব হয়েছিল সেদিন। কবি-কথাসাহিত্যিক-নাট্যকারেরাও সাহসভরে স্ববশ-পরবশ নির্দ্বিধায়, ভগ্নতা-খণ্ডতায় বিমথিত, তবু বিদীর্ণ হননি। বিকৃতি ও বিস্মৃতি আসেনি সম্মিলিত মানুষের সিদ্ধিভাবনায়, সম্ভাবনায়। স্থিতি-গতির স্বরাজ্যে 'অন্য-কোনখানে'র ইসারা এসেছে অনায়াসে, অনেকবার: স্বয়ংপূর্ণতার অচল ভাবনা নয়, স্বয়ং-কৃতিত্বের সাধনা ছিল; স্থবির অহঙ্কার নয়, পরাক্রমী আবিষ্কার ছিল; ব্যক্তিই কালক্রমে প্রত্যয়-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান হয়ে যেত। 'আগে চলা'র গানে তাই তখন ক্ষান্তি দূরের কথা, কোন ক্লান্তিই ছিল না। এই বাঙলাতেই বার বার ধ্বনিত হয়েছে সেদিন: 'পড়ে থাকা পিছে/মরে থাকা মিছে/বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই'। 'ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে/প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে/ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে/মেঘের সিংহবাহনে।' 'লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে/গান আছে যার ওঠ্ না গেয়ে,/চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে/আয় না রে নিঃশঙ্ক।' এবং আরো বহুরূপে, যার বহুলাংশ পরাধীন দেশের 'স্বরাজ'নৈতিক নিমিত্ত বা উপলক্ষই নয় শুধু।

তদবধি দ্রুত পালাবদলে দেখতে পাই, আগে-চলাটা এক অর্থেই আছে, যন্ত্রপ্রগতি ও যান্ত্রিক সময়-গতি—আর্থিক উন্নতি-অবগতির হিসাবে, তাও অংশে: কিন্তু মানবস্বভাবের সমাজের অনুকূল অনুরূপ কবিকণ্ঠের সে-অভয়ভাব আর নেই, আত্মশক্তির একান্ত-অনেকান্ত উৎস শুকিয়েছে, সব সৎ-উৎসাহ নিভেছে। সমালোচিত-আত্মগ্লানি ও ধিক্কার শোনা গেছে বটে মাঝে মাঝে: 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;/ ভিতরে প্রবেশ করি সে-শক্তি ছিল না একেবারে।' এবং 'রাখীবন্ধনে বাঁধিব যাহারে, তাহারে পরাই বেড়ি…/জীবন যাহারে ঘিরি গুঞ্জরে, তারি সূর্যের আলো / দুই হাতে আগলাই।' আর 'মাঠের ফসলগুলো বার বার ঘরে/তোলা হ'তে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে/পরিচ্ছন্ন-ভাবে চলে গেছে।'

পক্ষান্তরে কবিরাও আজকাল বেঁচে-মরে-থাকার খবরই দেন, দিতে বাধ্য থাকেন। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতির পাশে পাশে তার সহস্র কর্মে অজস্র অপকর্ম পাকে পাকে জড়িয়েছে। প্রযোজকের মর্জিনির্ভর প্রয়োগবিদ্যার এই হলো দণ্ড—যুগপৎ জাদু ও ন্যায়ের। মানুষ সত্যিই মানুষকে কী বানিয়েছে! —ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই একদা-বক্রোক্তির মানে আজ চরম অমানুষিক আক্ষেপে পৌঁছেছে। শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্কোচে-প্রসারে, তার উন্নতি-অবনতির হেতুনির্ণয়ে, প্রসারে-নিরসনে—অবাধ বাণিজ্যে হোক, সংরক্ষণে হোক, বিনিয়োগ-বিনিময়-নিয়ন্ত্রণে হোক, সর্বসাকুল্যে আজ অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক জীবনই মুখ্য। ব্যক্তির বিশ্বাস, বিবেক বা আত্মস্থতার প্রশ্ন গৌণ, অনর্থকরী, মূল্যহীন। তন্নিমিত্ত দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধ মাত্র বিশবছরের ব্যবধানে! এবং তৎপর তৃতীয় যুদ্ধের সন্ত্রাস। 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর এই আয়ুব্যাপী স্নায়ুপীড়াও মানুষের 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে'র আংশিক প্রকাশ, লক্ষণ। জাতীয় 'নায়কে'রা ও আন্তর্জাতিক 'দুর্বৃত্তে'রা একাকার অর্থ-পরমার্থময় এক্ষণ-লালসার নবনব নাট্যোন্মাদে ঈশ্বর-অস্তিত্বে ঘুণ ধরিয়েছে, প্রকৃতির বিচিত্র দানকে খানখান করেছে, নিরীশ্বর প্রকৃতিচ্যুত অস্তিত্বকে মানুষের প্রতি অবিরাম অপ্রেম ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, নিদারুণ করে তুলেছে। এখনো-বেঁচে-থাকা কতিপয় শেষ সম্বল ফুলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সহাবস্থানকে দুঃসহ করেছে, পিতৃমাতৃত্বকে নিরুপদ্রব রাখেনি, সুস্থ ও স্বস্থ পরমায়ু-প্রতিশ্রুতি দূরের কথা, অচিরতম এই সামান্য আয়ুষ্কালকেও ভঙ্গুর, প্রীতিসম্পর্কহীন, স্নিগ্ধতাহীন, নিরুত্তাপ, পদে-পদে পঙ্কিল, পিচ্ছিল ও শঙ্কিল ক'রে দিয়েছে। এমতাবস্থায় উৎকেন্দ্রিক ও দুর্বল, ব্যর্থ-অহঙ্কারী, নিরর্থনিনাদী, অভিমানী কবিদের কাছে কাজেকাজেই 'of the timeless and of the temporal together' আশা করা দুরাশা হয়েছে। পক্ষান্তরে : 'of eccentricity in poetry is to seek new human emotions to express; and in search for novelty in the wrong place is to discover the perverse'—তাই অতঃপর সুষ্ঠু সুস্থ ইচ্ছাপ্রেরণার নিয়ন্ত্রণহীন মালীর বাগানে বল্গাহারা দুরুচ্চার্য শিল্পফল উদ্দাম।

কথায় ও কাজে, মতে ও পথে, নীতি ও রীতির গোচর-অগোচর বহুল বিবাদে-বিরোধে, এক কথায় 'অস্বাভাবিকে'র তাড়নায় মানুষ আজ যুগপৎ দুঃস্থতা ও অসুস্থতার বিষকণ্টকে এম্নি বিকৃত, ধিকৃত ও বিভ্রান্ত যে, সে কর্তৃত্ব ও সংস্থার কাছে কৃতাঞ্জলিপুট, সহজেই 'বলিপ্রদত্ত', স্বয়ং প্রতিষ্ঠান হওয়ার ইচ্ছা-চেষ্টা-সঙ্কল্প সব মৃত, পূর্বপ্রতিষ্ঠা নির্জীব। সে বরং প্রতিষ্ঠানের দাসত্ব করেই আজ 'সুখী',

সে-প্রতিষ্ঠান যে-প্রতিষ্ঠানই হোক, সে-কর্তৃত্ব যে-কর্তৃত্বই হোক—কর্তা হোক কর্তাভজাই হোক, অধুনা সব ক্রিয়াই প্রায় প্রযোজক ক্রিয়া। তাই একই বিকল হাতে বিবরের নারকীয় হুঙ্কার ঘেঁটে অম্লান মনোরঞ্জনী কায়দায় তুষ্টু প্রজাপতিদের আলগোছে ছাড়তে হয়, মারতে হয়, হচ্ছে !

ব্যক্তির মৌলিক অধিকার নিয়ে যত তর্কতাণ্ডবই চলুক, সত্তম স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আজ বিলুপ্ত সম্পদ। ব্যক্তি আজ নিরতিশয় দুর্বল, অসহায়, আশাহীন। সমস্ত শক্তি, ভরসা ও বিশ্বাস ক্রমেই স্বয়ং-সংশয়ে, ব্যর্থমুগ্ধতায়, মোহলোভার্ত এক বা অনেক-রাজকতার অবশেষে অরাজকতার পায়ে সমর্পিত সাড়ম্বর শিকার—ব্যক্তিগত সব আশ্বাস আজ দীর্ঘশ্বসিত আপ্তবাক্য, আস্থাশীলতা অস্থিহীন চর্মসার, আত্মপ্রতারক, বিশ্বস্ত ও বিশ্বাস্যেরা প্রবঞ্চক, শঠ। 'মৌলিক' অধিকার-বোধ-সম্পন্ন নাগরিক বর্তমানে দুঃস্বপ্ন-দেশের নাগরিক। একেবারে গা-ছাড়া অবসাদে, আলস্যে, নত ও হত চেতনায় মানুষ ধীরে ধীরে সংস্থা-কবলিত কায়ক্লেশে, পেশা-পেষণের নেশা-ঘুমে, 'ঝেঁটিয়ে-ফেলা রাতের উচ্ছিষ্টে' চক্রবৎ চক্রাকার আচ্ছন্ন, নির্বিচার বিকারেও নির্বিকার। রাষ্ট্রযন্ত্রস্বরূপ মেফেস্টোফেলিসের হাতে সে আজ নিষ্পিষ্ট ক্রীড়নক, পাণ্ডুর পুত্তল, দিশেহারা। সিসিফাসের পাথর-ঠেলায় তার 'যতক্ষণ শ্বাস' শব্দিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা মৃতবৎ আহতের আশাবাদ, কাতরানি। এবং সিসিফাস-ঘটিত এই অস্তা-দুরন্ত-দুরাশাও মাত্র দুর্মর-ক'জনের বৌদ্ধিক উত্তেজনা, এহেন নবমূর্ত সিসিফাস তবু 'মীথ', দূর ও দুর্গম ভাবকল্প ; বরং বিশের দশকীয় পুরোনো হয়েও মিঃ প্রুফ্রক সে-তুলনায় সন্নিকট, 'সাধারণ', আত্মবৎ আত্মীয় প্রতিবিম্ব, 'সিম্বল'। অর্থাৎ সঙ্কল্প ও সংগ্রাম নয়, সংশয় ও সমর্পণই যুগান্তরিত অ-মূল্য মূল্য-বোধের প্রতীক, প্রতিনিধি—'**Nowadays people know the price of everything, and the value of nothing.**'—গত শতকান্তের সৌন্দর্যবাদী শিল্পীর মর্মান্তিক উচ্চারণ আজ এই শতকীয় সত্যবাদীদের তাবিজকবচ !

অর্থাৎ অতঃপর এপর্যন্ত গড়তে গড়তে ভাঙতে ভাঙতে এবং গড়াতে গড়াতে '**Today's statesmen are but intellectual slaves of a defunct economist**'—কীন্‌সের এই কথায় কোন্ সত্য কার সত্য মর্মার্থদীপিত ?—একটি যান্ত্রিক বহিঃশক্তি আজ মানুষের সর্বনিয়ন্তা। ব্যক্তি অতিদুর্বল, রাষ্ট্র অতিপ্রবল। এ-দুয়ের সন্ধিসম্পর্ক সমানে-সমানে মৈত্রীসন্ধি নয়। ব্যক্তির অধিকারে তাই লঙ্ঘন ও লুণ্ঠন অবাধ, কোন কোন ক্ষেত্রে আহার্য ও পরিধেয়ে পর্যন্ত সে অনধিকারী, অযোগ্য ! কারণ উক্ত দেউলে অর্থনীতিই রাষ্ট্রনেতার হাতে ব্রহ্মাস্ত্র। আর সেই প্রযোজনার মূল্যস্বরূপ ব্যক্তি শ্রম, শোষণ ও কর-শুল্ক-

নিষ্কাশনের উপকরণ মাত্র। দিনে দিনে সে, তাই, অসার-বিরস-বিগতশ্রী—চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে'। শুধু তার : 'মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে। /কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ / ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে / ধনুকের ছিলা রাখে টান।' অসহায় নিরুপায় শিরঃপীড়া তাই শিরোধার্য, দীর্ঘশ্বসিত চিত্তক্ষোভও দুর্বিনয়। মাত্র-স্নায়বিক 'এই সব দিনরাত্রি' ঘিরে অগত্যা এই আবদ্ধ যন্ত্রণা, এই অজ্ঞাতপ্রায় মুক্তিসাধ : 'অনেক শ্রমিক আছে এই খানে / আরো ঢের লোক আছে / সঠিক শ্রমিক নয় তারা। / স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে / এরা তবু মৃত নয়; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে /···গৃহ নীড় নির্দেশ সকলি হারায়ে ফেলে ওরা।/ জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের / মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে; /জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে; /অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।' একথাই ঠিক : 'মৃত নয়; মৃতবৎ' এরা 'সিন্ধুতীর' খোঁজ ক'রে সৈন্ধব লবণে ঠেকে যায় এবং নুন আনতে, নিয়তই পান্তা ফুরোয়।

একদা এক ব্যাপক গ্রাম্য বঞ্চনার পদ্মাতীর-পরিস্থিতিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার 'মূঢ় মূক' গরীব গেরস্তদের জন্য দরদী 'ময়নাদ্বীপে'র বাতাস বইয়েছিলেন—হ'তে পারে সে আরেক প্রবঞ্চনা, মার্ক্‌স্‌-কথিত 'gullibility'ই (এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যেহেতু তাদের 'মহৎ' দোষ, অথবা গুণ? এবং অন্য দেশে ও দশকে কাফকা দেখেছিলেন:'দুর্গ' জয়ের পরাহত স্বপ্ন। পুনর্বাসনের অভীষ্টে পৌছতে নিঃস্ব নৈরাশ্যের নির্বাসন যে শক্তিসংগ্রহ ও সত্য-সংহতি চায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা-প্রযত্নে তা আজ আদৌ অত্যাবশ্যক! কিন্তু অনর্থক স্বয়ংতোষ, ভগ্নজীর্ণ অত্যন্ত-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বার্থপরতা, স্ববিরোধ, নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্নতা ও ব্যর্থতাবোধের চলচ্চিত্র জীবনানন্দ যেমন দেখেছিলেন, এঁকেছিলেন তাঁর অন্য-অন্যত্রসমেত পূর্বোদ্ধৃত ও নিম্নবর্ণিত বহু পরিপ্রেক্ষিতের পুঙ্খানুপুঙ্খে, অদ্যতন মানুষের পরস্পর-বিচ্ছেদ-ব্যবধানধর্মী ছিন্নমস্তা প্রমত্ততার প্রগল্‌ভতাকে তা যে যথাযথ দেখায়, পেশ করে, নিঃসন্দেহ :

মেডিকেল ক্যাম্বেলের বেলগাছিয়ার
যাদবপুরের বেড কাঁচড়াপাড়ার বেড সব মিলে কতগুলো সব?
ওরা নয়—সহসা ওদের হ'য়ে আমি
কাউকে শুধায়ে কোনো ঠিক মত জবাব পাইনি।
বেড আছে, বেশি নেই—সকলের প্রয়োজনে নেই।

যাদের আস্তানা ঘর তল্লিতল্লা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।
বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো—আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধরে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে
তাদের আকাশ কোন্ দিকে ?
জানু ভেঙে প'ড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আশাশীল
হ'য়ে কিছু চায়—কিছু খোঁজে ;
এ ছাড়া আকাশ আর নেই।

এরা কারা ? পূর্বেই পরিচয় মিলেছে—স্বয়ং এ কবির কথায়—স্পষ্ট আরও স্পষ্ট করতে :

পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই ;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই ;

সুতরাং 'তাদের আকাশ/সর্বদাই ফুটপাতে ;'— / হায়, 'আশ্চর্য সব মানুষ' ! এমতাবস্থায় তাঁর অতি-মনোযোগী ইঙ্গিত, অভিনিবেশ লক্ষণীয় বাঁক নেয় এসে, অবশেষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমূহচেতনার সত্যে, তাৎপর্যে :

এ-রকমভাবে চ'লে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হ'য়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
কেবলি পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাঘরে হাভাতেদের তরে
অনেক বেডের প্রয়োজন ;
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে ;
বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।
হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দাদন,
কিংবা যারা মরণের আগে মৃতদের
জাতিধর্ম নির্বিচারে সকলকে—সব তুচ্ছতম আর্তকেও
শরীরের সান্ত্বনা এনে দিতে চায়,
কিংবা যারা এই সব মৃত্যু রোধ ক'রে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—

তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে

মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।

'তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সঙ্কল্পকে ধন্যবাদ' তথা 'মানুষকে ধন্যবাদ' দিতে গেলে 'মানুষের অনিঃশেষ কাজ চিন্তা কথা'র আপাতত শেষ কথা সমানুপাতী বা সাম্যবাদী দর্শন ও ধ্যানে, কর্মে, ধর্মে (ধর্মেকর্মে নয়) অভিনিবেশ আসে। আসতে বাধ্য। কেননা সেই কর্মীধর্মীরাই 'এই সব মৃত্যু রোধ ক'রে এক সাহসী পৃথিবী/সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—' কবির গূঢ় প্রত্যয় সেখানে। প্রতীতি নিশ্চয়ই।

আত্মোৎক্রমণকারী বিশ্বোপচিকীর্ষায় যে সর্বাধুনিক আত্মাদর ফলিত, বাধিত ও সাধ্য, তা মনীষীরা মানেন—সাধারণ মানুষেরা তা এখন থেকে ভালো করে মানুক। তবেই কর্তা ও কর্তাভজাদের সন্ত্রাস স্বয়ং সন্ত্রস্ত হবে, অরাজকতা তথা 'সহস্ররাজক'তার অবসান হবে, মাৎস্যন্যায় নৈরাজ্যের ঘোরালো অস্বাভাবিকতা, বিকৃতি, ক্রয়বিক্রয় নিস্তেজ হ'তে থাকবে। অসতের 'সুপ্তির পর্যঙ্ক' বা একতরফা আরাম-আয়েসের পালঙ্ক-শয়ান কেঁপে উঠবে। **'Man the Unknown'**-এর লেখক সেই কবে বলেছেন: **'The abnormal prevent the development of the normal. This fact must be squarely faced.** এবং 'মানুষের ধর্মে'র লেখক: **'The clumsiness of power spoils the key and uses the pickaxe'**—রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা তাদের ধার-করা সব 'অস্বাভাবিক' গাঁতির ব্যবহার আজ চরম করে তুলেছে। এখন তাই 'উজ্জ্বল উদ্ধার' পেতে আলোকিত ব্যক্তির সমষ্টি-উদ্দীপিত মানবসম্বন্ধের পুনর্বিন্যাস ও অঙ্গে অঙ্গে সাপেক্ষতা অঙ্গীকারের দিন। নইলে শুধু 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়' বা 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী' জাতীয় স্বদেশী-বিদেশী শতসহস্র আউড়ে নিরুদ্দেশ তরীর কোন কূলকিনারা সঙ্কুলান হবে না। এ-পর্যন্ত হয়নি। 'আজকে সমাজ/সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর/তিমিরবিদারী অনুসূর্যের কাজ।'—চায়নি এবং পায়নি। বিশেষত এদেশী সমাজ ও রাষ্ট্রের এই যে মারাত্মক ত্রুটি, সব মানুষকে সে জড়াতে পারেনি, টানতে পারেনি 'কাজে', তাই এত বেকারত্ব, ঔদাসীন্য, গাপতাপ, ধাপ্পাবাজি এবং ফাঁকা ফাঁপা আওয়াজ! 'ইনভলভ্‌মেন্ট' না ঘটলে, না ঘটালে 'অ্যালিয়েনেশন' অনিবার্য। সেজন্যেই সেই তথাকথিত 'নির্জনতম' কবির এই হুঁশিয়ার-সজনতা, সতর্কীকরণ:

ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়:

তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের মন

জানে জীবনের মানে : **সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন।**
কিন্তু সেই **শুভ রাষ্ট্র** ঢের দূরে আজ।
চারিদিকে **বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড়—অলীক প্রয়াণ।**
মন্বন্তর শেষ হ'লে **পুনরায় নব মন্বন্তর ;**
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে **নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;**
মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোন দিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।
কেবলই আসন থেকে বড়ো, **নবতর**
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ কষ্ট **মিথ্যা নিষ্ফলতা** বেড়ে যায়।

সাধে কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মশ্রদ্ধা ও স্ব-সম্ভ্রমবোধের স্বর্ণযুগকবি যাওয়ার দিন অপচয় অবক্ষয়ের ঢালুতে ব'সে 'সভ্যতার সঙ্কট' লিখে গেলেন ? বৃথাই কি এই উপপাদ্য : 'Individuality is doubtless real, but it is much less definite than we believe. And **the independence of each individual from the others and from tbe cosmos is an illusion** ···in a world that is not made for us, **because it is born from an error of our reason and from the ignoranee of our own self.'** ? উদাসী প্রবাসীর দিন আজ তাই অস্তোন্মুখ। সমূহনির্ভর পুনরুদ্যোগ-পর্বে বিশ্বানুগামী ব্যক্তিত্বের পুনর্বাসনী চাবিটি সেজন্য সামাজিক সমষ্টিসুখসাফল্যেই সংযুক্ত : 'His success and happiness depend on the affiinty betwean himself and his environment. **He should fit his social group as a key fits his lock.'** সেই কথা আবার : 'এমনকি আলোককেও ···বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়।' লোককে তো মানতেই হবে।

আমাদের সুপ্রিয় কবিকেও তাই উৎকণ্ঠায়, উপলব্ধিতে, 'সুচেতনা'য় বলতে হয় এবং বলেন ব'লেই তিনি আমাদের কাছে প্রিয়তর প্রগাঢ় হয়ে ওঠেন :

মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর

নচিকেতা জরাথুষ্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।…
অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে।…
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলন সূর্যে মানবিক রণ…
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে **মানুষের** চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি **মানবকে** চিনে ··

মানুষের পক্ষে আজ এই 'মানব'কে চেনার, 'মানবে'-উত্তরণের, নব-মানবসৃজনের প্রযোজনাই সর্বাগ্রগণ্য। সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে, এই বোধির ভিতরে ··জয় অস্তসূর্য জয় অলখ অরুণোদয় জয়' তবে আত্মকৃত্য। অতঃপর 'অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে' 'নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে···মানবিক রণ' এবং 'বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড়—অলীক প্রয়াণ' ছিন্নভিন্ন ক'রে 'শুভ রাষ্ট্র' : 'শুভ্র মানবিকতার ভোর'। তাহলেই 'মৃতুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন' (নইলে 'পোড়ো জমি' ও 'ফাঁপা মানুষ'—পুঞ্জিত চাপচাপ গ্লানি, পাপতাপ, 'পুনরায় নব-মন্বন্তর,' 'নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল', 'মিথ্যা নিষ্ফলতা')।

এখানে এখন সবচেয়ে লক্ষণীয় ঐ 'বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড়ে'র মারাত্মকতা, ঐ সর্বনাশা 'অলীক প্রয়াণ' ; ইয়েট্‌স্-এর ভাষায় যা

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned ;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

এবং অবশ্যই **'Things fall apart ; the centre cannot hold/Mere anarchy is loosed upon···'** আর জীবনানন্দের অভিজ্ঞতায় :

যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

পক্ষান্তরে : যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়

মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।)

তাঁর কাছে তাই এই উদ্বেগজনক তথ্য ও সত্য : 'অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিল তারা' ; 'কোথাও নতুন দিন আসে' জেনেও এই সৎ সংশয় : 'কে জানে সেখানে সৎ নবীনতা র'য়ে গেছে কিনা'—কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনার বছর থেকে 'সাতটি তারার তিমির' রচনাকাল ধরা যাক ঠিক একশ বছরের ব্যবধান (১৮৪৮-১৯৪৮)—এরই মধ্যে নানা বিদেশী অভিজ্ঞতাই প্রধানত কবিকে এইসব নগ্নসত্য-দর্শনের সন্দেহে পৌঁছে দিয়েছে :

সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে
বহুকাল কেটে গেছে বহুতর শ্লোগানের পাপে।

এবং শতাব্দী আবেশে অস্তে চ'লে যায় :
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়!

আজ এই ১৯৮৩ পর্যন্ত বেঁচে গেলে বিদেশী-স্বদেশী আরো বহু ভীষণ দৃষ্টান্তে না জানি আরো কী প্রত্যক্ষ উৎকণ্ঠা ও আঁতকানোর খতিয়ান তিনি রাখতেন।

তৎসত্বেও 'আমরা অপেক্ষাতুর…'। যদিও জানি, জীবনানন্দেরই অমোঘ সমালোচনী ভাষায় : 'পিছনের ঢেউগুলো প্রতারণা ক'রে ভেসে গেছে,' এবং তা জানি ব'লেই প্রতিশ্রুতি-ভীত আশ্বাস-ক্ষুন্ন আমাদের তবু আশাবাদী হতেই হয়, কেননা বাঁচতে তো হবে, হোক্ তা 'অনন্তের অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে'—জীবনানন্দ যেমন ছিলেন, বলেছিলেন :

চারিদিকে রক্তে রৌদ্রে অনেক বিনিময়ে ব্যবহারে
কিছুই তবু ফল হ'ল না ; এসো মানুষ, আবার দেখা যাক
সময় দেশ ও সন্ততিদের কী লাভ হতে পারে।
ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে ;…
অন্ধ অভিভূতের মতো যদিও আজ লোক
চলছে, তবু মানুষকে চিনে নিতে বলে :
কোথায় মধু—কোথায় কালের মক্ষিকারা—কোথায় আহ্বান
নীড় গঠনের সমবায়ের শান্তি-সহিষ্ণুতার ;…
আজ পৃথিবীর শূন্য পথ ও জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়
জেগে ওঠে ;—এ-সুর ক্রমে নরম—ক্রমে হয়তো
আরো কঠিন হ'তে পারে ;
সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির এ-ব্যর্থতা মেনেছিল ; জানি ;

আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।

আশার কারণ তবে এই যে, অন্ধকার যত গাঢ় হয়, আলোর উন্মেষ তত কাছের হ'য়ে আসে।

যদিও চতুষ্পার্শে আজ দেখি, অনবরত দেখি কত অদ্ভুত চতুরালি, ভাঁহাবাজি, তাঁরই পর্যবেক্ষণী চোখে এবং বিশ্লেষণী ভাষণে :

অগণন অঙ্কে মানুষের নাম ভোরের বাতাসে
উচ্চারিত হয়েছিল শুনে নিয়ে সন্ধ্যার নদীর
জলে মুহূর্তে সেই সকল মানুষ লুপ্ত হয়ে গেছে জেনে
নিতে হয়; কলের নিয়মে কাজ সাঙ্গ হয়ে যায়;

'ভোরের বাতাসে উচ্চারিত' নামগুলি 'সন্ধ্যার নদীর জলে মুহূর্তে···লুপ্ত হয়ে গেছে জেনে নিতে হয়'—এমনই অবস্থা এবং ব্যবস্থা!—কেননা 'কলের নিয়মে কাজ সাঙ্গ হয়ে যায়'—কী কাজ, কার কাজ?—সেই প্রাচীন রাজসূয় যজ্ঞের অশ্বমেধপর্ব যেন আধুনিক সহস্ররাজক নরমেধ সংস্করণে এমন অপরূপ!

প্রতিনিয়ত মানুষ এভাবেই বিচ্ছিন্ন ব্যর্থ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাকে হতেই হচ্ছে ব'লে কি এই 'মানবের কাজে' এহেন বিপরিণাম!—

কঠিন নিয়মে নিরঙ্কুশভাবে ভিড়ে মানবের কাজ
অসমাপ্ত হয়ে থাকে—কোথাও হৃদয় নেই তবু।···
ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরকম শীত অসারতা
নেমে আসে;—চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ র'য়ে গেছে তবু,
রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে,
বন্ধ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়ে তার লোকোত্তর মাথার নিকটে
স্বর্গের সিঁড়ির মতো;—হুণ্ডী হাতে অগ্রসর হয়ে যেতে হয়।

'বন্ধ্যা' ব'লে বাধ্য-'প্রমাণিত হয়ে তার লোকোত্তর'তায় 'স্বর্গের সিঁড়ির মতো' 'অলীক প্রয়াণে' যেতে হয় এবং তা অবশ্যই বেনেতী কারবারে ফুলেফেঁপে-ওঠা দেশকালোপযোগী পাত্র-মুখপাত্রের মতো 'হুণ্ডী হাতে অগ্রসর হয়ে'! আর এরই মধ্যে

···রাত

এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস্
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হ'তে চায়; ···

—সূর্যের কিরণে

নিমেষেই বিকিরিত হয়ে ওঠে ;—অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি ? তবু, অগণন অর্ধ সত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

যদিও 'ব্যবস্থা'র গুণে এবং নৈপুণ্যে : 'অমর ব্যথায়/অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের/ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত', তবুও দুর্মর আশাবাদ ক্রমে আস্থাশীল হয়ে 'নব নবীন ব্যাপ্তির/সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে/অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।'—কবির এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাস সৎ, সত্যসন্ধ, নিশ্চিত। এ তো একদিকের পরিচয়।

কিন্তু অন্যদিকে ?—এই 'চক্ষুস্থির' প্রত্যক্ষগোচরতা :

নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে…

তখন প্রশ্ন : কী কাজ, কার কাজ, কেমন কাজ ? বলা বাহুল্য যে, 'উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা তারই তলে হায়' ! হতেই হবে। কেননা সেই তো রীতিনীতি, এই তো ইতিহাস ! সুতরাং

সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।…
রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষা, ভয়…

বারবার 'ভয়' ! গোটা ব্যবস্থা ও ব্যাপারটাই যে ভয়াবহ !

এরই মধ্যে 'সৌরকরময় চীন', অথচ একবছর আগে স্বাধীন (কিন্তু 'মুক্ত' নয়) এ-দেশে :

সকলি মহৎ হ'তে চেয়ে শুধু সুবিধা হতেছে ;
সকলি সুবিধা হ'তে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।

'এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়'—যুগপৎ মহাকাব্যিক 'সর্গে'-সঞ্চার ও নাটকীয় তৃতীয় 'অঙ্কে' প্রবেশ-প্রস্থান, পঞ্চম পর্যন্ত উপসংহারের অপেক্ষাতুরতা ; মনে হয়, সমূহ কারণেই তা 'ট্রাজিক' হবে না, এই হলো এখনকার, এখানকার সুকঠিন আশা এবং আস্থা। ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত-মদিরতার ত্রিশঙ্কু-সঙ্কট—তাকে যে কাটাতেই হবে। অথচ সেখানে জের-

টানা খেলার কী কী আয়োজনে 'আমাদের জীবনের আলোড়ন' তা একবার কবির চোখেই দেখে নেওয়া যাক :

অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি ;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।

সুতরাং এই হাসি এই খেলা দীর্ঘ দীর্ঘ অভ্যাসে, নিছক রীতিনীতির বাধ্যতায় আর কতদিন, আর কতযুগ! সহ্য হয় না, আর চলে না।—

স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্রসাধারণ
চেয়ে ছাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে···

তাহলে এই নর্দমার থেকে···উঠে নর্দমায় নেমে, দূর থেকে আরো দূর নিরুত্তরে গিয়ে কীরকম পৌছনো, কীধরনের উত্তরণ তা অতি সহজেই অনুমেয়! শুধু কেউ বা 'এই পথে,' কেউ বা 'ওই।পথে' ;

—তবু

মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।

'অন্তহীন বেদনার পথে' 'বেদনাহীন'! এমনই মূঢ় সহিষ্ণুতা ও বিচিত্র বোধশক্তির অসাড়তা! আদৌ আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মপর-বিস্কৃতি :

কিছু নেই—তবু এই জের টেনে খেলি;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে—অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

এই কস্তুরীমায়ার পিছনে লুব্ধক্ষুব্ধ ধাবমানতা দিনে দিনে কোথায় কোন্ পাতালে টেনে নিয়ে গেছে!—যেজন্যে

এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগরীর গুঞ্জরণ হ'তে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।...

পায় কি? পাওয়া যায়? ফলে

কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকা।
নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেয়সীর মতো হ'তে গিয়ে
নটীরও মতন তবু নয়;—
প্রেম নেই—প্রেমব্যাসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে;

'প্রেয়সী' পর্যন্ত ছুটে টুটে গেছে, তখন তার বিকল্প 'নটী'। তাও নয়, নেই—'প্রেম' নিরবলম্ব হ'লে 'প্রেমব্যসন'? তারও দিন শেষ। সুতরাং সম্মিলিত ভাবে, সঙ্গত কারণেই

একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।

রাবণের সিঁড়ির মতোই অসমাপ্ত অসমাপ্য হতোদ্যম দুর্গতি! তদবধি
কোথাও মহান কিছু নেই তারপর।

কিন্তু তবুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস র'য়ে গেছে;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
র'য়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়,—
মানবকদের ক্লান্ত সাঁকো;

সিঁড়ির বদলে সাঁকো! নাকের বদলে নরুন!—আত্মঘাতী!
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।

'উত্তরণ' আসে না, পুঁজি-পাথেয় স্বল্প, তাই তা সহজে আসে না—সামান্য

সাধনায় সিদ্ধি তো সম্ভব নয়। কেবল তত্ত্বে-তর্কে নিত্য নতুন ব্যথা-বেদনার অর্ঘ্য-সাজানো ছাড়া আর কী হয়।

জীবনের মানে বার ক'রে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হ'য়ে আরো চেতনার ব্যথায় চলেছে।

মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবীদের যেটা সৎ-অংশ, তাদের মূল মূল্য-সঙ্কটটাই এখানে যে, 'জীবনের মানে' নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে জীবনের নিকটে ব্যাহত হয়ে 'আরো চেতনার ব্যথায় চলেছে' তারা; ক্রমাগত ক্রমাগত। দেখছে

মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে-নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।

বিচক্ষণ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে আরো দেখছে তারা, 'চক্ষুস্থির' হয়ে দেখছে

পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা:
ইয়াঙ্কীর লেন-দেন ডলারে প্রত্যয়;—
এই সব মৃত হাত তবে
নব-নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি?—
ভেবে কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই—নেই;—

এই 'স্থির প্রীতি'র অভাব-দারিদ্র্যই সাংঘাতিক দুঃস্থতা, নিঃস্বতা এবং নিঃস্ব-নিঃসঙ্গতা। অথচ এই প্রতিনিধি-কবি জানেন:

মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি অথবা বসন্তকাল ব'লে
আজ তার **মানবকে** কী করে চেনাতে পারে কেউ।

'মানব' বা মনুষ্যত্বই নির্মূল, মূল্যবোধহারা, নিরুদ্দেশ; বিকল্প বা পরিবর্ত কী?—

চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে, মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল;
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হ'য়ে মৃত হ'য়ে স্তব্ধ হয়;
এ ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।

মলিন রাজনীতি-কূটনীতি ঢের ঢের আছে, কিন্তু 'নির্মল কোন জননীতি' নেই, ব'লেই এই প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত অনিবার্য:

এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হ'লে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চ'লে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়।
সকলের তরে নয়।

কেননা 'এই শতাব্দী' মধ্যভাগেই যা দেখাতে পারে নি, অন্ত্যভাগেও কি তথৈবচ ? আরও ক্ষয়, অবক্ষয়, ক্ষতিই তার নিশানা, নিশান ; শুধু জনবিস্ফোরণে

পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে ;
ঝ'রে পড়ে।

তাই ব্যক্তি-ব্যষ্টির দিনান্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে সমূহ-সমষ্টির পূর্ব দিগন্তে চাইতে হয় ; 'চোখে থেকে যায়/আরো-এক আভা' ; বলতে হয়

এই সব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যাপ্ত হ'তে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

এবং তদনুযায়ী করতে হয়—কর্তা-কর্তাভজাদের দিক চেয়ে নয়, করণ-উপকরণের দিকে চেয়েই—কর্তৃত্বের ইচ্ছায় বিনষ্টির কর্ম-অপকর্ম অনেক হয়েছে, এবার কর্মের ইচ্ছায়, সমষ্টির স্বার্থে-সামর্থ্যে যদি কিছু সদর্থক মহাকর্তৃত্বের সাক্ষাৎ মেলে এই দেশকালপাত্রে—সেটাই 'নবপ্রস্থান', তাতেই নিস্তার। বিচ্ছিন্ন 'মানুষ' থেকে সংহত 'মানব'-বিস্তারে জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (নাভানা সং°) এই প্রসঙ্গে সমধিক গ্রাহ্য ও বিবেচ্য এজন্যে যে, এখনও '**it is contemporary : it is speaking to us and for us, here, now' and always.**

লোকায়তিক অবনীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ

১

ছোট-বড়ো যে-কোন বয়সের রূপরসতৃষ্ণাকে যিনি ইচ্ছাকল্পনার মায়ায় অভিনব কথকতার জাদুতে শুধু জাগাননি, পর্যাপ্ত তৃপ্তি দিয়ে পুনরুৎসুক করেছেন, সেই অনন্য অদ্বিতীয় রূপকথাকার অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর একেবারে অন্যধরনের চালে-তালে-লয়ে, 'অপূর্ব অদ্ভুত' ভঙ্গিমায় তাঁর কল্পনাপ্রতিভার একেকটি মিনে-করা মিনার যে সাবলীল অলঙ্করণে নীলিমা ছুঁয়েছে মনে হয়, তা কি 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি', না আদৌ 'ঝলমল' চিত্তের চিত্র-করা প্রসন্নতা? ঘটনাক্রমে কালিদাস-অবলম্বনে 'শকুন্তলা' লিখে রবীন্দ্র-প্ররোচনায় তাঁর বাংলা সাহিত্যে আকস্মিক আসা এবং প্রথম আবির্ভাবেই চমকপ্রদ অন্যরূপরুচির পরিচয়, পাকা হাতের সাফল্য —তদবধি আর পিছুফেরা নয়, আপন মনের বিচিত্র স্বপ্ন-কল্পনা-ইচ্ছা-বাসনার ক্রমান্বয়ী চিত্রিতকরণ, চরিত্রায়ণ—প্রাকৃত ও লোকায়তিক সেসব উপকরণ-প্রকরণের শ্রী, ছাঁদ, ভঙ্গির স্বাদই আলাদা, সদ্ব্যবহার আশ্চর্য—বাংলা সাহিত্যে তার কোন বিকল্প নেই! তিনি মূলত বিশ্ববন্দিত অঙ্কণশিল্পী, অথচ সাহিত্যিক খ্যাতির চূড়ায় যে তিনি ওঠেননি, এ তাঁর দুর্ভাগ্য; হয়তো তাঁর কথাসাহিত্যিক শক্তি ও শৈলীর নিঃসঙ্গতা চূড়ার মতোই; কিন্তু এ-তুলনা বেশী দূর যায় না, কেননা সেখানে দম-নেয়ার প্রচুর ফুরসত মেলে, হাঁপ ধরার অবস্থা একটুও নয়।

সাহিত্যিক অল্পখ্যাতির স্বতন্ত্র-শক্তিমান সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ডাইরীর পাতায় রাখা প্রাসঙ্গিক নাতিবিশ্লেষণে অবনীন্দ্রনাথ বিষয়ে যেটুকু মন্তব্য করেছেন, তার সর্বতোস্বীকার্যতা সন্দেহজনক, কিন্তু সৌকর্য অসাধারণ, তিনি লিখেছেন—'অবনীন্দ্র-নাথ ও রবীন্দ্রনাথ: Art vs Literature। অথচ অবনীন্দ্র গদ্যকাব্য লেখেন, রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন। অবনীন্দ্র revive করেছেন পুরনো গরিমা, রবীন্দ্রনাথ assimilate করেছেন অন্যদেশের ভালটুকু। অবনীঠাকুরের লেখা ছোটবেলায় শক্ত লাগে। বড় হলে তার রসের অফুরন্ত স্বাদ পাওয়া যায়। ওঁর ছোটদের বই আসলে বড়দের জন্য লেখা ছোটদের বই। কথার বুনন তাঁর মোজেইকের মতো, বিচিত্র তার রসের সম্ভার, কিন্তু ছোট ছেলেরা যে রস চায়, ও রস সে রস নয়। ভূতপতরীর দেশ ও শকুন্তলা ছোটবেলায় ভাল লাগেনি। রাজকাহিনী, নালক তখন যত ভাল লাগত, এখন

যেন তার চেয়েও ভাল লাগে। বুড়ো আংলাও সে-বয়সে dull মনে হত। অথচ এখন খুব ভাল লাগে।' অতবড় ক্ষমতাদক্ষতাবান বিশিষ্ট লেখক সতীনাথেরও অবনীন্দ্র-গদ্যরচনা (কাব্যধর্মী নিশ্চয়ই; কিন্তু নিখুঁত শিল্পমণ্ডিত গদ্যই, গদ্যকাব্য নয়) তেমন করে ভাল লাগতে বয়োপরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত কি সঙ্গত যে, অবনীন্দ্ররচনার সমঝদার পরিণতবোধবুদ্ধির পাঠক এদেশকালে সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'তে বাধ্য? আর আগেই বলেছি, অবনীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত গদ্যকাব্য লিখেছিলেন একথা ঠিক নয়, যদিও উচ্চাঙ্গের কবিত্ব তাঁর গদ্যের সর্বাঙ্গ জুড়ে রূপসী নারীর অলঙ্কার হয়ে বিরাজমান অর্থাৎ কে কার অলঙ্কার ঠাহর করা মুসকিল, কিন্তু 'আলোর ফুলকি' ছাড়া তাঁর সবই অপরূপ গদ্যসাহিত্য এবং তাঁর অনেক রচনাই সব বালক-কিশোরদের না হোক, বহুল-উপভোগ্য এবং সমগ্রগ্রহণে তিনি পরিণত রসবোধ, রুচি ও বিচক্ষণ সৌন্দর্যবুদ্ধির অপেক্ষা করেন ঠিকই।

এবার তাঁর অমন যে মৌলিকতা, তার মূল বা শিকড় চেনা যাক। সেদিক থেকে তাঁর স্বরচিত 'আপন কথা'র গুরুত্ব অমূল্য, তার কয়েক পাতা পড়লেই ধরা পড়ে, সেই চিরকালের একা-একা মানুষ ও শিল্পী-সাহিত্যিকেব অতিস্বাতন্ত্র্য ও অদ্ভুত স্বকীয়তার বীজটি কোন্ দূর বাল্যে কী বিচিত্র অবস্থায় গজিয়ে উঠে চারিয়ে গিয়েছিল ভবিষ্যতের অপূর্বরূপচরিত্রচিত্রকর অবনীন্দ্রের ডালপালায়, ফুলেফলেপল্লবে। ভৃত্য-রাজকতন্ত্রের বাধ্য-আবদ্ধ রাবীন্দ্রিক শৈশব নয়, তিনি মা-মাসির আদরযত্ন সোহাগশাসন থেকে সেরকম বঞ্চিত ছিলেন না—তবে তাঁরও একাকিত্ব ছিল অথৈ। কিন্তু তাঁর ছেলেবেলার অনেকটা আন্তর রাজ্য জুড়ে একা-একার মুক্ত কল্পনা ও অবাধ স্বপ্নবিহারে একটি বাস্তব দাসীর জলজ্যান্ত উপস্থিতি ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি লক্ষণীয় করে তোলেন তাঁর স্বকীয় কায়দার বিবরণে, বর্ণনায়, তথা 'আপন কথা'র প্রারম্ভ প্রধান প্রস্তাবই সেই 'প্রথম' অধ্যায়—পদ্ম দাসীকে নিয়ে—তার নামেই শিরোনাম।—কালোকোলো সেই সেবিকাটি তাঁকে যে বাল্যের নিভৃতে সঙ্গ দিয়ে গল্প দিয়ে স্বপ্নজগতের সুলুকসন্ধান দিয়ে, সেবাযত্ন দিয়ে, হয়তো মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক অবহেলা দিয়েও মানুষ করে তুলছিল—একদিন সে বিদায় নিয়ে গেল আর ফিরল না। পরিণত বয়সের অবনীন্দ্র সেই বাল্যে ফিরে গিয়ে যেন দেখছেন, লিখছেন : 'দেখি দাসী কাছে নেই, কিন্তু তার ভাবনা রয়েছে মনে—রোজই ভাবি দাসী আসবে! কোন গাঁয়ের কোন ঘর ছেড়ে এসেছিল অন্ধকারের মতো কালো আমার পদ্মদাসী। শুনি সে ভীষণ কালো ছিল। পদ্ম নামটা মোটেই তাকে মানাতো না। সে তার বেমানান নাম নিয়েই এসেছিল এ-বাড়িতে। রাগ করে গেছে : গল্প বলেছে, ঝগড়া করেছে, কাজও করেছে এবং মানুষ করবার বকশিস

জলের কি মিঠে বাসই আসছে'। পৃথিবীর গায়ের বাতাস যে এত সুগন্ধে ভরা রিদয় আগে তা জানেনি। মেঘের উপর দিয়ে, জলের চেয়ে পরিষ্কার বাতাসের উপর দিয়ে, ভেসে চলতে চলতে রিদয়ের মনে হতে লাগল যেন সব দুঃখ, সব কষ্ট পৃথিবীর যতকিছু জ্বালা-যন্ত্রণা ছেড়ে সে সত্যি উঠে এসেছে সেইখানে, যেখানে ধুলো নেই, বালি নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই—কেবলি আনন্দে উড়ে চলা দিনরাত!' তার এই স্বল্পঅশ্রুশুষ্ক বিশুদ্ধ আনন্দবোধের পাশেই বিন্যস্ত তার বাহন খোঁড়াহাঁসের করুণ অথচ বিমিশ্র বেদনা, যার সঙ্গে সে ওতপ্রোত: "সুবচনীর খোঁড়াহাঁস এইসববুনোহাঁসদের দলে ভিড়ে উড়তে পেয়ে, আর এ-গ্রামের সে-গ্রামের সব সরাল, ঘেংরালদের দেখে হাসি-মস্করা করতে পেয়ে, ভারি খুশী হয়েছে। সে ভুলে গেছে যে নিজেই সে এতকাল পালা-হাঁসই ছিল—ঐ সরাল ঘেংরালদের মতো ঘর আর পুকুর করে কাটিয়েছে। তার উপর সে আজন্ম-খোঁড়া, সবে আজ নূতন উড়ছে।' যেন যুগপৎ 'রৌদ্রমাখানো তরুমর্মরে···নীলাকাশ···সুদূর, বিপুল সুদূর···'এবং 'মোর ডানা নাই, আছি একঠাঁই'···'কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সেকথা যে যাই পাসরি' অর্থাৎ অমলেরই আরেক সংস্করণ তার খোঁড়া-হাঁসবাহন এই রিদয়—তফাৎ এই যে, অমল গতিহীন কল্পচর আর রিদয় গতিশীল স্বপ্নচারী।

সারা জীবন তাঁর সেই 'অমল' চোখ, ঠাকুরদা যাকে বলেছিল 'নবীন চোখ', তাঁকে ছেড়ে যায়নি, 'একঠাঁই' বসে থেকে দূর-দূর অফুরান স্বপ্নদেখা, অপরূপ রূপদেখা, ইহজাগতিক লোকজীবনের 'অসীম ধন'-কল্পনা-করা সব বস্তুর উপস্থিতিকে স্পর্শ করা, তার ভিতরে থাকা, ডুবে যাওয়া, ভাসা এবং ভালোবাসা, বলতে পারা: 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'—নিঃসঙ্গনির্মল বিশুদ্ধ বালকত্ব এবং ঠাকুর্দার পাড়াবেড়ানো পথিকচিত্তের অভিজ্ঞতা, পূর্ণতা, চরিতার্থতা, চারিত্র—আর অঙ্গাঙ্গী ও প্রাসঙ্গিক-আনুষঙ্গিক তাঁর আশ্চর্য আনন্দঘন আটপৌরে কথকতার জাদু—ঐ বিশুদ্ধ বালক ও এই সর্বসংস্কারমুক্ত লোকটির চেয়ে বড়ো 'লোকায়তিক' আর কে!—এই দুই মিলিয়ে ছিলেন কথক-লেখক অবনীন্দ্রনাথ। এদেশের বিশ্রুত পেশাদার কথকদের তিনি ততটা আত্মীয় নন, যতটা প্রাত্যহিক গ্রাম্য 'পরন কথা'য় প্রাণময়, মেয়েলী বাগ্‌ধারা, তাদের ব্রতকথা রূপকথা ও বার্তার চালে-লয়ে-ঢঙে ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া মানুষ—কথাবুনন ও কাহিনীকহনে পাকা পরিণত সিদ্ধপুরুষ (গঙ্গাবক্ষে ও অন্যত্র মুসলমান মাঝিমাল্লা প্রভৃতির সঙ্গে নানা সংসর্গে তিনি মুসলমানী কেচ্ছা-কাহিনী গড়া ও বলার ধরন যে বেশ আয়ত্ত করেছিলেন, তাও সত্য)। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর এই বিশিষ্ট কথার বুননকে মোজেইকের সঙ্গে তুলনা করেছেন—আমি বলতে চাই মেয়েলি হাতের নিকোনো-পুছনো মাটির মেঝের মতো তকতকে

চকচকে ঠাণ্ডা প্রাণজুড়োনো তাঁর এই বুননক্ষমতা, তাঁদের তালপাতা ও কাঁথাশিল্পের মতোও বটে। শুধু হাতের কাজ তো নয়, স্নেহ-স্পর্শী প্রাণ-মনোযোগের কাজ, খুঁটিয়ে-করা, অথচ যেন আলগোছে করা—সন্নিহিত, সুনিহিত, আন্তরিক। চিরবালক 'নবীন চোখে'র কবি-কল্পনায় অমল-অবিন ও প্রবীণ প্রকৃষ্ট কথকতায় ঠাকুর্দা অবনীন্দ্রনাথ যেন মা ও মেয়েদের সাবকাশ দুপুরে বা সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় ঘর উঠোন বারান্দার ছায়ালোকে মায়ালোকে, মিহিন বৈঠকে একাকার হয়ে মিলেছিলেন—একসত্তার প্রকৃতিস্থ বৈঠক তো, তাই ভিন্ন ভিন্ন জনের চঞ্চলচিত্ত বৈঠক যেমন ভেঙে যায়—এ-জোট কখনও ভাঙেনি, এই জোড় কোনদিন খোলেনি—চিত্রী ও কথক, কবি ও গদ্যশিল্পী, বর্ণময় বর্ণনাকুশল অবনীন্দ্রনাথ তাই বাংলা সাহিত্যে জুড়িহীন।

এখানেই মনে করতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা লোকসাহিত্যের প্রথম যথার্থ প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, 'ছেলেভুলান ছড়া'র প্রথম ও প্রধান সংগ্রাহক, রসরূপ-বিশ্লেষক, এ-পথে অন্য বহু পথিককে টেনে আনায় কৃতী-কীর্তিমান—অবনীন্দ্রনাথ তেমনি জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনকে বছর বছর আল্পনায় সাজিয়ে তুলতে খুঁজতে বেরোলেন মেয়েলি আল্পনার সঙ্গে জড়িত প্রচলিত মেয়েলি ব্রতকথার জন্মবৃত্তান্ত, তথা আল্পনা-চিত্র-ব্রতকথার অন্তর্ময় ভাববৃত্ত—টেনে আনলেন তাদের ভেতরকার মানে, অনেক অজানা তথ্য, তত্ত্ব ও সত্যের সুনিবিষ্ট সন্নিবেশ, জীবনগত তাৎপর্য —আমাদের দেখালেন শোনালেন সেই আবহমান মহান ঐতিহ্যের ধারা—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের 'বাংলার ব্রত' পুস্তিকায় সেই স্নেহস্বাক্ষর ও অভিজ্ঞ সাক্ষ্য বিধৃত আছে—ফলে তাঁর আপন মনপ্রাণপ্রবণতার পালে তখন অনুরূপ অনুকূল পবনের বেগ লাগল—কবে রবিকার ঠেলায় প'ড়ে স্বকীয় ঢং-এ 'শকুন্তলা' লিখে তাঁকে চমকে দিয়েছিলেন—এরপর বয়ে চলল তা ঝর্ণা ও নদীর ঝর্ঝর তরতর ছন্দে, ছিমছাম বাতাসের মর্মরে। খোলা আকাশের আলোয় তাঁর অদম্য প্রাণমনের সুরম্য সব স্বপ্নকল্পনার জাগরণ, মায়া—অসম্ভব-সম্ভবের জাদু—'রূপকথার স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে কথকতার মনোহারিতা' সেখানে যেন ঐক্যের সম্বন্ধে সখ্যের সম্পর্কে মাখামাখি—অনেকটা ঐ আল্পনাচিত্রিত রূপ ও ব্রতকাহিনীর বিচিত্র কথকতার মিলমিশ, মেলবন্ধন। অতঃপর স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রাণমনের পথ অনর্গল হয়ে গেল, 'বাঁধা পথের শেষে' এসে দাঁড়ালেন। অক্লেশে ঢুকলেন গিয়ে রাজপুত পেইন্টিংস্-এর পথ ধ'রে 'রাজকাহিনী'র সাজঘরে, অন্য ঘরানার লোকবৃত্তে; সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গ-সান্নিধ্যেই বুঝি বৌদ্ধজগতে ও জাতকের গল্পে তথা 'নালকে'র অপরূপ উপকথায়; উড়িষ্যাভ্রমণের স্মৃতি নিয়ে অপূর্ব-আলাপী-'ফ্যাক্ট' ও 'ফ্যান্টাসি'—'ভূতপতরীর দেশে'; রংরসে টসটসে উচ্ছল উজ্জ্বল সাবলীল স্বচ্ছতায় স্বাদু 'খাতাঞ্চির খাতা'য়,

সেলমা লাগেরলেফ-অনুপ্রাণিত 'হাঁস-সারস-সহচর মানসযাত্রী বুড়ো আঙুলের আকারপ্রাপ্ত (Tom Thumb) একটি বালকের উত্তরপ্রয়াণের অভিনব রূপকথা' 'বুড়ো-আংলা'য়—যেখানে বাংলার 'উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের ভূগোল এবং নাম অবলম্বন' ক'রে কাহিনীর গতি চলেছে কোথা থেকে কোথায়—'আমতলি' 'চলনবিল' প্রভৃতি রূপাঙ্কিত স্থান-নাম পেরিয়ে 'যোগী-গোফা' 'আসামী কুরুঞ্জি'র দূরদুর্গমে। তারপর আছে 'পথে-বিপথে'র গল্পচিত্রগুলি—স্বাস্থ্যের কারণে গঙ্গায় বেড়ানো দিনরাতের স্মৃতিমাখানো বাস্তব-অবাস্তব কল্পবিচিত্রা—সহাস্য দীপ্তি ও সজীবতার রঙে বিকীর্ণ খোসগল্প—অথচ 'মোহিনী' 'গুরুজী' 'মাতু' প্রভৃতির চরিত্র-চিত্রায়ণ, বাংলা সাহিত্যে, উপকরণে-উপস্থাপনে অদ্বিতীয়—ডঃ সুকুমার সেন ঠিকই লিখেছেন। তদুপরি 'নদীতীরে' গল্পগুলিতে লেখক নিজেকে দ্বিধাভিন্ন করেছেন—বক্তা এবং অবিন—"অবিন বক্তারই বহির্নিক্ষিপ্ত মনোময় দ্বিতীয় স্বরূপ"—এটিও বাংলা সাহিত্যে একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, সেই এক ও অনন্য অবনীন্দ্রের অন্যমূর্তি। পরে আরও দৃষ্টান্ত পেয়েছি।

তাহলে মা-মাসিদের ও দাসদাসীদের বাক্‌ধারা ও ছন্দস্পন্দময় বাল্যস্মৃতিময় ও পরবর্তী বাংলার ব্রত-কথায় সযত্নসন্ধানী অবনীন্দ্রের গদ্যপ্রকরণ ও শৈলীবৈশিষ্ট্য যে আদৌ মাত্র আহৃত পদার্থ নয়, অনুপ্রাণিত ও স্বায়ত্ত-সাঙ্গীকৃত সামগ্রী, সেই বিশিষ্ট বিষয়-উপকরণ, স্বতন্ত্র-সাবলীল-শিল্পরচনার দুটি ছোট বড় নমুনা এখানে তবে লক্ষণীয় : 'অনেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তবু এই সবুজখাতা-লুকোনো দেরাজের সন্ধানই পেলে না ; আবার অনেক ছেলে দেখেছি আগেই ওই খাতার সন্ধান পেয়ে গেছে। আমাকে ছবি আঁকতে দেখে আমার মা আমাকে সবুজ খাতাখানি দিয়েছিলেন। আমি কি তখন জানি সে খাতার গুণ ? আর একটু হলেই একটা বিলিতি খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে সেটা বদলে ফেলেছিলুম আর কি! ভাগ্যি মায়ের চোখে পড়েছিল, তিনি আমায় কোলে বসিয়ে যখন সেই খাতা থেকে একটির পর একটি ছবি দেখাতে লাগলেন তখন আমি অবাক হয়ে গেলুম। কী রং দিয়েই সে সব ছবি লেখা! বাজারে সে রং পাবার জো নেই।'—এখানে যে-মা তিনি কেবল তাঁর মা ? ভুবনময়ী, বিশেষত সবুজ বাঙলাময়ী তাঁর 'মাতার মাতা'ও নন ? আর 'কী রং দিয়েই সে সব ছবি লেখা! বাজারে সে রং পাবার জো নেই'—অবনীন্দ্রের বিশিষ্ট বিচিত্র গদ্যরচনা সম্পর্কে আমাদেরই বক্তব্য তো! এবং : 'বাইরে দুপুর রোদ ঝাঁঝাঁ করছে—এমন গরম যে কেউ বাইরে নেই। "কালবোশেখি আগুন ঝরে। কালবোশেখি রোদে পোড়ে, গঙ্গা শুকুশুকু, আকাশে ছাই।" কুকুরটা পর্যন্ত দাওয়ার উপর ছায়ায় পড়ে ঘুমোচ্ছে! গাছের পাতাটি নড়ছে না।

"ঘুমতা ঘুমায় ঘাটের পাত্তরা, ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা!" সেই সময় অন্ধকার-করা ঘরটিতে ছেলেমেয়ে তিনটিকে ঘুম পাড়িয়ে সোনার মা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছেন। ঠাণ্ডা ঘরখানি, জানলার নিচেই আতাগাছের আগডালের দুটি চারটি সবুজ পাতায় রোদ লেগেছে। দূরে মাঠের মাঝে একটুখানি জল ঝিকঝিক করছে। কোন্‌খানে একটা ঘুঘু সুর করে বলতে লাগল—"পুতুর ঘুম্‌ঘুম্‌ঘুম্—দুপুর ঘুম্‌ঘুম্‌ঘুম্"। সোনার মা তাই শুনতে শুনতে কখন আস্তে আস্তে হাতের সেলাই কোলে রেখে জানলার ধারটিতে ঘুমিয়ে পড়লেন—আর একটি ছোট মেয়ের মতো, অমনি আস্তে আস্তে সোনার মায়ের মনের মধ্যেকার সবুজ খাতায় একটি ছবি পড়ল।' এই প্রক্রিয়াটিই অবনীন্দ্রের আপন অভিজ্ঞতার কথা: 'একটি ছোট মেয়ের মতো···মায়ের মনের মধ্যেকার সবুজ খাতায় একটি ছবি'র মতোই যেন পরিণত অবনীন্দ্রের মনে তাঁর সবুজ খাতায় সেই ছোট বালক অবিনের অনেক ছবি ফুটে উঠেছে কতবার, কত রূপ কত কথায়—রূপসী কথ-কতায়: 'আতাগাছের বাসায় ঘুঘু পুতুকে ঘুম পাড়িয়ে নদীতে চান করতে গেল। পুতু এতক্ষণ মট্‌কা মেরে চোখ বুজে ছিল। সে অমনি আস্তে আস্তে উঠে বাসা ছেড়ে আতাগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে একটা বাঁশি বাজাতে লাগল। মানুষ হয়ে পুতু ঘুঘুর বাসায় ঘুমোচ্ছে,—সে পাখির মতো আতার ডালে উড়ে বসল—এসব সোনার মায়ের কাছে কিছুই আশ্চর্য বোধ হলো না; মনে হলো পুতু যেন কতদিনের চেনা! তিনি দেখলেন, সোনা আর আঙুটি পাঙুটি জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে ডাকলে—"আয়—পুতু—উ—উ!" অমনি পুতু হিঞ্জুলি পাতার জামা বাতাসে মেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এল, সঙ্গে তার জোনাকপোকার মতো একটুখানি আলো! আলোটি ঘরের মধ্যে এসে ঝুমঝুম করে ঘুঙুর বাজিয়ে খেলাঘরের কোণটিতে গিয়ে বসল।'—বয়স্ক লোক ঘুমিয়ে পড়লে বালক জেগে ওঠে—তখন তার সদ্যজাগা তাজা মনে কত দ্রুত রূপ-রূপান্তরের লীলা সাবলীল চলে—চলে—চলে, মানুষ হয়ে পুতু ঘুঘুর বাসায় ঘুমোয়, পাখির মতো আতার ডালে উড়ে বসে, 'এসব···মায়ের কাছে কিছুই আশ্চর্য বোধ হলো না': হয় না; মা যে তখন ছোট্ট মেয়েটি! তাই তখন তাঁর কল্পনায়-প্রত্যক্ষে স্বচ্ছন্দভাবে 'পুতু হিঞ্জুলি পাতার জামা বাতাসে মেলে দিয়ে···'—বড়দের হিজল পাতাই ছোটদের হিঞ্জুলি পাতা হয়ে যায়—মায়ের মুখে ছোট্ট ছেলেমেয়ের জন্যে ছড়ায় যেমন লাল জুতো হ'য়ে যায় লাল 'জুতুয়া'—তাঁর নয়, তাদের উপযুক্ত!—আর জল ঝিকঝিক আলো ঝলমল জোনাকজ্বলা ঘুঙুরে ঝুমঝুম—চোখ কানের সব ভোজ, ইন্দ্রিয়গুলির সমস্ত আয়োজন চক্ষের নিমেষে সুসম্পন্ন, সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অপরূপ

প্রতিফলিত 'সহজ' রূপসত্বের আল্পনায়, আশেপাশে অমি লিখিত হয়ে যায় 'কালবোশেখি আগুন ঝরে' ব্রতকথার ছড়াটি—স্বয়ং অবনীন্দ্রের 'বাংলার ব্রতে' তাঁর মন্তব্যসহ ওটি উৎকলিত, ওঁরই সাধের সংগ্রহ, অনায়াসেই মিলে মিশে যায় আপন কথা ও পরের উদ্ধৃতি, যেন অঙ্গাঙ্গী হয়েই ছিল, এসেছিল, থেকে যায়। আর আসে অমি অক্লেশে 'ঘুম্‌তা ঘুমায়'—সেই প্রচলিত ছড়াটি, যথাস্থানে ঘুম ছড়িয়ে। ঘুঘুর স্বর ক'রে বলা বোল্‌টিও উঠে আসে নিভৃত নির্জন বনের মধ্যে থেকে যথাসময়ে—তাকে হুবহু ধ'রে রাখেন কথক-লেখক তাঁর 'সবুজ খাতা'র সজীব পাতায়। এবং 'আয় পুতু—উ—উ' ব'লে আটপৌরে অন্তরঙ্গ ঘরোয়া মেয়েলি ডাকটুকুন!—সবই আছে, ঠিক-ঠিক আছে—এই সুসঙ্গত বিন্যাস ও সন্নিবেশই শিল্প—অবনীন্দ্রনাথ; আবার তা স্বভাবও, প্রকৃতি—প্রাকৃত ও স্বাভাবিক মানুষের, সচরাচর লোকসমাজের বাধাগ্রস্ত জীবনে অবাধ-আগত ইচ্ছা স্বপ্নকল্পনার স্বাধিকারপ্রমত্ততা—সেও তো সেই মৌলিক 'অবিন'। আর তখন: 'সোনার মা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছেন। ঠাণ্ডা ঘরখানি, জানলার নিচেই আতাগাছের আগডালের দুটি চারটি সবুজ পাতায় রোদ লেগেছে।' অবিকল দেখতে পাচ্ছি এবং টের পাচ্ছি, শুধু মা নন, ছেলেও 'মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে কাঁথায়…ঠাণ্ডা ঘরখানি—আতাগাছের আগডালের দুটি চারটি সবুজ পাতায় ('সবুজ খাতা'য়ও) রোদ লেগেছে।' বালক ও লোকে, অবিন ও অবনীন্দ্রে অগাধ অবাধ যাতায়াতের পথেও যেন রোদ লেগেছে।

সমগ্র গদ্যকথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ এমনি এক হানা-দেয়া অভিজ্ঞতা, গভীর অন্তঃকরণের অন্তঃস্তর জাগরণের, অন্তঃস্থল আলোকনের অনুভব, উপলব্ধি। 'বুড়ো আংলা'য় দেখা-দেখানো "সোনার বাঙলা"র প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত বহুবর্ণিল রূপ, তন্ময় রসটলটল বাণী, দরদ-উপচানো স্নিগ্ধ চিত্ত-চিত্রই তাঁর নিজস্ব বন ও মনমর্মর, যুগপৎ। সেই মূল স্রোত-নিঃসৃত ধারায় উপধারায় তাঁর ব্রত-কথকতা, অভিনব রূপকথারা বহমান—লৌকিক 'পরণকথা'র গন্ধবর্ণস্পর্শস্বাদ-লেগে-থাকা আটপৌরে ঘরোয়া তাঁর বাংলা গদ্যে সরল শ্রী, সহজ লাবণ্য, সাবলীল ছাঁদ ঢং ডৌল ও বলয়—তার আপাত-অগোছালো পারিপাট্য—প্রসন্ন চলন্ততা—সচ্ছল বেগ ও স্বচ্ছন্দ আবেগ—না, এই অবনীন্দ্র-কথাকাঁথাশিল্পের কোনো বিকল্প বা দ্বিতীয় নেই কোথাও। গোবিন্দ সামন্ত ও ফোক টেল্‌স্ অব্ বেঙ্গল-খ্যাত লালবিহারী দে থেকে রবীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, সুখলতা, যোগীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার সবাইকে স্মরণে রেখেও, রেখেই, বলতে হয়—গ্রাম বাংলার নিসর্গ-প্রকৃতিসমেত প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত লোকজীবনের এক বড় আশ্রয় রূপকথা-ব্রতকথা-

কথকতা, মেয়েলি বাকভঙ্গি ও বুলির এমন নম্র নম্য বিশুদ্ধ গ্রহণ, স্বীকরণ, এমন আত্তীকরণ, আত্মীয়করণ—আপন কথায় দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে কল্পনাপ্রতিভায় তাই দিয়ে নিয়ে এমন পুনর্সৃষ্টি, আনকোরা তরতাজা নতুনের এমন মৌলিক উত্থাপন, উপস্থাপন— যুগপৎ কিশোর ও বয়স্কপাঠ্য, পরিণত বোধ-বুদ্ধিরই যা সমধিক, সর্বাধিক উপভোগ্য—হ্যাঁ, সজীবসবুজ লোকাত্মিকতার, প্রাণবন্ত পরমাত্মীয়তার এই অবনীন্দ্র-নাথ বাংলা সাহিত্যশিল্পে অতুলনীয়।

২

পল্লীলোক ও নগরালোকে সেতুবন্ধস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রাণ করুণানিধান-কুমুদরঞ্জনরা, নজরুল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি, এমনকি পূর্ব-বাংলা গীতিকা ও লোকসঙ্গীতে-অনুপ্রাণিত জসিমউদ্দীন একদিকে, শতকরা নিরানব্বই ভাগই নাগরিক কবি সত্ত্বেও বিষ্ণু দে, সুভাষ, সুকান্ত, বীরেন্দ্রদের লোকজীবন-চেতনা আরেকদিকে—সসম্ভ্রমে সব মনে রেখে বাংলা কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত লোকায়তিকতা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র কথাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য বোধ করি। যদিচ তিনি জীবনের এক পর্বে বরিশালে-কলকাতায় দীর্ণ ছিলেন, অবশেষে 'কল্লোলিনী' কলকাতার 'ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকে'র মতো অগত্যা-নাগরিক, তাই বিষণ্ণতম, বিপন্ন-বিস্ময়, ব্যাহতব্যাকুল—'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ক্রমশ ধূসরতর, তাঁর 'বনলতা সেন,' 'মহাপৃথিবী' 'সাতটি তারার তিমির' 'বেলা অবেলা কালবেলা'-ই তদবধি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মনোযোগ্য, কেননা এসবই সবচেয়ে বেশি 'বাঁধা অধুনার তালে'—কিন্তু আবহমান গ্রামবাংলা ও বাঙালীর 'চিত্ররূপময়' চালচিত্র, স্থির চরিত্র, লৌকিক কথা-কাহিনী-পুরাণের পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার, নিসর্গপ্রতিমার অপরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও প্রাকৃত বাংলার অন্তর-আলোকন, অন্তঃস্থল-অবলোকন, অন্তঃস্তলে অবগাহন তাঁর 'রূপসী বাংলা'য় যেভাবে বিধৃত, তার তো কোনো পূর্বপর নেই!

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী সব দেশের মতো এদেশেও নিতান্তই উনিশ-বিশ নয়, উভয়ে বিরাট বিশাল ফারাক ঘটে গেছে পর পর। তাই উনিশশতকী রবীন্দ্র-অবনীন্দ্রের মৌল 'সোনার বাংলা'-চেতনা (যদিও রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে জেনেছিলেন, লিখেছিলেন: 'অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী—অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা,' অবনীন্দ্র-নাথ শেষ জীবনে জোড়াসাঁকো ভবনের 'দক্ষিণের বারান্দা' ছেড়ে বরানগরের নতুন 'বাসা' নিয়ে বসতে বাধ্য হয়েছিলেন) সব সত্ত্বেও অক্ষত না হোক, তবু ক্ষতিক্ষীণ ছিল। কিন্তু বিশশতকী জীবনানন্দের পক্ষে তা যে অসম্ভব কল্পনা; এদেশের এ-বিশ্বের এ-শতাব্দীর বহু ভাঙচুর-দেখা বহু নির্মম প্রশ্ন, কঠিন সংশয়ে-প্রত্যয়ে পীড়িত বেদনাবিদীর্ণ কবি তিনি—'স্বাধীন' দেশভাগে তাঁর যে সর্বস্ব গিয়েছে—আর

সেই দেশভাগের সূচনাসঞ্চার যে তিনি জানেন কত আগেই হয়ে রয়েছে—কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' সেদিন রদ হলো বটে, কিন্তু সেকালীন জাতীয় জয়োচ্ছ্বাস, স্বদেশী মহোল্লাস অচিরে মিলালো—যখন তারই প্রতিক্রিয়ায়, প্রতিবিধানে কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারত-রাজধানীর স্থানান্তর, নবপত্তন ঘটল। সে-ইস্তক ক্রমাগত একটি একটি করে দীপ নিভে গেছে এদেশের—সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে বঙ্গীয় দেশবন্ধুর সেই পরাস্ত বিপর্যয় দিয়ে তার যার আরেক ইতিহাস শুরু—নজরুল তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য রেখে গেছেন 'চিত্তনামা'য়—জীবনানন্দও দেশবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন 'ঝরা-পালকে'—এমনকি 'রূপসী বাংলা'র 'অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া' সনেটটি তাঁরই 'দেশবন্ধু'-স্বনামাঙ্কিত ও বন্ধনীভুক্ত করে স্বহস্তেই সবিশেষ লেখা '১৩২৬-৩২-এর স্মরণে'—দেশবন্ধু ও বাঙলা-বাঙালীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কাল, সঙ্কটকাল, সেকালের ; এবং একালীন ১৯৩৯-এ 'দেশনায়ক' সুভাষচন্দ্রের সামগ্রিক অপদস্থতায় তারই চূড়ান্ত বিস্তার—রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে তাঁর চরম উদ্বেগ গান্ধীজির কাছে, সমগ্র দেশবাসীর কাছেই সেদিন জানিয়ে গিয়েছিলেন, 'কালান্তরে'র প্রবন্ধ-প্রসঙ্গবিশেষ তার নিশ্চিত প্রমাণ ; এবং তারপর ? মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ তাই স্বাধীনতা—জাতীয় অবমাননার চূড়ান্তে, ক্রমিক দুর্ভাগ্য-দুর্গতি-দুর্দশার সর্বস্বান্তে পৌঁছে গেল বাঙলা, বাঙালী। এসবই জীবনানন্দের প্রত্যক্ষদহনবেদনার বিষয়, অপূর্ব-পর অভিজ্ঞতা। এর মাঝখানে অনিঃশেষ দাবদাহে বসে, শতাব্দীর সমানবয়সী তিনি, ত্রিশের দশকে, তাঁরও ব্যক্তি-কবিজীবনের মধ্যযামে লিখে গিয়েছিলেন কিছু অপূর্ব-আলোকপাতী বাংলা-বাঙালীময় চতুর্দশপদী, সনেটকল্প কবিতা—প্রায় তখন থেকেই বাংলার 'মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে'—অথচ বাংলা রূপসী নিশ্চয়ই—তাহলে কেমন সে-রূপ ?—তাঁরই কথায় : 'যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ, সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা'।

'রূপসী বাংলা' জুড়ে ক্ষয়, ধ্বংস, বিনষ্টি ও মৃত্যুচিন্তা-চেতনা ওতপ্রোত অবশ্যই ; কিন্তু তাই সব নয়, কবি তখনও বিশ্বাস করতেন যে, বিনাশ কোনো বড়ো দেশ বা জাতির সর্বস্ব সংবাদ হতে পারে না, মর্মান্তিক দেশভাগ-স্বাধীনতা তখনও কিছু দূরে অপেক্ষমান, মৌল মূল্যবোধ প্রভৃতি চুকেবুকে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার সাংঘাতিক লক্ষণ মারীগুটিকার মতো ফুটে উঠতে দেখেছিলেন মাত্র, ব্যাধির সঞ্চারে—তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা অতঃপর আরো সাম্প্রতিক। ইতিমধ্যে তাই তিনি সেই ত্রিশের দশকী মধ্যবর্তিতায় নানা প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে টেনে টেনে বের ক'রে আনেন আবহমান বাংলার কিছু অন্তরঙ্গ পরিচয়, চির-বাঙালীর কিছু 'আঁতের কথা'—টানা পয়ারের দীর্ঘমাত্রিক মন্দমন্থর চালে-লয়ে বুনে রেখে যান সেই একটানা ধারাবাহিক জীবন-

জগতের রূপ-কথা, অখণ্ড বাংলা, এমনকি 'বৃহৎবঙ্গ' যার চৌহদ্দি—যা একদিন ছিল, এখনও কিছু আছে, কিঞ্চিৎ থাকবে—সেই বহুবিশ্রুত ইতিহাস-কিম্বদন্তী-স্মৃতি—সেই লৌকিক-পৌরাণিক বেষ্টনী, রূপকথা-উপকথার প্রেক্ষিত—সেই সুপ্রবল 'পরণ-কথা'র অভিনব উল্লেখ, প্রয়োগ—যাতে তাঁরই ভাষায় 'কীর্তন ভাসানগান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর' ধ্রুবমরণময় শাশ্বত জীবন যেন আরো নিবিড় হয়ে ভীড় ক'রে আসে এই সব অমোঘ চিত্রে ও চরিত্রে—'সবচেয়ে বেশি রূপ, সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা'য়।

জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস
রবে বুকে ; এই ঘাস : সীতারাম রাজারাম রমানাথ রায়—
ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চ'লে যায়—
এই ঘাস ; এরি নিচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস ;
তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপাফুল মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস
ঘাস আজো ঢেকে আছে ; যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়···

সর্বোপরি তাঁর সেই সুপ্রিয় 'ঘাস' এবং 'হেমন্ত', আর নিচেয় থাকে-থাকে সামন্ত-তান্ত্রিক বাংলার সীতারাম-রাজারামদের ঘোড়া—গতি—অন্ধকার—তারও নিচে প্রত্নমহীয়সী কঙ্কাবতী-শঙ্খমালাদের 'চাঁপাফুল মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস'—আরো অন্ধকার।

আর সেই দূর অতীত থেকে আগত বহুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ব্যাপ্ত (আশা করেন, কবি)

বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ। চেয়ে রবে ; ··
শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প—ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে ;
চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি—শাদা শাঁখা ··

তাই তখন, তখনও তৃপ্তি অটুট, মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ, আশা-আশ্বাস অন্তহীন :

চারিদিকে বাঙালির ভীড়
বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালির
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি···

বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালি নারীর কাছে—চাল-ধোওয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড় ;—ডাঁশা আম কামরাঙা কুল।

উপকরণগুলি লক্ষণীয়। 'লক্ষ্মীর গল্প' 'ভাসানের গান' 'কীর্তন···রূপকথা যাত্রা

পাঁচালি'-পর্ব পার হয়ে 'বাংলার ধানী শাড়ি', 'শাদা শাঁখা', বেহুলা-লহনা-স্মৃতি-অবশেষ বাঙালিনীর 'চাল-ধোওয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,' 'হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়—ডাঁশা আম কামরাঙা কুল'—এই ঘনমমত্বের ম ম-করা আত্মীয়তায়, আতিথেয়তায়, সাধারণ-অসাধারণ আপ্যায়নে উত্তরণ—তৃপ্তি—এসবেই তাঁর তবে শ্রেষ্ঠ শান্তি?—অথবা সান্ত্বনা? কার নয়? কেননা এসবই যে সেই লোকায়ত বাংলার সাংস্কৃতিক চিরচিহ্ন; আজ কি নিশ্চিহ্ন?—পল্লীপ্রধান গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার আবহমান সত্য সেই সামাজিক পরিচয়—কিবা আঙ্গিকে, কিবা আন্তরিকে!

কেবল কি বাংলার 'স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল' নদীবিধৌত শ্যামাঞ্চল ভূপ্রকৃতি, স্নেহপ্রীতিময় নরনারী-কৃতি-কীর্তি? পাখিটিও নয়? যে-আজকের পাখিটিকে দেখে তাঁর মনে হয় সে-ই বুঝি, আসলে তার পিতৃপুরুষ, সেই কবে কবির পিতৃপুরুষের মতই অবস্থান করছিল 'কালীদহ'-কূলে, যখনকার কথা ভেবে তাঁর মনে পড়ে, বারবার অনুভব হয়:

হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে নাকি—দহের বাতাসে
আষাঢ়ের দু'পহরে কলরব করনি কি এই বাংলায়!
আজ সারাদিন এই বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়ায়
চাঁদ সদাগর: তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে,
কালীদহে কবে তারা পড়েছিল একদিন ঝড়ের আকাশে,—

জীবনানন্দের বিশিষ্ট কল্পনাপ্রতিভার গুণে, নৈপুণ্যে ও গৌরবে পাখিডাকা 'এই ক্ষণটুকু'ও হলো কিনা 'সেই চিরকাল'। এবং

এ-নদীও ধলেশ্বরী নয় যেন—এ আকাশ নয় আজিকার, .
ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে নাকি?—আছে, মনে হয়,
এ নদী কি কালীদহ নয়? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি নাকি? বিষণ্ণ মলিন ক্লান্ত কি যে
সত্য সব;—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের দৈবাহত নায়ক চাঁদ বেনে, সেকালের এক বিরল মেরুদণ্ডী, আর তার মহাদুঃখিনী স্ত্রী সনকার কথা কি স্বপ্ন? স্বপ্ন নয়, 'সত্য সব'—আবার অন্য অর্থে 'স্বপ্ন সত্য' 'মনসা বলিয়া গেল নিজে'—সর্পদেবী মনসাই নয়, স্বয়ং কবি-মনেরই সায় সেখানে, ভরসা সে-ই, 'আছে, মনে হয়'—এই স্বানুভব-প্রতীতি-প্রত্যয়ের পর কি সংশয়-প্রশ্ন-তর্ক সবই নিরর্থক নয়?

এমনি ক'রেই একে-একে অনেক লোকবিশ্বাস, তাঁর একার নয়, সমগ্র সমাজ-মনের যৌথ প্রত্যয় যেন ঘনিয়ে আসে আরও কত প্রিয় প্রসঙ্গ ঘিরে:

ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,
…যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা…

রামপ্রসাদের 'শ্যামা আজো আসে— আসে' নাকি?—তারও আগে 'একদিন শঙ্খমালা'দের 'কাঁকন বাজিত, আহা'—সেই শঙ্খমালা, জীবনানন্দেরই অন্য-অনন্য কবিতায়: 'কবেকার শঙ্খিনীমালার স্তন—দুধে আর্দ্র' অনিবার্যত মনে পড়ে যায়! এবং

—দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ
·· যখন মুকুন্দরাম, হায়
লিখিতেছিলেন ব'সে দু'পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়— থেমে থেমে যায়;—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানখেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।

'কোকিলের ডাক শুনে' যুগপৎ কবিকঙ্কণের সৃষ্টিমুহূর্ত ও বেহুলার মৃতস্বামী-বহনবেদনা তীব্র তীরবেগে একতটে এসে মিলল—জন্ম ও মৃত্যু এই মহাবিপরীত স্মরণে-বরণে একাকার হয়ে গেল—'সবচেয়ে বেশি রূপে'র পাশেই যে 'সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা'—তাঁর চেয়ে বেশী আর কে জানে? তবে উভয়ের সঙ্গত স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া নিখুঁত ভাবেই আঁকা রয়েছে কবির নির্ভুল পর্যবেক্ষণে, অনুমানে—দেখায়, মন-প্রাণের দেখায়: যেখানে যখন 'লেখা তাঁর বাধা পায়, থেমে থেমে যায়', সেখানে তখন 'চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল'—প্রিয়বিচ্ছেদের বাষ্প-কুয়াশা শুধু? প্রিয়মিলনের বসন্ত-কুআশা নয়? বেহুলার? আশ্চর্য বিষণ্ণ শ্লেষ, পরিহাস, পুরাণিক প্রেম-পাতিব্রত্যের কঠিন করুণ পরিহাস।

ক্রমে কোকিলের পাশে যে-কাককে তুলে নেন কবি, তারও 'করুণ' 'ক্লান্ত ডাক', আর এই আনুষঙ্গিক লোকপুরাণপ্রসঙ্গ:

সকালে কাকের ডাকে আলো আসে, চেয়ে দেখি কালো দাঁড়কাক
সবুজ জঙ্গল ছেয়ে শুপুরির—শ্রীমন্তও দেখেছে এমন:
যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক,

সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাংলার শুপুরির বন
দেখিয়াছে—অকস্মাৎ গাঢ় নীল ; করুণ কাকের ক্লান্ত ডাক
শুনিয়াছে—সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিল তাহারা যখন।

একদিকে 'কত শতাব্দী'র স্মরণ, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ বর্তমান : মধ্যসাক্ষ্যে 'বাংলার শুপুরির বন'—'দেখিয়াছে' আর 'করুণ কাকের ক্লান্ত ডাক'—'শুনিয়াছে', এই এক দৃশ্য, এক শ্রব্য দেখা-শোনাই অতীতে-উপনীতে সাধারণ সূত্র। তারপর পাই গ্রামবাংলার লোকজীবনের ঋতুমাফিক বার্ষিক ও দৈনন্দিন কাজকর্মের নানা খতিয়ান, দায়-দায়িত্বপালনের বিচিত্র খবর, সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সৃজন-নির্মাণের গায়ে জড়াজড়ি সর্বাত্মক আবাহন-বিসর্জন, নির্বাণ :

ধানকাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কতবার কুড়ালাম খড়,
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে
মাথুরের পালা বেঁধে কতবার ফাঁকা হলো খড় আর ঘর।

ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর খড় ভেসে গেল এবং মাথুরের পালা বেঁধে খড় ঘর ফাঁকা হয়ে গেল—এই বর্ণনায় কি কেবল ভাগ্য-বিড়ম্বনা, নিয়তি ? না, দুর্বিষহ শোষণের'নীতি'-নির্দেশ ? এবং এই একই ভাঙন-প্রবণ বাংলার অন্য দিগন্ত, দিনান্তের পাশে নয়, বিপরীতে দিবারম্ভে, চিরাগত স্নেহপ্রেমমমত্বময় আতিথ্য-আপ্যায়নী সরল পরিচর্যায়, সহজ শুশ্রূষায়, গভীর আন্তরিকতায়—এককালের যা সচরাচর স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল চিত্র, চরিত্র। আজ ঘটনাচক্রে তা কি নষ্ট মোহ, অস্ত মহিমা, অপরূপ রূপ হয়, নির্মম বিদ্রূপ ?—

—লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার
পেঁচা ডাকে জ্যোৎস্নায় ; —হিজলের বাঁকা ডাল করে গুঞ্জরণ ;
সারারাত কিশোরীর লাল পাড় চাঁদ ভাসে—হাতের কাঁকন
বেজে ওঠে : বুঝিব না—গঙ্গাজল, নারকোল নাড়ুগুলো তার
জানি না সে কারে দেবে—জানি না সে চিনি আর সাদা তালশাঁস
হাতে লয়ে পলাশের দিকে চেয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে রবে কিনা…

উজ্জ্বল জীবন্ত মুগ্ধতা-প্রত্যাশার এই যে সত্য প্রতিমা-চিত্রণ, তার চালচিত্র দেশকাল-পাত্রের সুনিপুণ ব্যর্থতায় তো কবেই ভেঙে গেছে—এখন শুধু স্মৃতিহার আর কথামালা।

এভাবেই রূপকথা-উপকথা-পুরাণ-প্রকৃতির সাগ্রহ সজন-বিজন মিলে যে চিরায়ত লোকায়ত বাংলা—সেই স্বতঃসচ্ছল স্বচ্ছন্দ ও স্বভাবরূপসী 'বাংলার মুখ'কে (যতই কেননা আজ সে-'মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে') ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে দেখে,

দেখিয়ে—তার থেকে অক্লেশেই অনায়াসে মুখ ফিরিয়ে কবি—এই কবি—আর কোনো সাড়ম্বর সালঙ্কার আলোকধাঁধায় যেতে চান না—সেখানে যে মুখোসের ছড়ানো জড়ানো জটিল কুহক। তাই 'রূপসী বাংলা'র পাতায় পাতায় একটিই সাধ তাঁর—প্রিয় সাধ—গানের ধুয়োর মতো বারবার ফিরে ফিরে আসে, নদীর 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা (এবং একই) কথা কয়' :

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও—আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব···
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ;

কেননা আটপৌরে আত্মস্থ ঘরোয়া বাংলার সরল সরস গ্রাম্য চিত্রচরিত্র ধ্যান-জ্ঞানই তাঁর তখনকার সচ্চরিত্র সুখ, চিরকালের স্বস্তি, তৃপ্তি, সান্ত্বনা ও শান্তি—'মাইল মাইল শান্তিকল্যাণ'—"'পরণকথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে"—এই 'পরণকথা'-কথকতায় স্নিগ্ধমুগ্ধ প্রসন্নচিত্ত অবনীন্দ্রকেও আগে এজন্যই স্মরণীয় বরণীয় বলেছি। বিষণ্ণমুখ বিদীর্ণচিত্ত জীবনানন্দকেও দেখলাম। এ-দুজনেরই এমন আশ্চর্য আকুল ভালোবাসা—সন্ধ্যার ঘোরের মতো, সকালে ভোরের মতো, তার আর বয়স হলো না ; দুজনেরই দেশপ্রীতি লোকপ্রেম কত তার পরিমাপ আজ আর অনাবশ্যক, নিরর্থকও, শুধু এটুকুই বলব যে, গ্রামীণ ও দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের এই বিশুদ্ধ ভালোলাগা, খাঁটি ভালোবাসার বুঝি 'প্রাণ অফুরান' এবং তাই 'ছড়িয়ে দেদার' পরমায়ু তার অনিঃশেষ ; দুজনেই যে বাঙলা-বাঙালীর নাভিতে নাড়ীতে হাত রেখেছেন, একেবারে অন্তঃস্থলে, 'প্রাণে'—আর বহু বেদনায় অটল, বহু আঘাতে অটুট এই বাংলার দুর্মর প্রাণশক্তির সাক্ষাৎ-কারই এঁদের, বিশেষত জীবনানন্দের—'রূপসী বাংলা'র কবির, সম্ভবত শেষ ও শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি, চরিতার্থতা, এবং তার অন্তঃসারই নিবেদিত এই ক'টি অমোঘ ছত্রে :

ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

সেকালের বিরল পুরুষসিংহ, মধ্যযুগীয় একক মেরুদণ্ডী চাঁদ বেনের চরম বিপন্নতায়, ঘোর দুর্দিনে-দুর্ভাগ্যে, তবু অপরাস্ত মনোভাবে দৃঢ়তায়, পাশাপাশি সাংঘাতিক চক্রান্তকারী হীন প্রতিহিংসা-পরায়ণ মনসার মনস্তুষ্টির কারণে ইন্দ্রের সভায় গিয়ে বাধ্যনর্তকী হয়েছিল যে-বীরাঙ্গনা—সে বাংলারই তীরবিদ্ধ নারী—সেই 'বিপুলা' বেহুলার ঘুঙুর-পরা পায় সেদিন সে-সভায় 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো' তার নাচের আতলে তালে-লয়ে 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল···কেঁদেছিল'।—আহত বেদনায় মর্মান্তিক নেচে সে বিজয়িনী হয়েছিল—সব ভাঙচুর ক্ষয়ক্ষতি সর্বনাশ-মধ্যস্থ অটলঅজেয় আত্মশক্তি-মাহাত্ম্যের সে-গূঢ় বন্দনাই 'রূপসী বাংলা'র শ্রেষ্ঠ মর্মরিত বাণী, লোকায়ত-লোকাত্মিক চরিত্রের অন্তঃসার বার্তা।—বাঙলা ও বাঙালীর চিরাত্মকথামুখে বিপন্ন-বিস্ময় মানবাত্মার গাঢ় বেদনা, আত্মনাদ ; মাত্র আর্তনাদ নয়। 'আত্মানং বিদ্ধি' যেমন, 'অহং'-এর নয়, আত্মার বৃদ্ধিও তেমন অত্যাবশ্যক—সেই আত্ম-বৃদ্ধি-সমৃদ্ধির কথা যিনি লোকজীবনের খাঁটি ধর্ম (ধর্মকর্ম নয়) থেকে, মর্ম থেকে, দেশজ সংস্কার-সংস্কৃতি দায়দায়িত্ব-বিশ্বাসবহনের কর্মভার থেকে উদ্ধার করে আনেন, উদ্ধারিত করে দেন—বৈশ্য-সভ্যতার নাগপাশে পাকে পাকে বেষ্টিত অপচয়-অবক্ষয়ে লুণ্ঠিত সত্তার শিরে সর্পাঘাত উদ্যত সত্ত্বেও, সেই সঠিক অস্তিত্বের নিখুঁত সন্ধান করেন—'যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হয়ে আছে শ্যাওলায়/···যেইখানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে/···এঁকেছে কড়ির ঘর/···বাঘিনীর ডোরা/বেতের বনের ফাঁকে···/রূপসী মৃগীর মুখ দেখা যায় /···সেইসব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি ছাওয়া পথ—ধোঁয়াভরা ভাত/ কোথায় গিয়েছে সব ?—/···নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত ·· ; এত বুকে আঘাতেও তার রূপ আশা ভালোবাসা বিষণ্ণতা, 'আঁতের কথা' ও ব্যথা 'রৌদ্র আর মেঘে'—'এই দহে—এই চূর্ণ মঠে মঠে—এই জীর্ণ বটে'···'যার রূপ জন্মে জন্মে কাঁদায়েছে আমি তারে খুঁজিব সেথায়'—আমি, আমরাও খুঁজব তাঁকে—'রূপসী বাংলা'র পাতায় পাতায়, আদ্যন্ত, আবহমান।

বস্তুতপক্ষে ঠিক ঠিক 'শিকড় যদি চেনা যায়' তার নিঃসৃত রসে আবহমান বাঙলা ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যথাযথ স্বীকারে, আত্তীকরণে, প্রধানত যে দুটি মৌল সত্য এই দুজন সদ্য-আলোচিত লেখক অপূর্বপর সৌন্দর্যভর বিস্ময়ে আমাদের দিয়ে গেছেন, তা হলো তাই: সব বদ্ধতাবিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রকাশ তথা আত্মপ্রতিষ্ঠা—লোকায়তিকতায় অমল ও 'সৌরকরোজ্জ্বল' অবনীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ।

সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি ও উৎসর্গ : অকালপ্রয়াত রমেন্দ্র চৌধুরী ও ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যাবিহার